৭ পৌষ ১৩৬৬

মুদ্রক
এস কুণ্ডু
জয়গুরু প্রিণ্টার্স
৪এ, বৃন্দাবন বোস লেন
কলিকাতা ৬

প্রকাশক
মিহির ভট্টাচার্য
কবি ও কবিতা প্রকাশন
১০ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

সূচীপত্র

# সোনার তরী

১

"কাব্যের একটা বিভাগ আছে যা গানের সহজাতীয়। সেখানে ভাষা কোনো নির্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে না, একটা মায়া রচনা করে, যে-মায়া ফাল্গুন মাসের দক্ষিণ হাওয়ায়; যে-মায়া শরৎ-ঋতুতে সূর্যাস্তকালের মেঘপুঞ্জে মনকে বাড়িয়ে তোলে, এমন কোনো কথা বলে না যাকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।"[১]

রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতাটি এই শ্রেণীর কবিতা। তা 'মনকে বাড়িয়ে তোলে', কিন্তু 'এমন কোনো কথা বলে না যাকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।' কথাটা ঠিক, আবার ঠিকও নয়। আমাদের প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রীরা বলতেন, 'সোনার তরী' ধ্বনিকাব্য। বাচ্যাতিরিক্ত অর্থান্তরের অভিব্যঞ্জনাই তার প্রাণ। অর্থাৎ তার ভাবার্থ বাচ্যে নয়, বাচ্যান্তরের অভিব্যঞ্জনায়।

অথচ, এই কবিতাটি রচনার পর প্রায় দেড় যুগ ধরে এর পক্ষে এবং বিপক্ষে বিতর্কের অন্ত ছিল না। সেই পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। এই কবিতার বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ উঠেছিল তার প্রধান তিনটি হল অস্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতা এবং অবাস্তবতা। চাষী-জীবনের বাস্তব সত্যের সঙ্গে মিলিয়ে একদল ভাবের অসঙ্গতি দেখাতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন, অন্য দল এর মধ্যে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব আবিষ্কারে ব্যস্ত ছিলেন। আসলে রবীন্দ্রনাথের তরুণ যৌবনে যুগপ্রতিনিধি কবি ছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আর, বলাই বাহুল্য, হেমচন্দ্র ছিলেন বাচ্যার্থ-প্রধান কবি। 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নিজের 'খেয়ালের ভাষা' আবিষ্কারের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। 'সন্ধ্যা-সংগীতে'র নবকবিভাষার সমজদার সেযুগে ছিলেন না বললে ভুল হবে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের গলার মালা সন্ধ্যাসংগীতের তরুণ কবিকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। সে-যুগের সারস্বত পুরুষপ্রবরের কাছে এই স্বীকৃতি সামান্য ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দুর্ভাগ্য, তাঁর কাব্যজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি বহু রথী-মহারথীর দ্বারা বারবার আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যুর পরেও তিনি নিষ্কৃতি পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু কবিজীবনের প্রথম দিকে এর একটা কারণও ছিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ১৮০৭ সালে লেডি বোমণ্ট্‌কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন

Every great and original writer, in proportion as he is great or

**original, must himself create the taste by which he is to be relished, he must teach the art by which he is to be seen**[২]

'সোনার তরী' কবিতাটি রচিত হয় ১২৯৮ সালের ফাল্গুন মাসে। অর্থাৎ তখন কবির বয়স একত্রিশ বৎসর চলছে। তার অব্যবহিত-পূর্ববর্তী কাব্য 'মানসী' সম্পর্কে কবি বলেছেন, এই কাব্যেই প্রথম 'কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।' মানসীতেই কবি প্রথম কাব্যে সচেতনভাবে রূপক এবং সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করতে প্রবৃত্ত হলেন। 'সোনার তরী'তে তা সূক্ষ্মতর সার্থকতায় প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু এই নবীন কাব্যের সমজদারের সংখ্যা তখন স্বল্প ছিল। রবীন্দ্র-কাব্য-আস্বাদনের রুচি তখনো কাব্যরসিকসমাজে সৃষ্ট হয়নি। তাই 'সোনার তরী'কে নিয়ে এত হট্টগোলের সৃষ্টি হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন। 'সোনার তরী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রে কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলা হয়, "এবারকার 'সাধনা'র [ আষাঢ় ১৩০০ ] আর একটি মহামূল্য অলংকার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী'। আমরা বহুদিন এমন সর্বাঙ্গসুন্দর প্রকৃতকবিত্বময় কবিতা পড়ি নাই। আমরা তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।" তারপর সমগ্র কবিতাটি উদ্ধৃত করে পুনশ্চ মন্তব্য করা হয়েছে: "ইহার কবিত্ব ও সৌন্দর্য বর্ণনাতীত, তাহা কেবল হৃদয় দিয়া অনুভব করা যায়, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ। রবীন্দ্রবাবু বহুদিন এমন কবিতা লেখেন নাই…তিনি 'সোনার তরী'র মত কবিতা লিখুন, তাঁহার 'সোনার' লেখনী অমর হইয়া থাকিবে।"[৩]

কৌতুকের বিষয় এই যে, 'সাহিত্য' রবীন্দ্র-বিরোধী পত্রিকা বলেই পরিচিত, অথচ ১৩১৩ সালের কার্তিকের 'প্রবাসী' পত্রে যখন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'কাব্যের অভিব্যক্তি' প্রবন্ধে 'সোনার তরী'র বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন তখন তিনি সম্ভবত 'সাহিত্যে'র মন্তব্য [ 'তাঁহার সোনার লেখনী অমর হইয়া থাকিবে' ] স্মরণ করেই লিখেছিলেন, "রবিবাবুর ভক্তগণ রবিবাবুর 'সোনার তরী'কে সকল কবিতার প্রায় শীর্ষে স্থান দেন। সভায় সভায় ইহার আবৃত্তি হইয়াছে। একজন এইটি পড়িয়া লিখিয়াছিলেন যে, 'তাঁহার সোনার লেখনী অক্ষয় হউক'।……বলা বাহুল্য, কবিতাটি যার-পর-নাই অস্পষ্ট।" রায় মহাশয় পুনশ্চ লিখেছিলেন, "…এ কবিতাটি দুর্বোধ্য নয়, অবোধ্যও নহে—একেবারে অর্থশূন্য, স্ববিরোধী।"[৪] দ্বিজেন্দ্রলালের এই বক্তব্য অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল পরেও রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনায় পুনরাবৃত্ত হচ্ছে।[৫]

দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু কবিতাটির আলোচনা করেই ক্ষান্ত হয়নি, একটি প্যারডিও রচনা করেছিলেন।[৬] রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রের ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রথম দিকে যে খুবই সহৃদয়তাপূর্ণ ছিল তার বহু প্রমাণ সাহিত্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু সাহিত্যের আদর্শ নিয়ে মতভেদটি শেষদিকে যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা সাহিত্যে প্রথম-সারির নাট্যকার। কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার সম্যক্ স্ফুরণ হয়েছে কিনা এ সম্পর্কে মতভেদ থাকা অস্বাভাবিক নয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে 'রবিবাবুর দল' এবং 'দ্বিজুবাবুর দলে'র লড়াই অনেক দূর গড়িয়েছিল। মহাকালের রায় অবশ্য শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই গিয়েছে। ১৯১৩ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল যখন ইহলীলা সংবরণ করেন তখনো তিনি শুনে যেতে পারেননি যে, রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কারের দ্বারা বিশ্ববরেণ্য কবি হিসাবে প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি পেয়েছেন।

২

'সোনার তরী' একটি বিশুদ্ধ লিরিক কবিতা। কবিতাটি কবিরই আত্মকথা। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের গানের জগৎ থেকে আমরা আপাতত দুটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করছি। প্রথমটির কথা রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রহস্য' প্রবন্ধে বলেছিলেন।[৭] এটি গীতাঞ্জলির ৬৯-সংখ্যক গান—

ঐ যে তরী দিল খুলে।
তোর বোঝা কে নেবে তুলে।
সামনে যখন যাবি ওরে
থাক না পিছন পিছে পড়ে,
পিঠে তারে বইতে গেলি,
একলা পড়ে রইলি কূলে।

ঘরের বোঝা টেনে টেনে
পারের ঘাটে রাখলি এনে,
তাই যে তোরে বারে বারে
ফিরতে হল গেলি ভুলে।
ডাক রে আবার মাঝিরে ডাক,
বোঝা তোমার যাক্ ভেসে যাক্,

জীবনখানি উজাড় করে,
সঁপে দে তার চরণমূলে॥

'গীতাঞ্জলি'র এই গানটি লেখা হয় ১৩১৭ সালের ১৮ জ্যৈষ্ঠ। সাড়ে চার বছর পরে 'বলাকা'র যুগে যখন যাত্রার আনন্দগান বেজে উঠেছে তখন কবি বলছেন,

তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক্ তীরে,
তাকাস নে ফিরে।
সম্মুখের বাণী
নিক তোরে টানি
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।[৮]

দ্বিতীয় গানটি আছে গীতবিতানের 'প্রেম' পর্যায়ে। ওই পর্যায়ের ওটি ২৩৫-সংখ্যক গান। তাতে কবি বলছেন,

দিনান্তবেলায় শেষের ফসল নিলেম তরী-'পরে,
এ-পারে কৃষি হল সারা,
যাব ও-পারের ঘাটে॥
হংসবলাকা উড়ে যায়
দূরের তীরে, তারার আলোয়,
তারি ডানার ধ্বনি বাজে মোর অন্তরে॥
ভাঁটার নদী ধায় সাগর-পানে কলতানে,
ভাবনা মোর ভেসে যায় তারি টানে।
যা-কিছু নিয়ে চলি শেষ সঞ্চয়
সুখ নয় সে, দুঃখ সে নয়, নয় সে কামনা—
শুনি শুধু মাঝির গান আর দাঁড়ের ধ্বনি তারি স্বরে।

'গীতাঞ্জলি'র গানের শেষে কবি বলেছিলেন 'ডাক রে আবার মাঝিরে ডাক,/ বোঝা তোমার যাক্ ভেসে যাক্,/ জীবনখানি উজাড় করে/ সঁপে দে তার চরণমূলে।' অর্থাৎ, গীতাঞ্জলির যুগে শরণাগতির ভাবই প্রাধান্য পেয়েছিল।

দ্বিতীয় গানটিতে 'বলাকা'র 'ডানার ধ্বনি' কবির অন্তরে বাজছে। তখন

আবার নদীস্রোত 'ভাঁটার টানে' 'সাগব-পানে' 'কলতানে' ভেসে যাচ্ছে। 'তাবি টানে' কবির ভাবনাও তাব সঙ্গী হয়েছে। কিন্তু কবি জীবনের 'শেষ সঞ্চয়' হিসাবে যা নিয়ে চলেছেন, 'সুখ নয় সে, দুঃখ সে নয, নয় সে কামনা'। কবি শুধু শুনছেন 'মাঝিব গান আর দাঁড়েব ধ্বনি তাবি স্বরে।' গীতবিতানের বিন্যাস অনুসারে এটি প্রেমসংগীত। যে-প্রেমকে কবি বলেছেন 'মহাসমুদ্রেব বিরাট ইঙ্গিতবাহিনী' এ-প্রেম সেই প্রেম। পথিক-মানুষেব চিরযাত্রাব পাথেয় সে। তাই 'দাঁড়েব ধ্বনি তাবি স্ববে' মিলিত হযেছে।

৩

'সোনাব তবী'কে আমবা বলেছি কবিব আত্মকথা। শুধু কবিবই নয, কবিতাটি সকল মানুষেবই 'অহং' বা 'আমি'-ব আত্মকথা। একটি গভীব নৈবাশ্যবোধ এবং তজ্জনিত বিষণ্ণতা কবিতাটিতে ছড়িযে আছে। প্রথম দুটি চবণেই কবিতাব মূল সুব উচ্চাবিত ·

গগনে গবজে মেঘ, ঘন ববষা
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।

কেন ভবসা নেই, কিসেব ভবসা নেই, এই জিজ্ঞাসাই কবিতাটি সম্পর্কে কাব্যবসিকেব প্রথম জিজ্ঞাসা। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'এখানে শুধু মিলেব জন্যেই ভবসাহীন হতে হলো'।[৯] —সত্যই কি তাই ?

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে মহাভাবতেব বনপর্বেব বক-যুধিষ্ঠিব-সংবাদের কথা। শেষেব দিকে বক-রূপী ধর্মবাজ পাণ্ডবজ্যেষ্ঠকে চাবটি প্রশ্ন কবেছিলেন: 'কা চ বার্তা কিমাশ্চর্যম্ কঃ পন্থাঃ কশ্চ মোদতে ?' এই প্রশ্ন-চতুষ্টযেব প্রথম দুটি হল, পৃথিবীব বার্তা কী বল, এবং সবচেযে আশ্চর্য কী বল ? উত্তবে যুধিষ্ঠিব বলেছিলেন, জাতকমাত্রই কালকৃত হচ্ছে—এই হল পৃথিবীব বার্তা। আব প্রতিদিন অসংখ্য জীব যমমন্দিরে যাচ্ছে দেখেও, যাবা বেঁচে আছে তাবা কিছুতেই মবতে চায় না—এর চেযে আশ্চর্য আব কী আছে ?

অস্মিন্ মহামোহমযে কটাহে
সূর্যাগ্নিনা রাত্রিদিনেন্ধনেন
মাসর্তু দর্বী পরিঘট্টনেন
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা॥

এবং

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্॥

জাতকমাত্রেরই মৃত্যু এই মর্ত্যজীবনের নিয়তি। অথচ জিজীবিষা মানুষমাত্রের সহজাত ধর্ম। মানুষ বেঁচে থাকতে চায়, কিন্তু তাকে মরতেই হবে,—ইহজীবনে মানুষের এর চেয়ে বিষণ্ণ-করুণ ট্রাজেডি আর কী হতে পারে?

এই মৃত্যুরূপ অনিবার্য নিয়তির হাত থেকে রক্ষা পাবার দুটি পথ মানুষ আবিষ্কার করেছে। প্রথমটি হল মৃত্যুকে অস্বীকার করা। মানুষের মধ্যে যাঁরা আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাসী তাঁরা বলেন, মৃত্যু তো দেহের অবস্থান্তরমাত্র, দেহীর মৃত্যু নেই, সে অজর, অমর, অবিনশ্বর।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ গীতা॥২/১৩॥

অর্থাৎ, দেহী বা আত্মার দেহে যেমন কৌমার যৌবন জরা উপস্থিত হয়, তেমনি দেহান্তরপ্রাপ্তি, তাতে জ্ঞানিগণ মোহগ্রস্ত হন না। অধিকন্তু

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ গীতা॥২/২২॥

অর্থাৎ, মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নববস্ত্র গ্রহণ করে তেমনি আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করে নতুন একটি দেহ প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু এই আত্মবাদী দার্শনিক-ব্যাখ্যায় সাধারণ মানুষের সান্ত্বনা নেই।

মানুষের মধ্যে আরেক দল মানুষ আছেন,—তাঁরা দার্শনিক নন, তাঁরা শিল্পগোত্রের মানুষ।

বংশপরম্পরাক্রমে জীব বেঁচে থাকে দেশে এবং কালে। কিন্তু শিল্পগোত্রের মানুষ বাঁচতে চান কালে কালে এবং মানুষের মনে মনে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করিতেছে।'[১০] এই প্রবন্ধেই কবি বলেছেন, 'প্রাণের অধিকার দেশে ও কালে, মনোভাবের অধিকার মনে এবং কালে। মনোভাবের চেষ্টা বহুকাল ধরিয়া বহু-মনকে আয়ত্ত করা।'

শিল্পী কি করে বহুকাল ধরে বহু-মনকে আয়ত্ত করে তার বিশ্লেষণ করে কবি লিখেছেন, 'এই একান্ত আকাঙ্ক্ষায় কত প্রাচীন কাল ধরিয়া কত ইঙ্গিত, কত ভাষা, কত লিপি, কত পাথরে খোদাই, ধাতুতে ঢালাই, চামড়ায় বাঁধাই, কত গাছের ছালে, পাতায়, কাগজে, কত তুলিতে, খোন্তায়, কলমে, কত আঁকজোক, কত প্রয়াস—বাঁদিক হইতে ডাহিনে, ডাহিন দিক হইতে বাঁয়ে, উপর হইতে নিচে, এক সার হইতে অন্য সারে! কী, না, আমি যাহা চিন্তা করিয়াছি, আমি যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা মরিবে না, তাহা মন হইতে মনে, কাল হইতে কালে চিন্তিত হইয়া, অনুভূত হইয়া, প্রবাহিত হইয়া চলিবে।'

কিন্তু, কবি জানেন, শিল্পগোত্রের মানুষের এই প্রয়াসেও তার 'অহং' বা 'আমি' বিলুপ্তির হাত থেকে অব্যাহতি পায় না। তাই তিনি বলেছেন, 'আমার বাড়িঘর, আমার আসবাবপত্র, আমার শরীরমন, আমার সুখদুঃখের সামগ্রী, সমস্তই যাইবে —কেবল আমি যাহা ভাবিয়াছি, যাহা বোধ করিয়াছি, তাহা চিরদিন মানুষের ভাবনা, মানুষের বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া সজীব সংসারের মাঝখানে বাঁচিয়া থাকিবে।'

প্রবন্ধটি [ 'সাহিত্যের সামগ্রী' ] লেখা 'সোনার তরী' রচনার এক যুগ পরে, ১৩১০ সালে। প্রবন্ধের উদ্ধৃতাংশে কবির বক্তব্য হল, শিল্পে সাহিত্যে, কর্মে ও সাধনায় মানুষ বেঁচে থাকে 'যশঃশরীরে'। কিন্তু তার শরীরমন, তার সুখদুঃখের সামগ্রী, অর্থাৎ তার 'অহং'-এর অব্যাহতি নেই। সে তার 'অধিষ্ঠাত্রী দেবতা'র সোনার তরীতে তার জীবনের ফসল তুলে দিয়ে যখন বলে 'এখন আমারে লহ করুণা ক'রে', তখন সে দেখতে পায়

ঠাঁই, নাহি, ঠাঁই নাই! ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণগগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

যখন 'চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা' তখন একলা 'শূন্য নদীর তীরে' পড়ে থাকার নিরুপায় বিলাপই কবিতার অন্তিম স্তবকে ভাষা পেয়েছে। কবিতাটি জন্মমৃত্যুশাসিত মানবজীবনের মর্মান্তিক নিয়তি। এই দুর্নিবার নিয়তির কাব্যরূপ হিসাবেই কবিতাটি অসামান্য।

এবার দেখা যাক্, কবি নিজে এই কবিতার কী ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'কাব্যের অভিব্যক্তি' শীর্ষক প্রতিকূল সমালোচনাটি বেরোয় ১৩১৩ সালের কার্তিকের প্রবাসীতে। সম্ভবত এই সম্পর্কেই বীরেশ্বর গোস্বামী রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য জানতে চান। তারই উত্তরে ১৩১৩ সালের ৯ অগ্রহায়ণ কবি প্রথম 'সোনার তরী' সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য বুঝিয়ে বলেন। চিঠিতে তিনি লিখেছেন,

'সংসার আমাদের জীবনের সমস্ত কাজ গ্রহণ করে, কিন্তু আমাদিগকে তো গ্রহণ করে না। আমার চিরজীবনের ফসল যখন সংসারের নৌকায় বোঝাই করিয়া দিই তখন মনে এ আশা থাকে যে, আমারও ওইসঙ্গে স্থান হইবে, কিন্তু সংসার আমাদিগকে দুই দিনেই ভুলিয়া যায়। একবার ভাবিয়া দেখো, কত লক্ষ কোটি বিস্মৃত মানবের জীবনপাতের উপর আমাদের প্রত্যেকের জীবন গঠিত।... যাহারা যুগে যুগে নানারূপে মানুষকেই গড়িয়া তুলিতেছে তাহাদের কাজ আমাদের মধ্যে অমর হইয়া আছে, কিন্তু তাহারা নামধাম সুখদুঃখ লইয়া কোন্ বিস্মৃতির মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছে। অথচ প্রত্যেকেই সংসারকে বলিয়াছিল, 'আমার সমস্ত লও, তোমার জন্যই আমি খাটিতেছি, তোমাকে দিয়াই আমার সুখ। আমার সমস্তই লও। কিন্তু আমাকেও ঠেলিয়ো না, আমাকে ভুলিও না—আমার কাজের মধ্যে আমার চিহ্নটুকু যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়ো।' কিন্তু, এত স্থান কোথায়? আমাদের জীবনের ফসল কোনো না কোনো আকারে থাকিয়া যায়, কিন্তু আমরা থাকি না।'[১১]

এই চিঠির সোয়া-দু'বৎসর পরে, ১৩১৫ সালের ৪ঠা চৈত্র, কবি শান্তিনিকেতনে দৈনিক ভাষণদান প্রসঙ্গে পুনরায় 'সোনার তরী'র কথা বলেন। 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে তা 'তরী বোঝাই' শিরোনামায় মুদ্রিত হয়েছে।[১২] তাতে কবি প্রায় একই ভাষায় বলছেন,

'মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের খেতটুকু দ্বীপের মতো, চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত, ওই একটুখানিই তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে। সেইজন্যে গীতা বলেছেন—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥

যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চারিদিকের জল বেড়ে উঠছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ওই চরটুকু তালিয়ে যাবার সময় হল—তখন তার সমস্ত

জীবনের কর্মের যা কিছু নিত্যফল তা সে ওই সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না। কিন্তু যখন মানুষ বলে ওই সঙ্গে আমাকেও নাও আমাকেও রাখো, তখন সংসার বলে তোমার জন্যে জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার হবে কী? তোমার জীবনের ফসল যা কিছু রাখবার তা সমস্তই রাখব কিন্তু তুমি তো রাখবার যোগ্য নও।'

রবীন্দ্রনাথের 'তরী বোঝাই' এখানেই শেষ হয় নি। কিন্তু এখানে থেমে একটি কথা বলা প্রয়োজন। গীতার শ্লোকটি 'সোনার তরী' কবিতার ভাবের বিপরীত বক্তব্যকেই ভাষা দিয়েছে। উদ্ধৃত শ্লোকে ছাপার ভুলে 'পরিবেদনা' মুদ্রিত হয়েছে। আসলে শব্দটি 'পরিদেবনা'। 'পরিদেবনা'র অর্থ 'শোকনিমিত্ত বিলাপ'। [ পরি-দিবি+যুচ্। ] ওটি গীতার সাংখ্যযোগশীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৮-সংখ্যক শ্লোক। তার অর্থ, 'হে ভারত, জীবগণের শরীর উৎপত্তির পূর্বেও অব্যক্ত, বিনাশের পরেও অব্যক্ত। শুধু মধ্যকালে অর্থাৎ জীবিতকালে ব্যক্ত বা প্রকাশিত। তার জন্য পরিদেবনা অর্থাৎ বিলাপ করে লাভ কি?'

কিন্তু বিলাপই তো 'সোনার তরী'তে অভিব্যক্ত হয়েছে। সেইজন্যই বলছিলাম গীতার এই শ্লোকের তাৎপর্য 'সোনার তরী'র ভাবের প্রতিকূল। কিন্তু উদ্ধৃতিটি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন সম্ভবত 'চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা'র গূঢ়ার্থ বোঝাবার জন্যে।

তাছাড়া, ১২৯৮ সালে কবির যে-জীবনবোধ থেকে 'সোনার তরী' কবিতার উদ্ভব, শান্তিনিকেতন-পর্বে কবি সেই জীবনবোধ থেকে উত্তরণের সোপানে আরোহণ করেছেন। তিনি 'তরী বোঝাই' প্রবন্ধের শেষে বলছেন, 'প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু-না-কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না—কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। এই যে জীবনটি ভোগ করা গেল অহংটিকেই তার খাজনাস্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে। ওটি কোনোমতেই জমাবার জিনিস নয়।'

'শান্তিনিকেতন' নিবন্ধাবলীর শুধু 'তরী বোঝাই" প্রবন্ধেই নয়, পরবর্তী 'স্বভাবকে লাভ' [ ৫ চৈত্র ], 'অহং' [ ৬ চৈত্র ], 'নদী ও কূল' [ ৭ চৈত্র ], 'আত্মার প্রকাশ' [ ৮ চৈত্র ]—এই ভাষণগুলিতেও 'অহং' এবং 'আত্মা'র কথাই কবি বলেছেন। বলাই বাহুল্য, শান্তিনিকেতন-পর্বে কবি সাধক-কর্মী, কাজেই

অহং থেকে আত্মার উত্তরণকে বলেছেন 'স্বভাবকে লাভ'। বলেছেন, ' 'অহং'-এর স্বভাব হচ্ছে নিজের দিকে টানা, আর আত্মার স্বভাব হচ্ছে বাইরের দিকে দেওয়া —এই জন্যে এই দুটোতে জড়িয়ে গেলে ভারি একটা পাকের সৃষ্টি হয়।' 'অহং' প্রবন্ধে বলেছেন, 'অহং যখন তার নিজের সঞ্চয়গুলি এনে আত্মার সম্মুখে ধরবে তখন আত্মাকে বলতে হবে, না ও আমার নয়, ও আমি নেব না। ও সমস্তই বাইরে রাখতে হবে, বাইরে দিতে হবে, ওর এক কণাও আমি ভিতরে তুলব না।'

'আত্মার প্রকাশ' প্রবন্ধে বলেছেন, 'আত্মার প্রকাশরূপ যে অহং তার সঙ্গে আত্মার একটি বৈপরীত্য আছে। আত্মা ন জায়তে ম্রিয়তে। না জন্মায় না মরে। অহং জন্মমরণের মধ্য দিয়ে চলেছে। আত্মা দান করে, অহং সংগ্রহ করে, আত্মা অন্তরের মধ্যে সঞ্চরণ করতে চায়, অহং বিষয়ের মধ্যে আসক্ত হতে থাকে।'

বলা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথের এই 'অহং' ও 'আত্মা'র স্বরূপ-বিশ্লেষণ কোনো আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিশ্লেষণের অঙ্গীভূত নয়। এটি নিতান্তই মনস্তত্ত্বের কথা। বরং শান্তিনিকেতন-পর্বে রবীন্দ্রনাথ 'এখন আমারে লহ করুণা ক'রে'—'সোনার তরী'র এই 'অহং'-এর মানবিক মনোবাসনাকে ঈষৎ ধিক্কৃতই করেছেন। 'স্বভাবকে লাভ' ভাষণে বলেছেন, 'ওই যে একটা ক্ষুধিত অহং আছে, যে-কাঙাল সব জিনিসই মুঠো করে ধরতে চায়, যে-কৃপণ নেবার মতলব ছাড়া কিছু দেয় না, ফলের মতলব ছাড়া কিছু করে না, সেই অহংটাকে বাইরে রাখতে হবে, তাকে পরমাত্মীয়ের মতো সমাদর করে অন্তঃপুরে ঢুকতে দেওয়া হবে না।' কবির এই মনোভাব সাধক-জনোচিত মনোভাব, মানব-সাধারণের স্বাভাবিক মনোভাব নয়। আবার 'স্বভাবকে লাভ' ভাষণের পরদিনই 'অহং' ভাষণে কবি বলছেন, 'দানের সামগ্রীটিকে প্রথমে একবার 'আমার' করে নেবার জন্যে এই অহং-এর দরকার। ……বনের ফুল তো দেবতার সম্মুখেই ফুটছে। কিন্তু তাকে আমার ডালিতে সাজিয়ে একবার আমার করে নিলে তবে তার দ্বারা দেবতার পূজা হয়।…অহং আমাদের সেই ঘট, সেই ডালি। তার বেষ্টনের মধ্যে যা এসে পড়ে তাকেই 'আমার' বলবার অধিকার জন্মায়—একবার সেই অধিকারটি না জন্মালে দানের 'অধিকার জন্মায় না।' রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য মানবস্বভাবসম্মত বলেই 'স্বভাবকে লাভ'-এর চেয়ে সত্যতর বলে আমরা মনে করি।

৫

এবার 'সোনার তরী'র অন্তরঙ্গ কাব্যবিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে।

কবিতাটি লেখা ১২৯৮ সালের ফাল্গুন মাসে। অথচ কবিতার প্রেক্ষাপট ঘন বর্ষার,—শ্রাবণ মাসের। 'রবিরশ্মি'-কার কবিকে এই প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তরে বলেন, 'যেদিন বর্ষার অপরাহ্ণে খরস্রোত পদ্মার উপর দিয়ে কাটা ধানে ডিঙি-নৌকা বোঝাই করে মগ্নপ্রায় চর থেকে চাষীরা এপারে চলে আসছে, সেদিনটা সন তারিখ মাস পার হয়ে আজও আমার মনে আছে। সেই দিনেই 'সোনার তরী' কাব্যের সঞ্চার হয়েছিল মনে, তার প্রকাশ হয়েছিল কবে তা আমার মনেও নেই।' অর্থাৎ কবির মনে 'কাব্যের সঞ্চার' আর শিল্পরূপে তার 'প্রকাশ'-এর মাঝখানে 'recollection in tranquillity'র ব্যবধান অবশ্যই স্বীকার্য, তবে সে ব্যবধান কোন নিয়ম মেনে চলে না, তা মিনিট-ঘণ্টা-দিন-মাস-বৎসরের গণনায় হিসাব করা যায় না।

'সোনার তরী'র ছন্দ নিয়ে ছান্দসিক-মহলে কিছু মতভেদ আছে। কিন্তু কবিতাটি যে তানপ্রধান বা মিশ্র-কলাবৃত্ত ছন্দে লেখা নয়, ওটি যে বিশুদ্ধ ধ্বনি-প্রধান বা কলাবৃত্ত ছন্দেই লেখা তার প্রমাণ উপান্ত পংক্তিতে পাওয়া যাবে। 'শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি' বাক্যে 'শূন্য' তিনমাত্রার মর্যাদা পেয়েছে, দুই মাত্রার নয়। তাছাড়া কবিতায় যে বিষাদ-করুণ সুরটি মর্মরিত হয়ে উঠেছে, তানপ্রধান রীতির মতো টেনে-টেনে পড়তে গেলে তার আবেদন ব্যর্থ হবে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ আর একটিবারমাত্র এই স্তবকবন্ধ ব্যবহার করেছিলেন। সেই কবিতাটিও আছে 'সোনার তরী'তে। তার নাম 'অনাদৃত'। ছিন্নপত্রাবলীর সাক্ষ্য থেকে দেখা যায়, 'অনাদৃত' কবিতাটির প্রথম নাম ছিল 'জাল-ফেলা'।[১৩] জাল-ফেলা বা অনাদৃত কবিতাটি লেখা হয় 'সোনার তরী' রচনার প্রায় এক বৎসর পরে। ২২ ফাল্গুন ১২৯৯ তারিখে। ১৩০০ সালের ৩০ আষাঢ় এই কবিতাটি সম্পর্কে কবি ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন, 'একটা অলক্ষিত অচেতন নৈপুণ্যবলে ভাবগুলি কবির হাতে বিচিত্র আকার ধারণ করে। সেই সৃজন-ক্ষমতাই কবিত্বের মূল।…উপরের এই ভূমিকার পরে আমার সেই 'জাল-ফেলা' কবিতাটার ব্যাখ্যা একটু সহজ হবে।…মনে কর্ একজন ব্যক্তি তার জীবনের প্রভাতকালে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখছিল—সে সমুদ্র তার আপনার মন কিম্বা ঐ বাহিরের বিশ্ব কিম্বা উভয়ের সীমানা-মধ্যবর্তী একটি ভাবের পারাবার, সে কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। যাই হোক, সেই অপূর্ব সৌন্দর্যময় অগাধ সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে লোকটার মনে হল এই রহস্য-পাথারের মধ্যে জাল ফেলে দেখা যাক-না কী পাওয়া যায়। এই বলে তো সে ঘুরিয়ে জাল

ফেললে। নানা রকমের অপরূপ জিনিস উঠতে লাগল—কোনোটা বা হাসির মতো শুভ্র, কোনোটা বা অশ্রুর মতো উজ্জ্বল, কোনোটা বা লজ্জার মতো রাঙা। মনের উৎসাহে সে সমস্ত দিন ধরে ঐ কাজই কেবল করলে—গভীর তলদেশে যে-সকল সুন্দর রহস্য ছিল সেইগুলিকে তীরে এনে রাশীকৃত করে তুললে। এমনি করে জীবনের সমস্ত দিনটি যাপন করলে। সন্ধ্যার সময় মনে করলে এবারকার মতো তো যথেষ্ট হয়েছে, এখন এইগুলি নিয়ে তাকে দিয়ে আসা যাক্‌গে। কাকে যে, সে কথাটা স্পষ্ট করে বলা হয়নি—হয়তো তার প্রেয়সীকে, হয়তো তার স্বদেশকে। কিন্তু সে তো এ-সমস্ত অপূর্ব জিনিস কখনও দেখেনি। সে ভাবলে এগুলো কী, এর আবশ্যকই বা কী, এতে কী অভাব দূর হবে, দোকানদারের কাছে যাচিয়ে দেখলে এর কতই বা মূল্য হতে পারবে? এক কথায়, এ বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস ভূগোল অর্থনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি কিছুই নয়—এ কেবল কতকগুলো রঙিন ভাব মাত্র, তারও যে কোন্‌টার কী নাম কী বিবরণ তাও ভালো পরিচয় পাওয়া যায় না। ফলত সমস্ত দিনের জাল-ফেলা অগাধ সমুদ্রের এই রত্নগুলি যাকে দেওয়া গেল সে বললে, এ আবার কী? জেলেরও মনে অনুতাপ হল, 'সত্যি বটে, এ তো বিশেষ কিছু নয়, আমি কেবল জাল ফেলেছি আর তুলেছি—আমি তো হাটেও যাইনি পয়সাকড়িও খরচ করিনি, এর জন্যে তো আমাকে কাউকে এক পয়সা খাজনা কিম্বা মাশুল দিতে হয়নি!' সে তখন কিঞ্চিৎ বিষণ্ণমুখে লজ্জিতভাবে সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ঘরের দ্বারে বসে বসে একে একে রাস্তায় ফেলে দিলে। তার পরদিন সকালবেলায় পথিকরা এসে সেই বহুমূল্য জিনিসগুলি দেশে বিদেশে আপন আপন ঘরে নিয়ে গেল। বোধ হচ্ছে এই কবিতাটি যিনি লিখেছেন তিনি মনে করছেন, তাঁর গৃহকার্যনিরতা অন্তঃপুরবাসী জন্মভূমি, তাঁর সমসাময়িক পাঠকমণ্ডলী, তাঁর কবিতাগুলির ঠিক ভাবগ্রহ করতে পারছে না—তার যে কতখানি মূল্য সে তাদের জ্ঞানগোচর নয়—অতএব এখনকার মতো এ-সমস্ত পথেই ফেলে দেওয়া যাচ্ছে, 'তোমরাও অবহেলা করো আমিও অবহেলা করি', কিন্তু এ রাত্রি যখন পোহাবে তখন 'পস্টারিটি' এসে এগুলি কুড়িয়ে নিয়ে দেশে বিদেশে চলে যাবে। কিন্তু তাতে ঐ জেলে লোকটার মনের আক্ষেপ কি মিটবে! যাই হোক, 'পস্টারিটি' যে অভিসারিণী রমণীর মতো দীর্ঘরাত্রি ধরে ধীরে ধীরে কবির দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং হয়তো নিশিশেষে এসে উপস্থিত হতেও পারে এ সুখকল্পনাটুকু কবিকে ভোগ করতে দিতে কারও বোধ হয় আপত্তি না হতেও পারে।'[১৪]

বলাই বাহুল্য, 'সোনার তরী'র সঙ্গে 'পরিত্যক্ত' কবিতাটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। শুধু 'সোনার তরী'র সঙ্গেই নয়, কবির ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁর কাব্যসাধনা যে উপযুক্ত সমাদৃত হয়নি, তারই অভিমান 'অনাদৃত' কবিতায় অভিব্যক্ত। কবির ভরসা 'পস্টারিটি'র ওপর। 'কিন্তু তাতে ঐ জেলে লোকটার মনের আক্ষেপ কি মিটবে ?' কবির এই অভিমান 'চিত্রা'র 'সাধনা' কবিতায় স্পষ্টতর হয়েছে। 'আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়নজলে / ব্যর্থ সাধনখানি।' 'সোনার তরী'র ভিত্তিভূমি অবশ্য স্বতন্ত্র। 'অনাদৃত' বা 'সাধনা' কবিতায় কবি তাঁর 'ব্যর্থ সাধনা'র কথাই বলেছেন। 'সোনার তরী'তে আছে, সাধক-আত্মার অভিমান নয়, ভিখারি 'অহং'-এর বিলাপ। কবিতাটি রচনার মাস-কয়েক আগে কবি ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন, 'কেউ থাকে না, কিছুই থাকে না, সেটা এমনি সত্য যে স্মরণও থাকে না, শোকও থাকে না—এবং সেইটে মনে করলে মানুষ আরও ব্যাকুল হয়ে ওঠে যে, কেবল যে থাকব না তা নয়, কারও মনেও থাকব না। একেবারে জগতের অন্তর বাহির থেকে লোপ।'[১৫] মানুষের 'অহং'-এর এই বেদনাই 'সোনার তরী'র বেদনা।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, 'সোনার তরী'র মতো 'অনাদৃত' কবিতাটিও ধ্বনিপ্রধান বা কলাবৃত্ত ছন্দে রচিত। সোনার তরীর পাণ্ডুলিপিতে তৃতীয় স্তবকে 'ভাঙ্গে দুধারে' মুদ্রিত আকারে হয়েছে 'ভাঙে দুধারে'। তেমনি অনাদৃতের চতুর্থ স্তবকের 'ক্ষুধাতৃষ্ণা' 'ক্ষুধাতৃষা' হলেই ছন্দ নিখুঁত হত। উপান্ত স্তবকে 'দুখ' [কোনো দুখ নাহি যার] এবং 'তৃষা' [কোনো তৃষা বাসনার] আমাদের বক্তব্যকেই সমর্থন করছে।

৬

পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, 'সোনার তরী'র প্রচলিত পাঠগুলির ভাষাগত পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই।[১৬] পাণ্ডুলিপিতেই শুধু প্রথম স্তবকে কিছু-কিছু অদল-বদল রয়েছে। পাণ্ডুলিপির পঞ্চম ও ষষ্ঠ পংক্তি প্রথমে ছিল :

ভরানদী খরধারা
বহে ত্বরসা।

দ্বিতীয় পাঠ হল :

বহে নদী ত্বরধারা
খর-পরশা।

তারপর অন্তিম পাঠ দাঁড়ালো :

ভরা নদী খুরধারা
খর-পরশা।

তিন-তিনবার এই পরিমার্জনের ফলে পাণ্ডুলিপিতে প্রথম স্তবকের লিপিচিত্র অন্যান্য স্তবক থেকে ঈষৎপৃথক হয়ে পড়েছিল। অন্যান্য পাঁচটি স্তবকে আছে ছ-টি চরণ। ৮+৫ / ৮+৫ / ৮ / ৮ / ৮+৫। পাণ্ডুলিপিতে প্রথম স্তবকটি ভেঙে ছ-টি চরণের বদলে হয়েছে সাতটি চরণ। গ্রন্থাকারে মুদ্রিত পাঠ এক এক গ্রন্থে এক এক রকম করে সাজানো। 'সোনার তরী' গ্রন্থের প্রচলিত সংস্করণে [পৌষ ১৩৭৬] প্রতিটি স্তবকে আছে সাতটি পংক্তি। তদুপরি প্রথম, দ্বিতীয় ও শেষ চরণের আটের পূর্ণপর্ব এবং পাঁচের অপূর্ণ পর্বের মাঝখানে অতিরিক্ত ফাঁক দেওয়া আছে। উপান্ত চরণটি দুই পংক্তিতে বিভক্ত। রবীন্দ্ররচনাবলী সংস্করণে [ বিশ্বভারতী ] প্রতি পর্বে আছে সাত পংক্তি, কিন্তু ৮+৫ পংক্তির পূর্ণপর্ব ও অপূর্ণপর্বের মধ্যে অতিরিক্ত ফাঁক নেই। 'চয়নিকা'তে আছে পাণ্ডুলিপির আদি-ভিন্ন অন্যান্য স্তবকের মতোই ছ-টি চরণ। 'সঞ্চয়িতা'য় সম্ভবত স্থানসংকোচনের জন্য ছয় চরণ হয়েছে পাঁচ চরণ। তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের মাঝখানে অতিরিক্ত ফাঁক দিয়ে দুটি চরণই এক পংক্তিতে সাজানো হয়েছে। পাণ্ডুলিপির 'খুরধারা' মুদ্রিত গ্রন্থাদিতে হয়েছে 'ক্ষুরধারা'।

এহো বাহ্য। পাণ্ডুলিপিতে দ্বিতীয় স্তবকের উপান্ত চরণে 'গ্রামখানি'র পরে একটি কমা-চিহ্ন ছিল। মুদ্রিত পাঠগুলিতে এই কমা-চিহ্ন লুপ্ত হয়েছে। অথচ এই কমা-চিহ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পাণ্ডুলিপিতে ছিল

পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়া মসীমাখা
গ্রামখানি, মেঘেঢাকা প্রভাতবেলা।

এই কমা-চিহ্ন থাকার ফলে দুটি চিত্র ছিল পৃথক। প্রথম চিত্র ছিল 'পরপারে দেখি আঁকা / তরুছায়ামসীমাখা / গ্রামখানি'। দ্বিতীয় চিত্র ছিল [ গ্রামখানি ] 'মেঘেঢাকা প্রভাতবেলা'। কমা-চিহ্ন বিলুপ্ত হওয়ায় দুটি চিত্র এক হয়ে যাওয়ার ফলে শব্দার্থ-জীবিতেরা ভুল ব্যাখ্যার সুযোগ পেয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'পরপারে তরুছায়া মসীমাখা মেঘে-ঢাকা গ্রামখানির ছবিখানি রবিবাবুর এই ভক্তদের নিশ্চয় বড়ই ভালো লাগিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মেঘে-ঢাকা গ্রামে তরুচ্ছায়া হয় না, অন্তত এপার হইতে তাহা দেখা যায়

না। রৌদ্র হইলেই ছায়া হয়।'[১৭] কমা-চিহ্ন থাকলে, এবং তার যথার্থ-মর্যাদা দেওয়া হলে, রায় মহাশয় এই কদর্থ করার সুযোগ পেতেন না।

৭

'সোনার তরী'র রূপকল্পটি কিন্তু বাংলা কাব্যসাহিত্যে একেবারে অভূতপূর্ব নয়। এই প্রসঙ্গে রামপ্রসাদের বিখ্যাত গানটির কথা মনে পড়বেই—

মন তুমি কৃষি-কাজ জান না
এমন মানব-জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা॥
কালীর নামে দেওরে বেড়া
ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া
তার কাছেতে যম ঘেঁষে না॥
অদ্য অব্দশতান্তে বা,
বাজাপ্ত হবে জান না।
এখন আপন ভেবে যতন ক'রে
চুটিয়ে ফসল কেটে নে না॥
* * *

রামপ্রসাদের এই গীতিকবিতাটির পরে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'কে সে-যুগে 'একেবারে অর্থশূন্য এবং স্वবিরোধী' কেন মনে হয়েছিল তা ভাবতে বিস্ময় লাগে। পার্থক্য অবশ্যই আছে, রামপ্রসাদের গানে মানবজমিনকে পতিত না রেখে আবাদ ক'রে সোনা ফলানোর কথা আছে। যমের দুর্ভাবনা রামপ্রসাদের মনেও ছিল। কিন্তু তিনি বলেছেন, মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া দিলে 'তার কাছেতে যম ঘেঁষে না'। অর্থাৎ, ভক্ত রামপ্রসাদ বুঝেছিলেন মানবজমিনে কৃষিকাজ ফলপ্রসূ করতে হলে কালীর নামে বেড়া দিতে হবে। তাহলেই 'অদ্য অব্দশতান্তে বা' ফসল বাজেয়াপ্ত হবার কোনোই সম্ভাবনা থাকে না। 'সোনার তরী'র কবি ভক্ত নন, শুদ্ধমাত্র কবি। তদুপরি 'অহং'কে বিসর্জন দেওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফসল তিনিও ফলিয়েছেন, সোনার তরীতে তার স্থানও হয়েছে, কিন্তু তখনও অহংকারকে তিনি বর্জন করতে পারেননি বলেই অহং-এর দুঃখও অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে।

অর্থাৎ শরণাগতির ফলে রামপ্রসাদ যেখানে মৃত্যুভয় জয় করতে পেরেছেন, সেখানে অহং-কার ও মম-কার উৎসর্জিত না হওয়ায় অহংকৃত কবিশিল্পীর 'আমিও বেঁচে থাকতে চাই'—এই আকাঙ্ক্ষা [ শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি ] বিফল হয়েছে।

কবিতাটির প্রতীয়মান অর্থ অভিব্যঞ্জিত করার প্রয়োজনে যেটুকু বাচ্যার্থ ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা কিছু আছে বলে আমাদের মনে হচ্ছে না। বলাই বাহুল্য, এখানে নদীস্রোত কালস্রোতেরই ব্যঞ্জনাবহ। তরীটি যখন কাঠের নৌকো নয়, এমন কি ইস্পাতের তৈরি জাহাজও নয়, ওটি নিতান্তই 'সোনার তরী', তখন অবাস্তবতার তর্ক কুতর্ক ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

কবিতাটির প্রথম স্তবকে আছে, নদীতীরে পাকা ধান কাটতে না কাটতেই 'এল বরষা'। 'রাশি রাশি ভারা ভারা' ধান কাটা শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু 'ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরশা' হয়ে সে ধান অতল জলে ভাসিয়ে দিতে বা ডুবিয়ে দিতে দ্রুত এগিয়ে আসছে। ছিন্নপত্রাবলীর একখানি চিঠিতে বর্ষার চাষীদের বাস্তব দুর্গতির বর্ণনা আছে। কবি লিখছেন, 'আমাদের চরের মধ্যে নদীর জল প্রবেশ করেছে। চাষারা নৌকো বোঝাই করে কাঁচা ধান কেটে নিয়ে আসছে—আমার বোটের পাশ দিয়ে তাদের নৌকো যাচ্ছে আর ক্রমাগত হাহাকার শুনতে পাচ্ছি। যখন আর চার দিন থাকলে ধান পাকত তখন কাঁচা ধান কেটে আনা চাষার পক্ষে যে কী নিদারুণ তা বেশ বুঝতেই পারছিস। যদি ঐ শিষের মধ্যে দুটো-চারটে ধান একটু শক্ত হয়ে থাকে এই তাদের আশা।' চিঠিখানি লেখা ৪ জুলাই, ১৮৯৩। অর্থাৎ 'সোনার তরী' কবিতাটি লেখার পরে। কিন্তু লেখার আগেও অনুরূপ অভিজ্ঞতা শিলাইদহ-পদ্মা পর্বে কবির হয়েছিল, তা বলা অবাস্তব হবে না। 'ভরানদী ক্ষুরধারা খরপরশা'ও কবির বাস্তব-অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত কবিভাষা। ছিন্নপত্রাবলীর ২১ জুলাই ১৮৯২ তারিখে লেখা ৬৮-সংখ্যক চিঠিতে বর্ষার পদ্মা যে কী বিভীষণা মূর্তি পরিগ্রহ করে, তার বর্ণনায় কবি লিখেছেন, 'তাকে মনে করলে আমার কালীমূর্তি মনে হয—নৃত্য করছে, ভাঙছে, এবং চুল এলিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। মাঝিরা বলছিল, নতুন বর্ষায় পদ্মার খুব 'ধার' হয়েছে। ধার কথাটা কিন্তু ঠিক। তীব্র স্রোত যেন চক্‌চকে খড়্গের মতো, পাৎলা ইস্পাতের মতো একেবারে কেটে চলে যায়।'

দ্বিতীয় স্তবকে আছে নদীর দুপারের কথা। এপারে চাষের ক্ষেত, সেখানে

ছোট ক্ষেতে চাষী 'একেলা'। দূরে ওপারে গ্রামখানি তরুছায়ামসীমাখা, এবং প্রভাতবেলা মেঘে ঢাকা। চাষীর পারাপারের উপায় নেই।

তৃতীয় স্তবকে সোনার তরীতে 'গান গেয়ে তরী বেয়ে' একজনকে আসতে দেখে চাষীর মনে ভরসা ফিরে এসেছে। কর্ণধার ভ্রূক্ষেপহীন ভরা-পালে এগিয়ে চলেছে। প্রথম স্তবকে পদ্মার তীব্র স্রোত ছিল 'চক্‌চকে খড়্গের মতো', 'পাৎলা ইস্পাতের মতো একেবারে কেটে চলে যায়'। তৃতীয় স্তবকে ভরা-পালে চলে-যাওয়া সোনার তরীর কাছে তারা 'নিরুপায় / ভাঙে দুধারে'। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'তৃতীয় স্তবকে 'ঢেউগুলি' যে 'নিরুপায়' তারও অন্য কোনো কারণ নেই।'[১৮] আমাদের কিন্তু মনে হয়, চাষীর ভরসার হেতু আছে ওই সাংকেতিক বাক্যটিতে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার উপায় ওই সোনার তরীতেই আছে। তদুপরি, 'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে'। চেনার একটি সংকেত হল 'গান গেয়ে তরী বাওয়া'। গীতবিতানের প্রেম-পর্যায়ের যে ২৩৫-সংখ্যক গানটির কথা পূর্বে বলা হয়েছে তার শেষ পংক্তিটির সম্ভাব্য তাৎপর্য যথাস্থানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তবু, অবিশ্বাসীর সংশয় ওতেও ঘুচবে না। কবি কেন বললেন, 'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।' এই বাক্যের 'যেন' শব্দটিই গোল বাধিয়েছে। কিন্তু ওই অব্যয়টি শুধু 'সংশয়' অর্থেই ব্যবহৃত হয় না। স্বীকারকরণেও ওটি চলে। 'তাই যেন হল' বললে মেনে নেওয়ার অর্থই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাছাড়া, 'যেন' যেমন 'সংশয়' অর্থে ব্যবহৃত হয় তেমনি 'বিস্ময়' অর্থেও অর্থালংকারে তার ব্যবহার দুর্লভ নয়। 'অথচ' অর্থটি তো কবি নিজেই গ্রহণ করেছেন। 'অপরিচিত অথচ পরিচিত।' কবিতাটির ব্যাখ্যায় সোনার তরীর কর্ণধারকে কবি বলেছেন, 'অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।' অর্থাৎ এ কবিতায় নদীস্রোত যেমন কালস্রোত, কর্ণধার তেমনি পুরুষ নয়, নারী। এই প্রসঙ্গে কবির স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদটি উদ্ধারযোগ্য:

**The rain fell fast. The river rushed and hissed. It licked up and swallowed the island, while I waited alone on the lessening bank with my sheaves of corn in a heap.**

**From the shadows of the opposite shore the boat crosses with a woman at the helm.**[১৯]

এই '**woman at the helm**'-কেই কবি বলেছেন 'অধিষ্ঠাত্রী দেবতা'। 'সোনার তরী'র শেষের কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় তিনিই সোনার তরীতে করে

কবিকে নিয়ে চলেছেন 'ঊর্মিমুখর সাগরের পার'। 'সোনার তরী'তে তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন 'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় তাঁকে বলেছেন, 'বিদেশিনী'। 'বিদেশিনী'র অর্থ কবি অন্যত্র বিশ্লেষণ করেছেন। 'বিচিত্রিতা'র 'নীহারিকা' কবিতায় তিনি বলছেন, 'চেন কিম্বা নাই বা আমায় চেন, / তবু তোমার আমি।' অর্থাৎ এই 'বিদেশিনী' 'অধিষ্ঠাত্রী দেবতা'ই কবির জীবন-দেবতা। 'আত্ম-পরিচয়' গ্রন্থে 'জীবনদেবতা'র স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, 'যে-আবির্ভাব অতীতের মধ্য হইতে অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালের উপরে প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া আমাকে কাল-মহানদীর নূতন নূতন ঘাটে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন',......তিনিই কবির জীবনদেবতা। এই জীবনদেবতাই 'সোনার তরী'র কর্ণধার।

চতুর্থ স্তবকে জীবনদেবতার সোনার তরীতে কবি তাঁর ক্ষেতের 'সোনার ধান' তুলে দিতে চেয়েছেন। রামপ্রসাদ বলেছিলেন, মানবজমিনকে আবাদ করলে 'সোনা' ফলতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই 'সোনা' একই অর্থের ব্যঞ্জনাবহ।

পঞ্চম স্তবকে কবি 'এতকাল নদীকূলে' 'যাহা লয়ে' ভুলে ছিলেন সমস্তই জীবন-দেবতার সোনার তরীতে তুলে দিয়ে বললেন, 'এখন আমারে লহ করুণা করে'। কিন্তু, কবিতার অন্তিম স্তবকে দেখা গেল, জীবনদেবতা তাঁর সোনার ফসলই গ্রহণ করলেন, তাঁকে গ্রহণ করলেন না।

কেন করলেন না, এ প্রশ্নের উত্তর কবিতায় নেই। কেননা, কবিতা ব্যাখ্যা করে না, আনন্দ-বেদনাকে প্রকাশ করে মাত্র। কবিতার প্রথম স্তবকে ছিল 'কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।' আমরা বলেছিলাম, কেন ভরসা নেই, কিসের ভরসা নেই, এই জিজ্ঞাসাই কবিতাটি সম্পর্কে কাব্যরসিকের প্রথম জিজ্ঞাসা। কবিতাটির অন্তিম স্তবকে পৌঁছেও দেখা গেল, এই জিজ্ঞাসাই কবিতাটির অন্তিম জিজ্ঞাসাও বটে।

বলাই বাহুল্য, কবি পরে অহং এবং আত্মার পরিভাষা আশ্রয় করে একটি ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা বলেছি, তাতে আত্মার তুলনায় অহং-কে অনেকখানি ছোট করে দেখা হয়েছে। 'শান্তিনিকেতন' নিবন্ধমালায় 'অহং' নিবন্ধে অবশ্য কবি তাঁর বক্তব্যকে কিছুটা পরিশোধিত করেছিলেন। আসলে, 'সোনার তরী' কবির একটি বিষণ্ণ মুহূর্তেরই বাণীরূপ। যে-গ্রন্থের আদিতে এই কবিতাটি স্থান পেয়েছে সেই গ্রন্থেরই শেষে আছে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। সেখানে সোনার ফসলের কোনো প্রসঙ্গ নেই, কবি স্বয়ং তাঁর অহং-কে নিয়েই জীবনদেবতার

সোনার তরীতে স্থান পেয়েছেন। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র তৃতীয় স্তবকে কবি বলছেন,

হু হু করে বায়ু ফেলিছে সতত
দীর্ঘশ্বাস।
অন্ধ আবেগে করে গর্জন
জলোচ্ছ্বাস।
সংশয়ময় ঘননীলনীর,
কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর,
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া
দুলিছে যেন।
তারি পরে ভাসে তরণী হিরণ,
তারি পরে পড়ে সন্ধ্যাকিরণ,
তারি মাঝে বসি এ নীরব হাসি
হাসিছ কেন?
আমি তো বুঝি না কী লাগি তোমার
বিলাস হেন?

এখানেও নিরুদ্দেশ যাত্রা আপাতদৃষ্টিতে রহস্যময়, অন্তিম স্তবকে যাত্রার চেয়ে অবশ্য যাত্রাসঙ্গিনীর সঙ্গই কবির কাছে অধিকতর কাম্য বলে বিবেচিত হয়েছে—

আঁধার রজনী আসিবে এখনি
মেলিয়া পাখা,
সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক
পড়িবে ঢাকা।
শুধু ভাসে তব দেহসৌরভ,
শুধু কানে আসে জল-কলরব,
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে, তব
কেশের রাশি।
বিকলহৃদয় বিবশশরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর,
'কোথা আছ, ওগো, করহ পরশ
নিকটে আসি।'

কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না
নীরব হাসি।

এখানেও নিরুদ্দেশ যাত্রার কর্ণধার, কবির জীবনদেবতা, তাঁর সৌন্দর্যপ্রয়াণের যাত্রাসঙ্গিনী 'যথার্থ দোসরে'র স্থান গ্রহণ করেও কবির মনোবাসনাকে অতৃপ্তই রেখেছেন। তবু, 'সোনার তরী'তে কবির 'সোনার ফসল'ই বড়ো হয়ে উঠেছিল, কবি ছিলেন উপেক্ষিত; 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় যাত্রাসঙ্গিনীকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সার্থক না হলেও কবি তাঁর সোনার তরীতেই স্থান পেয়েছেন, আপাতত এইটুকুই প্রধান লাভ। তাই 'সোনার তরী'র নৈরাশ্য, প্রায় দু'বৎসরের ব্যবধানে, ধ্যানে এবং উপলব্ধিতে, নিরুদ্দেশ যাত্রায় অনেকটা তিরোহিত হয়েছে। এবং তাতেই পরবর্তী কাব্য 'চিত্রা'র অন্তর্যামী-জীবনদেবতার লীলার প্রেক্ষাপট উন্মোচিত হয়েছে।

## উল্লেখপঞ্জী

১. 'ক্ষণিকার' 'আবির্ভাব' কবিতা প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি। দ্রষ্টব্য, রবিরশ্মি-২, সং ১৩৭৮, পৃ ২৩।
২. ব্রাডলি তাঁর ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রবন্ধটি এই উক্তি দিয়েই শুরু করেন। দ্রষ্টব্য, Oxford Lectures on Poetry, সং ১৯৫০, পৃ ৯৯।
৩. দ্রষ্টব্য, নন্দরাণী চৌধুরীর 'সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' [ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সাহিত্য ], সং ১৩৭৭। পৃ ৩।
৪. রথীন্দ্রনাথ রায়-সম্পাদিত দ্বিজেন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৮৪০-৪৫।
৫. দ্রষ্টব্য, 'চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী', ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, সং ১৩৭৩, পৃ ৫৩-৫৫।
৬. 'একটি পুরাতন মাঝির গান', দ্বিজেন্দ্ররচনাবলী-২, পৃ ৮৩৯।
৭. 'সাহিত্য' [ বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৯ ], পৌষ ১৩২০। প্রবন্ধটি শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'রবীন্দ্রসাগরসংগমে' গ্রন্থে উৎকলিত হয়েছে। পৃ ৩৯৪-৩৯৯।
৮. 'বলাকা'র ৮-সংখ্যক কবিতা। রচনা, ৩ পৌষ ১৩২১।
৯. দ্রষ্টব্য : বুদ্ধদেব বসুর গ্রন্থ 'কবি রবীন্দ্রনাথ', ভারবি, আষাঢ় ১৩৭৩, পৃ ২০-২১।
১০. 'সাহিত্যের সামগ্রী', সাহিত্য, র-র-৮, পৃ ৩৪৩-৩৪৮।
১১. 'সোনার তরী', সং পৌষ ১৩৭৬, পৃ ২১৩।
১২. র-র-১৪, পৃ ৩৭৫।

১৩. রবীন্দ্রনাথের কুড়ি-একুশ বৎসর বয়সে লেখা 'বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থে 'মাছ ধরা' বলে একটি অনুচ্ছেদ আছে। অনুচ্ছেদটি বেরিয়েছিল ১২৮৮ সালের আশ্বিনের 'ভারতী'তে।

১৪. 'ছিন্নপত্রাবলী', পত্রসংখ্যা ১০৭। পৃ ২৩০-২৩২। 'চিত্রা'র '১৪০০ সাল' কবিতাটি এই 'পস্টারিটি'র উদ্দেশেই নিবেদিত।

১৫ তদেব, পত্রসংখ্যা ২৬। পৃ ৬৬।

১৬ দ্রষ্টব্য : 'কবি ও কবিতা', বর্ষ ৯, সংখ্যা ১, পৃ ১-৩।

১৭. রথীন্দ্রনাথ রায়-সম্পাদিত দ্বিজেন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৮৪৪।

১৮. 'কবি রবীন্দ্রনাথ', পৃ ২১।

১৯ **The Fugitive and other Poems,** দ্রষ্টব্য **Collected Poems and Plays of Rabindranath Tagore, Macmillan, 1952** পৃ ৪১২।

# মাতৃ-অভিষেক

১

'বন্দে মাতরম্' যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র প্রাণমন্ত্র, 'ভারততীর্থ' কবিতাটি তেমনি রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের মর্মবাণী। সাময়িকপত্রে [ প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৭ ] প্রকাশের সময় 'ভারততীর্থে'র নাম ছিল 'মাতৃ-অভিষেক'।[১]

'বন্দে মাতরম্' আনন্দমঠের প্রাণমন্ত্র হলেও, কারো কারো মতে, উপন্যাস রচনার পূর্বেই সংগীতটির জন্ম হয়েছিল। অন্তত, সংগীতরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃ-বন্দনা-রচনার বহুপূর্বে 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র 'আমার দুর্গোৎসব' নিবন্ধে [ বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১২৮১ ] কমলাকান্তরূপী বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃস্তোত্র উচ্চারিত হয়েছে। শারদ সপ্তমীতে দুর্গাপ্রতিমা দর্শন করতে গিয়ে কমলাকান্ত বলছেন, 'চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকা-রূপিণী—অনন্তরত্ন-ভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা।...এ মূর্তি এখন দেখিব না...কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণপ্রহারিণী, শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।'[২] এই 'সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা'ই বঙ্কিমচন্দ্রের 'জননী জন্মভূমি'।

রবীন্দ্রনাথের 'মাতৃ-অভিষেক' [ ভারততীর্থ ] গোরা উপন্যাসের মর্মবাণী হলেও তা উপন্যাস-রচনা সম্পূর্ণ হওয়ার মাস কয়েক পরে রচিত হয়েছিল। 'গোরা' প্রবাসীতে ১৩১৪ সালের ভাদ্রে শুরু হয়, সমাপ্ত হয় ১৩১৬ সালের ফাল্গুনে। 'মাতৃ-অভিষেক' রচিত হয় ১৩১৭ সালের ১৮ আষাঢ়। অর্থাৎ জন্মভূমি সম্পর্কে গোরার চেতনা সত্যমূর্তিতে সম্পূর্ণায়িত হবার পর সেই ভাবসত্যের ভিত্তিতেই মাতৃ-অভিষেক রূপলাভ করেছে। সেই ভাবসত্যের স্বরূপ-উন্মোচন বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ।

২

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে ১২৮৭ সালের চৈত্রে শুরু হয়, শেষ হয় ১২৮৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ তার কয়েক মাসের মধ্যে, ১২৮৯ সালেই। অর্থাৎ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে। 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের রূপকল্প হিন্দুভক্তের ধ্যানসম্ভূত। 'আনন্দমঠে'র স্বদেশমন্ত্রও হিন্দুত্বের ঐতিহ্যেই

পরিবর্ধিত। তাছাড়া কমলাকান্তের 'জননী জন্মভূমি' এবং বন্দে মাতরমের 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' মাতৃপ্রতিমাও সপ্তকোটি বঙ্গসন্তানেরই জননী। 'আনন্দমঠে'র সন্তানগণও মন্দিরে মন্দিরে যে প্রতিমা নির্মাণ করেছিলেন তিনিও 'বঙ্গ-প্রতিমা'। অর্থাৎ বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থপাদে যে হিন্দু-পুনরভ্যুত্থান যুগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশমন্ত্র তারই প্রেরণায় উদ্গীত।

এই অনুষঙ্গে 'গোরা' উপন্যাসের আখ্যানভাগের কালসীমার প্রসঙ্গও অনিবার্য-ভাবেই আসে। গোরার নায়ক গৌরমোহনের জন্ম সিপাই বিদ্রোহের সময়। অর্থাৎ ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। কাহিনী রচনার সময় গোরার বয়স ২৫ বৎসর। অর্থাৎ গোরা উপন্যাসের কালসীমা হল ১৮৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। তখন বাংলায় হিন্দু-পুনরভ্যুত্থানের যুগ চলছে। অথচ উপন্যাসের উপসংহারে গৌরমোহন যে উদার সার্বভৌম ভারসত্যে উপনীত হল ধর্মসংস্কৃতিতে তা সর্বভারতীয, সর্বধর্ম-সংস্কৃতি-সমন্বয-সম্ভূত। গোরা বলছে, 'আমি আজ ভারতবর্ষীয। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।'[৩] পরেশবাবুকেও সে বলছে, 'আপনি আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।'[৪]

অনেকে মনে করেন, গোরার এই ভারতচেতনা বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর চিত্তসিন্ধুমন্থনসঞ্জাত অমৃত। পূর্বেই বলা হয়েছে, গোরা প্রবাসীতে ১৩১৪ থেকে ১৩১৬ সালের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয। অর্থাৎ সময়টা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বৎসর দুই পরে শুরু হয়েছে। তখন স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ণ জোয়ার চলেছে। সে-সময় রবীন্দ্রনাথ 'আত্মশক্তি' ও 'ভারতবর্ষে'র আর্যভারত-চেতনার ভাবসীমা উত্তীর্ণ হয়ে এসেছেন। 'গোরা' যখন প্রবাসীতে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন 'সাহিত্য' পত্রিকায গোরা উপন্যাসকে ব্যঙ্গ করে বলা হয, 'গোরা তর্কের খনি', 'গোরা নামক-বিতর্কবাদ'। উপন্যাস-আকারে এই বিতর্কবাদের বিশ্লেষণ করে বলা হয় 'ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের ইদানীন্তন বিবিধ প্রবন্ধে যাহা পড়িয়াছি, 'গোরা' নামক ফনোগ্রাফেও সেই সকল পুরাতন 'গৎ' বাজিতেছে'।[৫]

অর্থাৎ 'সাহিত্য'-সমালোচকের মতে 'গোরা'য় প্রকাশিত মতগুলি রবীন্দ্রনাথের সমকালীন মতবাদেরই প্রতিধ্বনি। সমালোচকের 'ইদানীন্তন বিবিধ প্রবন্ধে'র উল্লেখ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে কি বলতে হবে, গোরায় কালভঙ্গদোষ ঘটেছে? অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ১৮৮২-৮৩ সালের গোরার মুখে ১৯০৭-০৯ সালের চিন্তা ও চেতনা বসিয়ে দিয়েছেন?

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থপাদের চিন্তাধারার সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় লাভ করতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্যই ১৮৭২ সাল থেকে সে-যুগের প্রধানতম চিন্তানায়ক ছিলেন। শশধর তর্কচূড়ামণির আত্যন্তিক উগ্রতা নিশ্চয়ই তাঁর ছিল না, কিন্তু হিন্দু-পুনরভ্যুত্থানের তিনি ছিলেন প্রতিনিধিস্থানীয় পুরুষ। বিপিনচন্দ্র পাল উনবিংশ শতাব্দীকে দু-ভাগে বিভক্ত করেছেন: ব্রাহ্মযুগ আর বঙ্কিমযুগ। এই 'বঙ্কিমযুগ' অনেকটাই হিন্দু-পুনরভ্যুত্থান যুগের সমার্থক। 'মানসী'র যুগে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, এ যেন 'উল্টোরথে'র পালা। 'মানসী'র 'পরিত্যক্ত' কবিতায় তিনি বলেছেন,

তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ
ভেঙেছ মাটির আল,
তোমরা আবার আনিছ বঙ্গে
উজান স্রোতের কাল।
নিজের জীবন মিশায়ে যাহারে
আপনি তুলেছ গড়ি
হাসিয়া হাসিয়া আজিকে তাহারে
ভাঙিছ কেমন করি?

*

ফুটন্ত নবজীবনের পরে
চাপায়ে শাস্ত্রভার
জীর্ণ যুগের ধূলিসাথে তারে
করে দিই একাকার।

কিন্তু, ভাবতে বিস্ময় লাগে যে, চল্লিশোত্তর রবীন্দ্রনাথ বৎসর-কয়েক এই হিন্দু-পুনরভ্যুত্থানেরই টানাপোড়েনে আন্দোলিত হয়েছেন। একসময় তাঁকে যে 'আর্যামি'তে পেয়েছিল, আমাদের সৌভাগ্যবশত, তা অর্ধযুগের অধিক কাল তাঁর চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখতে পারেনি।

৩

তাছাড়া এই হিন্দু-পুনরভ্যুত্থান যুগেই 'সামাজিক প্রবন্ধে'র অবিস্মরণীয় মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে। ভূদেব হিন্দু কলেজের ছাত্র, মধুসূদন এবং রাজনারায়ণের সতীর্থ। আজীবন ব্রাহ্মণের স্বধর্ম পরম নিষ্ঠায় পালন করে গেছেন। কিন্তু উদার, অসাম্প্রদায়িক ভারতচেতনায় সে-যুগে ভূদেব ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য পুরুষ। তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ভারতবর্ষের ধ্যানস্বপ্নে তন্ময় ছিলেন। তাঁর 'উনবিংশ পুরাণ' [ যার প্রকৃত নাম হওয়া উচিত 'স্বদেশ-পুরাণ' ], 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' এবং 'পুষ্পাঞ্জলি'—এই গ্রন্থত্রয়ে তাঁর স্বদেশচিন্তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি অধ্যাপিকা ডক্টর শিপ্রা লাহিড়ী তাঁর 'ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য' নামক গবেষণা-গ্রন্থে বলেছেন, 'বস্তুত, 'উনবিংশ পুরাণ', 'পুষ্পাঞ্জলি', 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' এবং 'সামাজিক প্রবন্ধ' সমবেত ভাবে ভূদেবের স্বদেশচিন্তার চারটি স্তম্ভ। উনবিংশ পুরাণ ও পুষ্পাঞ্জলি পুরাণ-কথার আকারে রচিত, স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বদেশভক্তের দৃষ্টিতে স্বাধীন ভারতের সম্ভাব্য ইতিহাসকথা এবং সামাজিক প্রবন্ধ প্রবন্ধাকারে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত।'[৬] আশুপ্রকাশিতব্য এই গ্রন্থে ডঃ লাহিড়ী বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও রচনায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব ও প্রেরণার কথা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম 'সাম্রাজ্যের পরিবর্ত।' তাতে বলা হয়েছে, 'আমাদিগের এই জন্মভূমি চিরকাল অন্ত-র্বিবাদানলে দগ্ধ হইয়া আসিতেছিল, আজি সেই বিবাদানল নির্বাপিত হইবে। আজি ভারতভূমির মাতৃভক্তিপরায়ণ পুত্রেরা সকলে মিলিত হইয়া ইঁহাকে শান্তিজলে অভিষিক্ত করিবেন।'[৭]

এই গদ্যাংশের শেষবাক্যে রবীন্দ্রনাথের 'মাতৃ-অভিষেক' কবিতার নামকরণের পূর্বাভাস খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া ভূদেবের জন্মভূমির চেতনা বঙ্গভূমিতেই সীমাবদ্ধ নয়, তা 'ভারতভূমি'। সেই ভারতভূমির 'মাতৃভক্তিপরায়ণ' পুত্রেরা 'সকলে মিলিত' হয়ে তাঁকে 'শান্তিজলে অভিষিক্ত' করবেন। এই প্রসঙ্গে 'মাতৃ-অভিষেকে'র অন্তিম স্তবকের শেষার্ধ স্মরণীয়—

মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা

সবার-পরশে-পবিত্র-করা
তীর্থনীরে
আজি ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

ভূদেবের রচনার উদ্ধৃতাংশে 'অন্তর্বিবাদানলে'র কথা আছে। তিনি বলেছেন, 'আমাদিগের এই জন্মভূমি চিরকাল অন্তর্বিবাদানলে দগ্ধ হইয়া আসিতেছিল, আজি সেই বিবাদানল নির্বাপিত হইবে।' 'মাতৃ-অভিষেকে'র উপান্ত স্তবকে আছে—

সেই হোমানলে হেরো আজি জ্বলে
দুখের রক্তশিখা।
হবে তা সহিতে মর্মে দহিতে—
আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুখবহন করো মোর মন,
শোনো রে একের ডাক।
যত লাজ-ভয় করো করো জয়
অপমান দূরে যাক।

ভূদেব 'সকলের মিলন' বলতে বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথাই বলেছেন। তাঁকেই পুনরায় উদ্ধার করছি: 'ভারতভূমি যদিও হিন্দুজাতীয়-দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, হিন্দুরাই ইঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানেরাও আর ইঁহার পর নহেন, ইনি উহাদিগকেও আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব মুসলমানেরাও ইঁহার পালিত সন্তান।

'এক মাতারই একটি গর্ভজাত ও অপরটি স্তন্যপালিত দুইটি সন্তানে কি ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ হয় না? অবশ্যই হয়—সকলের শাস্ত্রমতেই হয়। অতএব ভারতবর্ষ-নিবাসী হিন্দু এবং মুসলমানদিগের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃসম্বন্ধ জন্মিয়াছে।'[৮]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায়, 'সবার পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে'র কথা বলেছেন। তাতে হিন্দু-মুসলমানের কল্পনা তো আছেই, অধিকন্তু আছে সার্বভৌম জাতি-ধর্ম-বর্ণের মহামিলনের কল্পনা—

এসো হে আর্য এসো অনার্য,
হিন্দু মুসলমান।

এসো এসো আজ তুমি ইংবাজ,
এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি কবি মন,
ধরো হাত সবাকাব।
এসো হে পতিত, কবো অপনীত
সব অপমানভাব।

ভূদেবেব 'পুষ্পাঞ্জলি' প্রকৃতপক্ষে ভাবততীর্থ-পবিক্রমা। কিন্তু এই মহাভাবত-পরিক্রমার উপসংহাবে ভূদেব বলেছেন, বঙ্গভূমিই সকল তীর্থেব সাবভূত মহা-তীর্থ। কাব্যস্তবভিত ভাষায তিনি বলেছেন,

'এই বঙ্গভূমিই সমুদয মহাতীর্থ। ইহাব মৃত্তিকা দেবাদিদেব মহাদেবেব শবীববিধৌত বিভূতি। ইহাব জল তাঁহাব জটাজুটোচ্ছিষ্ট ব্রহ্মবাবি। এখানকাব পাদপগণ দেববৃক্ষ। এখানকাব ফল-মূল-শস্যাদি সাক্ষাৎ অমৃতপূর্ণ। ইহা ভূলোকেব নন্দনকানন। এখানকাব নবনাবীগণ দেবদেবী। কালধর্মবশে ইহাবা পাতালশাযী হইযা বহিযাছে। কিন্তু ঐ বসাতলগামী গঙ্গাবাবি কি ভস্মমাত্রাবশিষ্ট সগবসন্তানদিগকে উদ্ধাব কবেন নাই?

'কপিলদেবপ্রিযা, ন্যায়শাস্ত্রপ্রসূতি, তন্ত্রশাস্ত্রজননী বঙ্গমাতা কতকাল আত্মবিস্মৃতা হইযা নীচান্নকবণবত থাকিবেন?'[৯] এই প্রশ্নেবই নিশ্চযাত্মক উত্তব আছে পূর্ববর্তী বাক্যে। ভূদেব বলেছেন, 'ফলকথা, সত্যযুগে সবস্বতীসন্তান ব্রহ্মর্ষিগণ যে কার্য সম্পন্ন কবিযাছিলেন, এই যুগে ভাগীবথীসন্তানদিগেব প্রতিও সেই কার্যের ভাব সমর্পিত বহিযাছে। ইঁহাদিগেবই দেশে পূর্বপিতৃগণেব পুনরুদ্ধাব সাধিত হইবে।'

ভূদেবেব এই কল্পনা যেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব ভূমিকা বচনা কবে বেখেছিল। ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে, ভূদেবেব রূপকল্পগুলি ববীন্দ্রনাথেব কলাকৃতিতেও ক্রিয়াশীল হযেছিল। ভূদেব 'হিন্দুকণ্ঠহাব' গ্রন্থে অধিভাবতী দেবীব বন্দনায বলেছেন 'মাতর্নমামি হিমগৌবকিবীটভূষাং।' "ভূদেব-ধ্যান-লব্ধ এই 'হিমগৌব-কিরীটভূষা' জননীই ববীন্দ্রনাথেব গানে 'শুভ্রতুষাবকিবীটিনী' ভুবনমনোমোহিনী জননীতে রূপান্তরিত হযেছেন।"[১০]

বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনেব পরে ববীন্দ্রনাথেব স্বদেশচেতনা 'বাংলাব মাটি বাংলাব জল' থেকে 'এই ভাবতেব মহামানবের সাগবতীরে' সম্প্রসাবিত হয়েছে। কিন্তু তখনো রবীন্দ্রনাথ ভূদেবের ভাবতচেতনাব দ্বাবা অনেকটা অনুপ্রাণিত হযেছেন।

'মাতৃ-অভিষেক' কবিতার সবচেয়ে সুন্দর রূপকল্প হল ভারতাত্মা হিমালয়ের বর্ণনা—

ধ্যানগম্ভীর এই-যে ভূধর
নদীজপমালাধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র
ধরিত্রীরে।

এই রূপকল্প রচনায় ভূদেবের 'সামাজিক প্রবন্ধে'র দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাষা নিগূঢ়ভাবে কাজ করেছে বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। ভূদেব বলেছেন, 'ভারতবর্ষের শিরোদেশে, হিমগৌর উচ্চ উষ্ণীষের ন্যায় হিমালয়শিখর—ইঁহার বক্ষে ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্রসদৃশ শুভ্রসলিলা স্বর্নদী—ইঁহার পদতল সমুদ্রের দুইটি বাহু-প্রসৃত বারিধারা দ্বারা প্রক্ষালিত।'

অবশ্য এই কবিত্বমণ্ডিত ভাবকল্পনা 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' গানে অধিকতর পরিস্ফুট হয়েছে—

নীলসিন্ধুজলধৌতচরণতল,
অনিলবিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বরচুম্বিতভালহিমাচল,
শুভ্রতুষারকিরীটিনী।

বলাই বাহুল্য, ভূদেবের 'ইঁহার পদতল সমুদ্রের দুইটি বাহু-প্রসৃত বারিধারা দ্বারা প্রক্ষালিত' রবীন্দ্রনাথে হয়েছে 'নীলসিন্ধুজলধৌতচরণতল'। কিন্তু 'ইঁহার বক্ষে ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্রসদৃশ শুভ্রসলিলা স্বর্নদী' রবীন্দ্রনাথের একটি অসামান্য রূপকল্পকে যেভাবে প্রভাবিত করেছে তা সত্যসত্যই চমকপ্রদ।[১১]

৪

'ভারততীর্থ' কল্পনায় শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ভূদেব-বঙ্কিমকে অতিক্রম করে 'মহামানবের সাগরতীরে' উপনীত হয়েছেন। এই পরিক্রমায় তাঁর দোসর হলেন শ্রীঅরবিন্দ। পণ্ডিচেরীর এই ঋষির রচনাবলীর যে রাজসংস্করণ তাঁর জন্মশত-বার্ষিকীতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে তার প্রথম খণ্ডে আছে ১৮৯০ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে লেখা তাঁর রাজনৈতিক নিবন্ধাবলী। ১৮৯৩ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর বম্বের মারাঠা-ইংরেজি পত্রিকা 'ইন্দুপ্রকাশে' তিনি অনামে New

Lamps for Old নামে তৎকালীন আবেদন-নিবেদন-সর্বস্ব রাজনীতির সমালোচনা করে স্বাধীনতাসংগ্রামের যে পথনির্দেশ করেন তা নয়টি কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। অরবিন্দ-গবেষক অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায ও তাঁর সহধর্মিণী অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায ইংরেজী ভাষায লিখিত তাঁদের 'শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক চিন্তা' গ্রন্থে এই প্রবন্ধগুলি প্রথম সংকলন করেন। 'ইন্দুপ্রকাশে' সেই প্রবন্ধাবলী রবীন্দ্রনাথের পড়া ছিল কিনা আমাদের জানা নেই। তবে তার পূর্ব থেকেই, মানসী-কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন আবেদন-নিবেদন-সর্বস্ব নরমপন্থী রাজনীতিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন। সে-যুগে তিনি শিখনেতা 'গুরুগোবিন্দে'র মধ্যে আদর্শ দেশনায়কের দৃষ্টান্ত খুঁজে পেয়েছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই অরবিন্দ তাঁর চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্র বাংলার মাটিতে কেন্দ্রীভূত করার প্রযাসী হলেন। ১৯০২ থেকে ১৯০৬ সালের মধ্যে তাঁর অনেক লেখা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশের সৌভাগ্য হয়েছিল মাত্র একখানি গ্রন্থের। তার নাম 'ভবানী মন্দির'। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরে ১৯০৬ সাল থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে অরবিন্দই বাংলার রাজনৈতিক চিন্তার নেতৃপুরুষ। সেই সময়েই তিনি ইংরেজী 'বন্দে মাতরম্' এবং বাংলা 'যুগান্তর' পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন।[১২] রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সে-যুগের অরবিন্দ 'স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি'। যে-মাসে 'প্রবাসী'তে 'গোরা' উপন্যাসের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয সেই মাসের 'বঙ্গদর্শনে'ই [ ভাদ্র ১৩১৪ ] রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দের উদ্দেশে 'নমস্কার' [ অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার ] কবিতাটি প্রকাশ করেন।

'দেশবন্ধু' অরবিন্দের 'ভবানী মন্দির' রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন বলে অনুমান করা যেতে পারে। 'ভবানী মন্দিরে'র ভবানী সম্ভবত শিবাজীর আরাধ্যা দেবীর নামে অনুপ্রাণিত। তার কিছুদিন আগে থেকেই দেশ জুড়ে শিবাজী-উৎসব চলছে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর বিখ্যাত 'শিবাজী-উৎসব' কবিতাটি রচনা করেন ১৩১১ সালের ১১ ভাদ্র [ আগস্ট, ১৯০৪ ]। 'ভবানী মন্দিরে'র কল্পনা অরবিন্দের, এর প্রথমাংশের রচনাও তাঁর। কিন্তু গ্রন্থটির শেষাংশ অরবিন্দানুজ বারীন্দ্রকুমারের রচনা বলেই অনুমিত হয়েছে।[১৩]

'ভবানী মন্দিরে'র উপসংহারের শিরোনামা 'The Message of the Mother'। তাতে বলা হয়েছে:

When, therefore, you ask who is Bhawani the Mother, She

herself answers you, "I am the Infinite Energy which streams forth from the Eternal in the world and the Eternal in yourselves. I am the Mother of the Universe, the Mother of the Worlds, and for you who are children of the Sacred Land, Aryabhumi, made of her clay and reared by her sun and winds, I am Bhawani Bharati, Mother of India.

Then if you ask why we should erect a temple to Bhawani, the Mother, hear Her answer, "Because...by making a centre for the future religion you will be furthering the immediate will of the Eternal and storing up merit which will make you strong in this life and great in another. You will be helping to create a nation, to consolidate an age, to Aryanise a world. And that nation is your own,...that world is no fragment of land bounded by seas and hills, but the whole earth with her teeming millions.[১৪]

'ভবানী মন্দিরে'র এই 'Bhawani Bharati, Mother of India' আর রবীন্দ্রনাথের 'মাতৃ-অভিষেকে'র ভারত-মাতা অভিন্ন। 'ভবানী মন্দিরে' যে মহাজাতি গঠনের কল্পনা উদ্ধৃতির শেষবাক্যে ভাষা পেয়েছে—'the whole earth with her teeming millions', মাতৃ-অভিষেকে তারই অনুরূপ কল্পনা ব্যক্ত হয়েছে 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'।

তবে ভারতের মহামানবের সাগরতীরে বিশ্বমানবের মাতৃমন্দির রচনার কল্পনা রবীন্দ্রকাব্যলোকে 'সোনার তরী'র যুগ থেকেই ক্রমশ বিবর্তিত হতে দেখা যায়।

সোনার তরীর 'বসুন্ধরা' কবিতায় কবি বলেছেন, 'ইচ্ছা করে আপনার করি যেখানে যা-কিছু আছে', 'ইচ্ছা করে মনে মনে— / স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোক-সনে দেশে দেশান্তরে', 'সকলের ঘরে ঘরে / জন্মলাভ করে লই হেন ইচ্ছা করে'। 'বিশ্বনৃত্য' কবিতায়ও একই সুর শুনতে পাওয়া যাবে—

হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানবহৃদয়ে মিশিতে—
নিখিলের সাথে মহা রাজপথে
চলিতে দিবস-নিশীথে।

পরবর্তী স্তবকে উত্তমপুরুষের একবচন হয়েছে প্রথমপুরুষের বহুবচন—

জগৎ-মাতানো সংগীততানে
কে দিবে এদের নাচায়ে !
জগতের প্রাণ করাইয়া পান
কে দিবে এদের বাঁচায়ে !
ছিঁড়িয়া ফেলিবে জাতিজালপাশ,
মুক্ত হৃদয়ে লাগিবে বাতাস,
ঘুচায়ে ফেলিয়া মিথ্যা তরাস,
ভাঙিবে জীর্ণ খাঁচা এ ।

'জাতিজালপাশ' ছিন্ন করে 'জগতের প্রাণ' পান করে নবজীবন লাভের কল্পনার মূলে কাজ করেছে কবির বিশ্বানুভূতি, তারই অন্য নাম 'সর্বানুভূতি'। কাজেই ভারততীর্থে মহামানবের সাগরতীরে মাতৃমন্দির রচনার কল্পনা কবির অন্তরের প্রেরণা থেকেই স্বতঃ-উৎসারিত, পূর্বসূরি বা সমকালীন সহযাত্রীদের প্রভাব যুগচেতনায় অনুবিষ্ট থেকে তাকে উদ্দীপিত করেছে মাত্র। কবি পথ চলতে চলতে কথা বলেন। চলমান কাল তাঁর চেতনায় নিয়ত-সঞ্চালিত।

৫

মাতৃ-অভিষেক বা ভারততীর্থ কবিতার সঙ্গে কবির 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটির তুলনা স্বভাবতই মনে উদিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরমে'র মতো রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটির অঙ্গচ্ছেদ করেই আমাদের যুগল-জাতীয়-সংগীতে পরিণত করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য, জাতীয় সংগীত হওয়ার প্রয়োজনে দুটি গানের কোনোটিই রচিত হয় নি। আয়তনের দিক দিয়ে জাতীয় সংগীত হবার পক্ষে দুটি গানই দীর্ঘ। কাজেই অঙ্গচ্ছেদ অত্যাবশ্যক বিবেচিত হয়েছিল। 'বন্দে মাতরম্'-এর ক্ষেত্রে অবশ্য অন্য কারণও ছিল। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহাপ্রেরণার দিনে বন্দে মাতরম্, সংগীত হিসাবেই শুধু নয়, এই শব্দ দুটি দেশ-ভক্তের কাছে বীজমন্ত্রের মতো উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু 'বন্দে মাতরম্'কে জাতীয় সংগীতে পরিণত করার সময় সঙ্গত কারণেই মুসলমানেরা প্রসন্ন সম্মতি জানাতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের এই 'মাতৃস্তোত্র' যতই অপূর্ব হোক না কেন, ওতে ব্যবহৃত হিন্দু দেব-দেবীর রূপকল্পগুলি অহিন্দুর, এমন কি অপৌত্তলিক হিন্দুদের মনে বিরূপতার হেতু হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেই একদিন এই মাতৃস্তোত্র গানের

সুরে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস যখন অহিন্দুদের পক্ষে আপত্তিকর বলে ওই গানের অঙ্গচ্ছেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তখন তাঁদের সমর্থকদলে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন। বন্দে মাতরম্-এর পৌত্তলিক রূপকল্পগুলি তাঁর কাছেও আপত্তিকর মনে হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের নিজের 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটি স্তবকপঞ্চকে বিন্যস্ত। জাতীয় সংগীতের পক্ষে তা দীর্ঘ, সুতরাং তারও অংশবিশেষই গৃহীত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানের রচনা-সম্পর্কে একটি উদ্ভট ও অবাঞ্ছনীয় কাহিনী কোনো কোনো উর্বর মস্তিষ্ক থেকে প্রসূত হয়েছে। কাহিনীটি যখন শালীনতার সমস্ত সীমানা লঙ্ঘন করে গিয়েছিল তখন রবীন্দ্রনাথ মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালের ২০শে নভেম্বর পুলিনবিহারী সেনকে এক পত্রে তিনি বলেন, 'রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান আমার কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্যে আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, এই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমন-অধিনায়ক গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয় ঘোষণা করেছি, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় যুগযুগ-ধাবিত যাত্রীদের যিনি পথসারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক। সেই যুগযুগান্তরের মানব-ভাগ্যচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জই কোনো ক্রমেই হতে পারেন না সে কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন। কেননা তাঁর ভক্তি যতই থাক, বুদ্ধির অভাব ছিল না।'[১৫]

রবীন্দ্রনাথের এই পত্র প্রকাশের পর এ সম্পর্কে সংশয়ের আর কোনো অবকাশ থাকে না। কিন্তু ভাষা ও রূপকল্পের দিক দিয়ে দুটি ত্রুটিও চোখে না পড়ে পারে না। গানটি ভারতভাগ্যবিধাতার জয়ধ্বনি। পাঁচ স্তবকে তাঁকে পাঁচটি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে: 'জনগণমঙ্গলদায়ক', 'জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক', 'জনগণপথ-পরিচায়ক', 'জনগণদুঃখত্রায়ক' এবং সর্বশেষে 'রাজেশ্বর'। বলাই বাহুল্য, পঞ্চম বিশেষণটি 'ইংলণ্ডেশ্বর' অর্থে অবশ্যই ব্যবহৃত হয়নি, তিনি নিশ্চয়ই ভুবনেশ্বর। কিন্তু অন্তিম স্তবকের এই 'রাজেশ্বর' এবং দ্বিতীয় স্তবকের 'সিংহাসন' [ পূরব পশ্চিম আসে / তব সিংহাসন-পাশে / প্রেমহার হয় গাঁথা ]—শব্দ-দুটির রূপকল্পগত তাৎপর্য গানটিকে অনবদ্য করে তোলার পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া যে-রাজেশ্বরের সিংহাসনপাশে প্রেমহার গাঁথবার জন্যে 'পূরব পশ্চিম আসে', তাঁকে ভুবনেশ্বর বলে কল্পনা করা কারো কারো মতে যদি কষ্টকল্পনাপ্রসূত বলে মনে হয়ে

থাকে তবে তার জন্যে দায়ী রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। রাজকীয় রূপকল্প এই রচনায় ব্যবহার না করাই সমীচীন ছিল। অবশ্য 'নৈবেদ্যে'র যুগ থেকেই দেখা যায় কবি বিশ্বেশ্বরকে বলেছেন 'রাজেন্দ্র'। 'হে রাজেন্দ্র, তব হাতে কাল অন্তহীন।' [৩৯-সংখ্যক কবিতা], এবং 'হে রাজেন্দ্র, তোমা কাছে নত হতে গেলে…' [৫১-সংখ্যক কবিতা]। গীতবিতানের 'পূজা' শীর্ষক গানগুলিব ৫২২-সংখ্যক গানে তিনি হয়েছেন 'মহারাজ'। 'মহাবাজ, একি সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে।' ৪৭৩-সংখ্যক গানেও আছে 'জগতে তুমি রাজা, অসীম প্রতাপ'। এই 'রাজেন্দ্র', 'রাজা' বা 'মহারাজে'র সিংহাসনের রূপকল্পও পাওয়া যাবে ২৯৫-সংখ্যক গানে। 'তব সিংহাসনের আসন হতে এলে তুমি নেমে'। স্বদেশপ্রেমাত্মক গীতসমূহেব ১০-সংখ্যক গানে প্রজারাও রাজমর্যাদা পেয়েছে। 'আমবা সবাই বাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।' কাজেই 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানে 'বাজেশ্বর' বা তাঁর 'সিংহাসনে'র কল্পনা কোনো পার্থিব রাজাব সঙ্গে যুক্ত কবা বাতুলতারই নামান্তর। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, গানটি ১৯১৮ সালের মাঘোৎসবে ব্রহ্মসংগীত হিসাবে গীত হয়েছিল। অবশ্য তখন ভাবতভাগ্যবিধাতা 'রাজেশ্বর' হয়েছিলেন মানবভাগ্যবিধাতা 'বিশ্বেশ্বর।' ১৯১৮ সালের ফাল্গুনের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'ধর্মেব নবযুগ' প্রবন্ধটি এই মানবভাগ্যবিধাতা 'বিশ্বেশ্ববে'ব জয়ধ্বনি উচ্চারণ করেই উপসংহৃত হযেছে।[১৬] বলাই বাহুল্য, 'রাজেশ্ববে'র 'বিশ্বেশ্বরে' রূপান্তর ক্রটিমুক্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ হযেছে।

গানেব দ্বিতীয় ক্রটি ঘটেছে জনগণমন-অধিনায়ককে চতুর্থ স্তবকে 'স্নেহময়ী মাতা'-রূপে কল্পনা করায় :

দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে
রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।

বিশ্বপিতা এখানে বিশ্বজননী হযে উঠেছেন। বাৎসল্যে বিগলিত পিতাই মাতা, অথবা হযতো কবির অজ্ঞাতসাবে ভাবতমাতার কল্পনা এই রূপকল্পটির জন্ম দিয়েছে। কিন্তু এই ক্রটিই কবিতাটির পবিত্রতা বক্ষা কবেছে। 'স্নেহময়ী মাতা' যে ইংলণ্ডেশ্বর কিছুতেই হতে পারেন না, একথা ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন হয় না।

তবু 'জনগণমন-অধিনায়ক' এবং 'ভারততীর্থ', এই দুটি রচনার মধ্যে অর্থ-গৌরবে এবং কাব্যশিল্পে ভাবততীর্থকেই অনেক বেশি সার্থক বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশসংগীতের দুটি ধারা। শুধু স্বদেশসংগীতেরই নয়, তাঁর অধ্যাত্ম-সংগীতের ক্ষেত্রেও একথা বলা চলে। এক ধারার কর্ণধার বিশ্ববিধাতা, অন্য ধারার কর্ণধার মানুষের আত্মশক্তি। প্রথম ধারার মূলে আছে বিশ্ববিধাতার মঙ্গলবিধানের প্রতি অবিচল বিশ্বাস। নৈবেদ্যের 'প্রার্থনা' কবিতাটিতে কবি বলেছেন :

নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিত
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

এই পিতাই কখনো কর্ণধার, কখনো ভুবনেশ্বর বা বিশ্বেশ্বর, কখনো মানব-ভাগ্যবিধাতা।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমাত্মক দ্বিতীয় ধারার কর্ণধার দেশভক্তের আত্মশক্তি। তারই দৃষ্টান্ত হল 'নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে', অথবা 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে' প্রভৃতি গান। এসব গানে আত্মশক্তির উদ্বোধনই মুখ্য। তাই অন্ধকার পথে চলার জন্যে 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'—এই প্রার্থনা উচ্চারিত হয়নি। কবি বলেছেন 'যদি ঝড়-বাদলে আঁধার রাতে' গৃহে গৃহে দ্বার রুদ্ধ হয়েও যায় তাহলে 'বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে'ই সেই পথকে আলোকিত করতে হবে।

আমরা বলেছি, শুধু স্বদেশপ্রেমের ক্ষেত্রেই নয়, আধ্যাত্মিক বা আত্মিক সাধনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রজীবনে এই দু-ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। এক, ভক্তের আত্মনিবেদনের ধারা, দুই, সোঽহংতাত্ত্বিকের আত্মসম্প্রসারণের ধারা। 'ধর্মশিক্ষা' প্রবন্ধে [ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মাঘ ১৩১৮ ] রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'অনন্তবোধের আলোকে সমস্তকে দেখা এবং অনন্তবোধের প্রেরণায় সমস্ত কাজ করা ইহাই মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ সিদ্ধি—ইহাই মানুষের সত্যধর্ম।'[১৭] এই অনন্তবোধ বিশ্ববোধেরই অন্তিম ফলশ্রুতি।

'জন-গণ-মন-অধিনায়ক' এবং 'ভারততীর্থ' রচনা দুটির তুলনামূলক আলোচনায় বলা যায়, প্রথমটি প্রার্থনাসংগীত, দ্বিতীয়টি জাগরণসংগীত। এই জাগরণ উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস বা নবজাগরণেরই পরমতম পরিণতি। আলোচনার সূত্রপাতেই আমরা বলেছি, মাতৃ-অভিষেক বা ভারততীর্থ 'গোরা' উপন্যাসেরই মর্মবাণী। 'গোরা'র নায়ক রজতগিরিসন্নিভ গৌরমোহন রবীন্দ্রনাথেরই মানসসন্তান। তাঁরই আত্মার দোসর। গোরার আত্মিক

উন্মীলনলীলা রবীন্দ্রমানসেরই আত্মোন্মীলনলীলার প্রতিচ্ছবি। এবং একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে রবীন্দ্রমানস ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের মহত্তম সৃষ্টি। এক-শতাব্দী ধরে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রতীপধর্মী আকর্ষণ-বিকর্ষণে বাঙালীর জীবনসিন্ধু মন্থন করে যে অমৃত উঠেছিল সেই অমৃতই পরিবেশিত হয়েছে গোরা উপন্যাসে। এই অর্থেই গোরা মহাকাব্যিক উপন্যাস। দেশকালের প্রেক্ষাপট সেখানে মুখ্য নয়, মুখ্য হল শতাব্দীব্যাপী বাঙালীর নবজন্মের আত্মিক ইতিহাস।

সিপাই বিদ্রোহের সময় এটোয়াতে গোরার জন্ম। তার পিতা ছিলেন আইরিশম্যান। তার জন্মের আগের দিন তিনি লড়াইয়ে মারা যান। মা প্রাণভয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদয়ালের গৃহে। সেখানেই গোরাকে জন্ম দিয়ে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। কৃষ্ণদয়ালের স্ত্রী আনন্দময়ী এই পিতৃ-মাতৃহীন শিশুকে কোল পেতে গ্রহণ করলেন এবং মাতৃস্নেহে পালন করতে লাগলেন। গোরা কৃষ্ণদয়াল এবং আনন্দময়ীকেই নিজের পিতামাতা বলে জানত। সহজাত নেতৃত্ব নিয়েই সে জন্মেছিল। নিতান্ত বাল্যকালেই 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' এবং 'বিংশতি কোটি মানবের বাস' আবৃত্তি করে ইংরেজি বক্তৃতায় পাড়ার এবং ইস্কুলের ছেলেদের নেতা হয়ে উঠেছিল। আরেকটু বড়ো হবার পর কেশববাবুর বক্তৃতায় এবং কৃষ্ণদয়ালের আগ্রহে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সে-সব দিনে কৃষ্ণদয়ালের কাছে যে-সব ব্রাহ্মণপণ্ডিত আসতেন তাঁদের বাগ্‌যুদ্ধে পরাজিত করাতেই ছিল গোরার গৌরব। কিন্তু হরচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের ধৈর্যে ও ঔদার্যে মুগ্ধ হয়ে সে বেদান্তচর্চায় আত্মনিয়োগ করল। এমন সময় এক ইংরেজ পাদ্রী হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজকে নস্যাৎ করে এদেশবাসীকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করলেন। এই স্পর্ধিত বিধর্মীর সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়ে গোরার আত্মাভিমান হল ক্ষুণ্ণ। দেশের যা-কিছু আছে তার সমস্তই সবলে ও সগর্বে মাথায় তুলে নিলে তবেই দেশকে এবং নিজেকে অপমান থেকে রক্ষা করা যাবে, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে গোরা অত্যুগ্রভাবে হয়ে উঠল হিন্দু। পরেশবাবুর গৃহে ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে সে তর্কের ঝড় বইয়ে দিলে। গোরার এই মানস-পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ব্রাহ্মযুগ এবং হিন্দু-পুনরভ্যুত্থান যুগের প্রভাবই প্রতিফলিত হয়েছে। পরবর্তী ইতিহাস 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' গোরার উত্তরণের ইতিহাস। 'প্রবাসী'তে 'গোরা' উপন্যাস সমাপ্ত হয়েছে ১৩১৬ সালের ফাল্গুন মাসে। ওই সালেরই পৌষের প্রবাসীতে কবি

লিখেছেন 'তপোবন' প্রবন্ধ। তার উপান্ত অনুচ্ছেদে তিনি বলছেন, 'আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে-সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ করিতে পারে সে সত্যটি কী। সে সত্য প্রধানত বণিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়, সে সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্বমানবের নিত্যব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্যে তপস্যা করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবির, নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবর্তী মহাপুরুষগণ সেই সত্যকেই প্রচার করে গেছেন। ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা। ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে সেই তপস্যা আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে, দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধকভাবে। যতদিন তা না ঘটবে ততদিন আমাদের দুঃখ পেতে হবে, অপমান সইতে হবে, ততদিন নানাদিক থেকে আমাদের বারংবার ব্যর্থ হতে হবে।'[১৮]

গোরার এই উত্তরণের জন্যই উপন্যাসের কাহিনী-বিন্যাসে, কালভঙ্গদোষ নয়, কালাতিক্রমণদোষ ঘটেছে। ভাববস্তুকে সম্পূর্ণায়িত করার প্রয়োজনেই রবীন্দ্রনাথ তা করেছেন। কবি কালগত ইতিহাসকে প্রাধান্য না দিয়ে ভাবগত ইতিহাসকেই আশ্রয় করেছেন। প্রবাসীতে ধারাবাহিক প্রকাশের সময় 'সাহিত্য' পত্রে যে বলা হয়েছিল, 'গোরা তর্কের খনি' এবং 'ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের ইদানীন্তন বিবিধ প্রবন্ধে যাহা পড়িয়াছি, গোরা নামক ফনোগ্রাফেও সেই সকল পুরাতন 'গৎ' বাজিতেছে'—একথা অসত্য নয়। ১৩০০ থেকে ১৩১৫ সালের মধ্যে লেখা 'আত্মশক্তি' 'ভারতবর্ষ' 'রাজাপ্রজা' 'সমূহ' 'স্বদেশ' ও 'সমাজ' প্রভৃতি গ্রন্থে যে অর্ধশতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার ভাববস্তু বিশ্লেষণ করলেই রবীন্দ্রমানসের বিবর্তনরহস্যটি অনুধাবন করা সম্ভব হবে। আমরা বলেছি, গোরা রবীন্দ্রনাথেরই আত্মার দোসর। গোরা উপন্যাস রচনাকালে রবীন্দ্রমানস যে ভাবভূমিতে উত্তীর্ণ হয়েছিল সেই উদার অসাম্প্রদায়িক মানবসত্যে পৌঁছেই গোরা উপন্যাস মহাকাব্যিক মহিমা লাভ করেছে।

বস্তুত, 'গোরা' রবীন্দ্রনাথের 'স্বপন-মুরতি গোপনচারী' ভাবসত্তারই আত্ম-জীবনী। এই প্রসঙ্গে আঁদ্রে মরোয়ার একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। ফ্লোবার্টের মাদাম বোভারীর আলোচনায় তিনি বলেছেন:

'One must choose between life and art. Autobiography itself is never true. The true autobiography is that which the novelist writes without knowing, behind the screen of fiction which appears objective to him.'[১৯]

মরোয়ার উক্তিটি নির্বিচারে গ্রাহ্য নয়। তবে তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হল এই যে, শিল্পায়িতরূপেই আত্মজীবনী সত্যতর জীবনী। সত্যতর, কেননা লেখক তা 'না জেনে'ই লেখেন, এবং গল্প-যবনিকার অন্তরালে থেকে তা লেখকের কাছে 'বস্তুগত' বলে প্রতিভাত হয়। এই অর্থেই শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' তাঁর সত্যতর আত্মজীবনী। রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' এবং 'গোরা'কেও এই পর্যায়ভুক্ত করা চলতে পারে। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' কবির প্রথম পঁচিশ বৎসরের আত্মজীবনী, 'গোরা' দ্বিতীয় পঁচিশের। আমরা গোরাকে রবীন্দ্রনাথের আত্মার দোসর বলেছি। 'মাতৃ-অভিষেক' গোরা ও রবীন্দ্রনাথ— উভয়েরই প্রাণমন্ত্র।

উপন্যাস-আকারে গোরা শেষ হবার মাস চারেক পরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'মাতৃ-অভিষেক' কবিতা। 'সাহিত্য' টিপ্পনী কেটে বললেন, 'মাতৃ-অভিষেক কবিতা নহে, ছন্দে গ্রথিত বক্তৃতা'।[২০] যে দৃষ্টিতে গোরাকে 'তথ্যের খনি' মনে হয়েছিল সেই দৃষ্টিতেই 'মাতৃ-অভিষেক'কে 'ছন্দে গ্রথিত বক্তৃতা' বলে মনে হয়েছে। কিন্তু এই প্রতিকূল সমালোচনার মধ্যেই 'গোরা' ও 'মাতৃ-অভিষেকে'র আত্মিক যোগসূত্রটি আভাসিত হচ্ছে। আসলে রবীন্দ্রনাথের ভারতচেতনা যেমন গোরায়, তেমনি এই অপূর্ব কবিতায় একটি অখণ্ড সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রবন্ধাবলীতে যে চেতনার ক্রমবিবর্তন ঘটেছে, গোরা উপন্যাসে যার প্রাণস্পন্দন শ্রুতিগোচর হয়েছে, ভারততীর্থে তারই ছন্দগ্রথিত ভাবরূপ সংহত এবং সামগ্রিকতায় সম্পূর্ণতা পেয়েছে।

৬

মাতৃ-অভিষেকের প্রথম স্তবকে আছে ভারতের ভৌগোলিক ভাবরূপ— ভারতভূমিকে কবি বলেছেন 'পুণ্যতীর্থ'। এই পুণ্যতীর্থ মহামানবের সাগরতীর। এই মহামানবের সাগরতীরে দাঁড়িয়েই কবি নরদেবতার বন্দনা করেছেন। ভারতভূমি পুণ্যতীর্থ,—এই চিন্তা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নতুন-কিছু নয়।

দেশভক্তের কাছে জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী। ভূদেবের 'পুষ্পাঞ্জলি'তেও পূর্বেই তার সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ মহামানবের সাগরতীর, এবং এই মহামানবের আরাধ্য দেবতা হচ্ছেন 'নরদেবতা'—এ কল্পনা রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ নিজস্ব।

এই স্তবকে যে মানচিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাকে আমরা বলেছি ভৌগোলিক ভাবরূপ। ১৩৩৪ সালে রচিত 'বৃহত্তর ভারত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই ভাবরূপের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'দেশ বলতে কেবল তো মাটির দেশ নয়। সে যে মানব-চরিত্রের দেশ। দেশের বাহ্য প্রকৃতি আমাদের দেহটা গড়ে বটে, কিন্তু আমাদের মানবচরিত্রের দেশ থেকেই প্রেরণা পেয়ে আমাদের চরিত্র গড়ে ওঠে।[২১]

এই প্রবন্ধেই কবি বলেছেন, 'গঙ্গানদী ভারতের একটি বৃহৎ পরিচয় বহন করে। ভারতের বহু দেশ বহু কাল ও বহু চিত্তের ঐক্যধারা তার স্রোতের মধ্যে বহমান। এই নদীর মধ্যে ভারতের একটি পরিচয়বাণী আছে। হিমাদ্রির স্কন্ধ থেকে পূর্বসমুদ্র পর্যন্ত লম্বমান এই গঙ্গানদী। সে যেন ভারতের যজ্ঞোপবিতের মতো, ভারতের বহুকালক্রমাগত জ্ঞানধর্ম-তপস্যার স্মৃতিযোগসূত্র'।[২২] যজ্ঞোপবিতের কল্পনা ভূদেবের। কিন্তু কী অর্থে যজ্ঞোপবীত তার ভাষ্য রবীন্দ্র-নাথের। তা 'ভারতের বহুকালক্রমাগত জ্ঞানধর্ম-তপস্যার স্মৃতিযোগসূত্র।'

এই প্রবন্ধেই কবি হিমালয় সম্পর্কে বলেছেন, 'হিমালয় এমন একটি চিরন্তন রূপ যা সমগ্র ভারতের, যা এক দিকে দুর্গম, আর এক দিকে সর্বজনীন'।[২৩] 'একদিকে দুর্গম, আর-এক দিকে সর্বজনীন'—এই হচ্ছে ভারতের চিরন্তন রূপ, তারই প্রতিমূর্তি হিমালয়। কালিদাস হিমালয়কে বলেছিলেন 'দেবতাত্মা নগাধিরাজ'। রবীন্দ্রনাথ হিমালয়ের যে 'ধ্যানগম্ভীর' মূর্তির ধ্যান করেছেন সে মূর্তি তপস্বীর মূর্তি। এই তপস্বীর মূর্তিরচনা মহাকবির কল্পনাতেই সম্ভব। এই রূপকল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথ ভারত-ভাস্কর। উনত্রিশ হাজার ফুট উঁচু, পনেরো শতাধিক মাইল দীর্ঘ এই তপস্বী-মূর্তির সৃষ্টি মহাকবি-ভাস্করের অবিনশ্বর কীর্তি। এই প্রসঙ্গে ১৩১০ সালের শ্রাবণের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের হিমালয়-ষট্‌কের কথা মনে পড়বে। মহাপয়ারে রচিত এই ছয়টি ছন্দচতুর্দশীর চতুর্থ কবিতায় কবি হিমালয়ের তপস্বী-মূর্তির ধ্যান করে বলেছেন, 'তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্তসঞ্চিত তপস্যার মতো।' ঋষির আশ্বাসবাণী তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত। একদিন ভারতের বিরাট গভীর বক্ষ হতে যে 'বহ্নিবাণী' ঝংকৃত হয়েছে, অনুদাত্ত-উদাত্ত-স্বরিতে সেই 'বহ্নিবাণী'ই উদ্গীত হচ্ছে হিমালয়ের অভ্র-

ভেদী সংগীতে। সেই সংগীতের পরিচয় দিযেই কবির হিমালয়-স্তুতিব পূর্ণাহুতি হয়েছে—

ভাবতেব হৃদযসমুদ্র এতকাল—
কবিয়াছে উচ্চাবণ ঊর্ধ্ব পানে যে বাণী বিশাল,—
অনন্তেব জ্যোতিস্পর্শে অনন্তেবে যা দিযেছে ফিবে—
রেখেছ সঞ্চয কবি, হে হিমাদ্রি, তুমি স্তব্ধশিবে।
তব মৌন শৃঙ্গমাঝে তাই আমি ফিবি অন্বেষণে
ভাবতের পবিচয শান্ত-শিব-অদ্বৈতেব সনে।

এই তাৎপর্য বহন কবছে বলেই ধ্যানগম্ভীব এই ভূধব ভাবতাত্মাব প্রতীক।

আমবা 'মাতৃ-অভিষেক'কে বলেছি জাগবণ-সংগীত। তাকে ভাবতেব নব-জন্মেব মঙ্গল-সংগীতও বলা যেতে পাবে। 'বৃহত্তব ভাবত' প্রবন্ধে ববীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমবা যে-ভাবতবর্ষে জন্মলাভ কবেছি সে এই মুক্তিমন্ত্রেব ভাবতবর্ষ, সে এই তপস্বীব ভাবতবর্ষ। এই কথাটি যদি ধ্রুব কবে মনে বাখতে পাবি তা হলে আমাদেব সকল কর্ম বিশুদ্ধ হবে, তা হলে আমবা নিজেকে বিশেষ কবে ভাবতবাসী বলতে পাবব, সেজন্য আমাদেব নতুন কবে ধ্বজা নির্মাণ কবতে হবে না'।[২৪]

মাতৃ-অভিষেকেব দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকে আছে ভাবতেব ইতিহাস-পবিক্রমা। এই ইতিহাসেব মূলসত্যটি কবি বলেছেন ১৩১৫ সালে লিখিত 'সমাজ' গ্রন্থে সংকলিত 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে। বলেছেন, 'ভাবতবর্ষে মানুষেব ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতাব মূর্তি পবিগ্রহ কবিবে, পবিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব আকাব দান কবিযা তাহাকে সমস্ত মানবেব সামগ্রী কবিযা তুলিবে,—ইহা অপেক্ষা কোনো ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভাবতবর্ষেব ইতিহাসে নাই'।[২৫]

এই সত্যই বিশেষভাবে বিশ্লেষিত হযেছে 'ভাবতবর্ষ' [ ১৩১২ ] গ্রন্থেব 'ভাবতবর্ষেব ইতিহাস' ও 'পবিচয' গ্রন্থেব 'ভাবতবর্ষে ইতিহাসেব ধাবা' [ ১৩১৮ ] প্রবন্ধযুগলে। 'ভাবতবর্ষেব ইতিহাস' প্রবন্ধে কবি বলেছেন,

'ভাবতবর্ষেব প্রধান সার্থকতা কী, এ-কথাব স্পষ্ট উত্তব যদি কেহ জিজ্ঞাসা কবেন, সে-উত্তব আছে, ভাবতবর্ষেব ইতিহাস সেই উত্তবকেই সমর্থন কবিবে। ভাবতবর্ষেব চিবদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদেব মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন কবিযা দেওযা এবং বহুব মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তবতররূপে উপলব্ধি কবা,—বাইবে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান

হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া, তাহার ভিতবকাব নিগূঢ় যোগকে অধিকাব করা।'[২৬]

এই উদ্ধৃতির শেষাংশটি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। 'বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয তাহাকে নষ্ট না কবিযা তাহাব ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকাব করা।' কবি পুনশ্চ বলেছেন, 'বিধাতা ভাবতবর্ষেব মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় আর্য যে শক্তি পাইযাছে, ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতিব চরম সভ্যতা, ভাবতবর্ষ চিবদিন ধবিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ কবিযা আসিযাছে। পব বলিযা সে কাহাকেও দূব কবে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত কবে নাই, অসংগত বলিযা সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভাবতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ কবিযাছে, সমস্তই স্বীকাব কবিয়াছে'।[২৭]

ভাবত-ইতিহাসেব এই সত্যই অপূর্ব কবিভাষা লাভ কবেছে 'মাতৃ-অভিষেকে'ব দ্বিতীয ও তৃতীয স্তবকে। তৃতীয স্তবকে কবি নিজেব শোণিতে যে বিচিত্র স্বর শুনছেন তাতে একদিন যাবা ভাবতে আক্রমণকাবী, লুণ্ঠনকাবীরূপে এসেছিল তাদেব জীবনসংগীতও বাদ যায নি। 'তাবা মোব মাঝে সবাই বিরাজে / কেহ নহে নহে দূব।' শত্রু-মিত্র-ভেদ-লুপ্ত-করা এই সর্বজনীন জীবনেব ঐকতানই কবিব রুদ্রবীণায বাদিত হযেছে।

চতুর্থ স্তবকে আছে ভাবতেব ভাবগত ইতিহাসের মূলমন্ত্র। 'ইতিহাসের ধাবা' প্রবন্ধে কবি বলেছেন, 'বহুব মধ্যে এককে নিঃসংশযরূপে অন্তবতবরূপে উপলব্ধি করাই' ভারতবর্ষেব প্রধান সার্থকতা।' কবিতায বলা হযেছে :

> হেথা একদিন বিরামবিহীন
> মহা ওংকারধ্বনি
> হৃদযতন্ত্রে একের মন্ত্রে
> উঠেছিল বণরণি।

'মহা ওংকাবধ্বনি'তে কবিচেতনা ভাবতীয সভ্যতার আদিগঙ্গোত্রীতে উপনীত হয়েছে। কবিদৃষ্টিতে আর্যসভ্যতাই ভাবতীয় সভ্যতাব সেই আদিগঙ্গোত্রী। কিন্তু 'একে'র মন্ত্রটি উচ্চারিত হয়েছে হৃদয়তন্ত্রে। বলাই বাহুল্য, হৃদয়তন্ত্রটি বাদিত হয় প্রেমেব মন্ত্রে, আত্মিক মিলনের মন্ত্রে। এই হৃদয়তন্ত্রে যে মহামিলন ঘটে তাতেই 'একটি বিরাট হিয়া'র জন্ম হয় :—

তপস্তাবলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
একটি বিবাট হিয়া।

প্রথম-পাঠে ছিল 'তপস্তাবলে এক-হোমানলে', পবিশোধিত পাঠে হযেছে 'তপস্তাবলে একেব অনলে'। এই পবিবর্তনে হোমানলেব ৰূপকল্পটি পরিত্যক্ত হযেছে, কিন্তু 'আহুতি'-ৰূপকল্পটি পবিত্যক্ত না হওযায 'একেব অনল' কবিব ঈঙ্গিত বক্তব্যকে ঈষৎ দুর্বল কবে তুলেছে। পববর্তী চবণে যজ্ঞশালাব ৰূপকল্পটিও অক্ষুণ্ণ বয়েছে। কিন্তু 'এক-হোমানলে'র মধ্যে ঐক্য শব্দেব তাৎপর্য সুস্পষ্ট ছিল না। প্রবন্ধে বহুব মধ্যে যে-একেব প্রতিষ্ঠাব কথা বলা হয়েছে হোমানল থেকে এককে পৃথক না কবলে তা স্পষ্ট পবিস্ফুট হয না, তাই 'একেব অনল' বাণীবিন্যাসে সার্থক না হলেও ভাববিকাশে স্পষ্টতব। তাছাডা, যজ্ঞশালা হচ্ছে 'সেই সাধনাব সে আবাধনাব'। সেই সাধনা, সে আবাধনা হচ্ছে হৃদযতন্ত্রে 'একের মন্ত্র'। তাই কবির যজ্ঞশালা প্রাচীন যজ্ঞশালার চতুঃসীমা উত্তীর্ণ হযে নবীন যজ্ঞশালার দ্বার উন্মুক্ত কবেছে।

চতুর্থ স্তবকেব পবিত্যক্ত 'হোমানল' কিন্তু পঞ্চম স্তবকে বর্জিত হযনি। তাব কারণ, তৃতীয স্তবকেই যজ্ঞশালাব নতুন তাৎপর্য উদ্‌বাবিত হযেছে। যে উদাব সত্রে এই যজ্ঞশালা সংন্যস্ত সেখানে 'যজ্ঞবিধিগুলি' আব 'কৌলিকবিদ্যা' মাত্রই নয। 'ভারতবর্ষেব ইতিহাসেব ধাবা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

'ভাবতবর্ষেব ইতিহাসে আমবা প্রাচীনকাল হইতেই দেখিযাছি, জডত্বের বিরুদ্ধে তাহাব চিত্ত ববাববই যুদ্ধ কবিযা আসিযাছে,—ভাবতেব সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহাব উপনিষদ, তাহার গীতা, তাহাব বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম সমস্তই এই মহাযুদ্ধে জয়লব্ধ সামগ্রী, তাহার শ্রীকৃষ্ণ তাহাব শ্রীবামচন্দ্র এই মহাযুদ্ধেরই অধিনায়ক; আমাদের চিবদিনেব এই মুক্তিপ্রিয ভাবতবর্ষ বহুকালের জডত্বের নানা বোঝাকে মাথায় লইযা একই জাযগায শতাব্দীর পব শতাব্দী নিশ্চল পডিযা থাকিবে ইহা কখনোই তাহাব প্রকৃতিগত নহে। ইহা তাহাব দেহ নহে, ইহা তাহার জীবনের আনন্দ নহে, ইহা তাহাব বাহিরের দায।'[২৮]

পঞ্চম স্তবকে এই 'দায়ে'র কথাই কবি বলেছেন—

এ দুখবহন কবো মোব মন, শোনো রে একের ডাক।
যত লাজভয় করো করো জয়, অপমান দূরে যাক।

দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান
জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ।
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে,
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

'বিপুল নীড়ে জননীর জাগরণ' অরসিকের কাছে উদ্ভট কল্পনা বলে মনে হতে পারে। বস্তুত, 'সাহিত্যে'র সমালোচনায় বলা হয়েছিল—

'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মাতৃ-অভিষেক' নামক কবিতার ছন্দের ঝংকারে কবির 'মানসী' ও 'সোনার তরী'র মন্ত্রধ্বনি মনে পড়ে। 'মাতৃ-অভিষেক' কবিতা নহে, ছন্দে গ্রথিত বক্তৃতা—

'পোহায় রজনী, জাগিছে জননী
বিপুল নীড়ে',

সু-কল্পনা নহে। 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'—নীড়ে অর্থাৎ পাখীর বাসায় জননী জাগিতেছে, এই খঞ্জ কল্পনা রবীন্দ্রনাথের যোগ্য নহে।'[২৯]

সমালোচক 'নীড়ে'র অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন নি। 'নীড়' অর্থ তাঁর মতে 'পাখীর বাসা।' আসলে শব্দটি একটি বেদমন্ত্রে ধৃত বৈদিক শব্দ। মন্ত্রটি হল শুক্লযজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতার একটি সূত্র। তাতে আছে 'বেনস্তৎ-পশ্যন্নিহিতং গুহা সদ্ যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীডম্।' বলাই বাহুল্য, যেখানে সমস্ত বিশ্ব একটি নীড়ে সমাশ্রিত তা 'পাখীর নীড়' নয়। শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বিদ্যালয় যখন বিশ্বমানবের শিক্ষাসত্র বিশ্বভারতীতে পরিণত হয়েছে তখন তার আদর্শ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ এই সূক্তের অংশবিশেষ গ্রহণ করেছিলেন· 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।' মাতৃ-অভিষেক কবিতায় এই সূক্তেরই প্রথম প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ নীড়কে বিশেষিত করে বলেছেন 'বিপুল নীড।' বিপুল নীড যে পাখীর নীড হতে পারে না, সেকথা 'সাহিত্যে'র সমালোচকের বোধগম্য হয়নি।

যে-মন্ত্রে বৈদিক ঋষি বলেছিলেন, 'আযন্তু সর্বতঃ স্বাহা' সেই মন্ত্রেই কবি এখানে উদ্বুদ্ধ। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মর্তব্য যে, 'মাতৃ-অভিষেকে'র এই 'বিপুল নীড়ে'র কল্পনাই বাস্তবীভূত হয়েছে কবি-প্রতিষ্ঠিত 'বিশ্বভারতী'তে। বিশ্বভারতীর শিক্ষাগুরু বলেছেন, 'বিশ্বভারতী এই বেদমন্ত্রের দ্বারাই আপন পরিচয় দিতে চায় —'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীডম্'। যে আত্মীয়তা বিশ্বে বিস্তৃত হবার যোগ্য সেই আত্মীয়তার আসন এখানে আমরা পাতব। সেই আসনে জীর্ণতা নেই, মলিনতা নেই, সংকীর্ণতা নেই।'[৩০]

'বিশ্বভারতী'র আরেকটি ভাষণে কবি বলেছেন, 'দেশে দেশে আমরা মানুষকে তার বিশেষ স্বাজাতিক পরিবেষ্টনের মধ্যে খণ্ডিত করে দেখেছি, সেখানে মানুষকে আপন বলে উপলব্ধি করতে পারি নে। পৃথিবীর মধ্যে আমাদের এই আশ্রম এমন একটি জায়গা হয়ে উঠুক যেখানে ধর্ম ভাষা এবং জাতিগত সকল প্রকার পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা মানুষকে তার বাহ্যভেদমুক্তরূপে মানুষ বলে দেখতে পাই। সেই দেখতে পাওয়াই নূতন যুগকে দেখতে পাওয়া। সন্ন্যাসী পূর্বাকাশে প্রথম অরুণোদয় দেখবে বলে জেগে আছে। যখনই অন্ধকারের প্রান্তে আলোকের আরক্ত রেখাটি দেখতে পায় তখনই সে জানে যে, প্রভাতের জয়ধ্বজা তিমিররাত্রির প্রাকারের উপর আপন কেতন উড়িয়েছে। আমরা তেমনি করে ভারতের এই পূর্বপ্রান্তে এই প্রান্তরশেষে যেন আজ নববর্ষের প্রভাতে ভেদবাধার তিমির-মুক্ত মানুষের রূপ আমাদের এখানে সমাগত অতিথি বন্ধু সকলের মধ্যে উজ্জ্বল করে দেখতে পাই। সেই দেখতে পাওয়া থেকেই যেন মনের মধ্যে শ্রদ্ধা করতে পারি যে, মানুষের ইতিহাসে নবযুগের অরুণোদয় আরম্ভ হয়েছে।'[৩১]

এই নবযুগের অরুণোদয়ের নান্দীপাঠ করা হয়েছে 'মাতৃ-অভিষেকে'। 'পোহায় রজনী'র ব্যঞ্জনা সেখানেই নিহিত রয়েছে। উদ্ধৃত অংশে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ধর্ম ভাষা ও জাতিগত সকল প্রকার পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা মানুষকে তার বাহ্যভেদমুক্তরূপে মানুষ বলে দেখতে' চাই। 'এই দেখতে পাওয়াই নূতন যুগকে দেখতে পাওয়া।'

এই নূতন যুগকে দেখবার আহ্বানই 'মাতৃ-অভিষেকে'র অন্তিম স্তবকে ঘোষিত হয়েছে—

এসো হে আর্য, এসো অনার্য হিন্দু-মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার
এসো হে পতিত, করো অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

এই আহ্বান জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে আহ্বান। আর্য অনার্য ইংরেজ,

হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান, ব্রাহ্মণ ও পতিত—সকলকেই 'মাতৃ-অভিষেকে' কবি আহ্বান করেছেন।

কবিতাটির আবম্ভ হযেছিল 'এই ভাবতের মহামানবেব সাগবতীবে' 'উদার ছন্দে পবমানন্দে' 'নরদেবতা'কে বন্দনা কবাব জন্য কবিব আত্মজাগরণের সংকল্প উচ্চাবণ ক'বে। কবিতাটি সমাপ্ত হযেছে সবাব-পবশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে মাতৃ-অভিষেকেব মঙ্গলঘট পূর্ণ কবাব জন্য সর্বমানবকে আহ্বান কবে। 'মহামানবেব সাগবতীব'-এব রূপকল্পটি এই কবিতাব আরেকটি অসামান্য সম্পদ। 'আযন্তু সর্বতঃ স্বাহা' মন্ত্রের ব্যাখ্যায [ বিশ্বভাবতী-১২ ] ববীন্দ্রনাথ প্রাচীন আচার্য-গণেব আহ্বানমন্ত্রেব ভাষ্য ক'বে বলেছিলেন, 'জলধাবাসকল যেমন সমুদ্রেব মধ্যে এসে মিলিত হয তেমনি কবে সকলে এখানে মিলিত হোক।' গীতোক্ত বাণী নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পযসামর্ণব ইব' মহামানবেব সাগবতীবে নতুন অর্থে অভিব্যঞ্জিত হযেছে। গীতোক্ত ত্বং হচ্ছেন শ্রীভগবান। ববীন্দ্রনাথ গীতোক্ত উপমাকে রূপকে রূপান্তবিত কবে মহামানবেব সাগবতীবে উপনীত হয়েছেন। এখানে মহামানবই মহাসমুদ্র।

তরুণ যৌবনে রচিত 'নির্ঝবেব স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাব দুটি ব্যাখ্যা কবি কবেছেন। একটি আছে জীবনস্মৃতিতে। অন্যটি 'মানুষেব ধর্ম' গ্রন্থেব পবিশিষ্ট 'মানবসত্য' প্রবন্ধে। 'মানবসত্যে' 'নির্ঝবেব স্বপ্নভঙ্গে'ব নবব্যাখ্যা বচনা কবে কবি বলেছেন, 'সেদিন কাবাব দ্বাব খুলে বেবিযে পডবাব জন্যে, জীবনেব সকল বিচিত্র লীলাব সঙ্গে যোগযুক্ত হযে প্রবাহিত হবাব জন্যে অন্তবেব মধ্যে তীব্র ব্যাকুলতা। সেই প্রবাহেব গতি মহান বিবাট সমুদ্রেব দিকে। তাকেই এখন বলেছি বিবাট পুরুষ। সেই যে মহামানব তাবই মধ্যে গিযে নদী মিলবে, কিন্তু সকলেব মধ্য দিযে। এই যে ডাক পড়ল, সূর্যেব আলোতে জেগে মন ব্যাকুল হয়ে উঠল, এ আহ্বান কোথা থেকে। এর আকর্ষণ মহাসমুদ্রেব দিকে সমস্ত মানবের ভিতর দিযে, সংসাবেব ভিতর দিযে, ভোগ ত্যাগ কিছুই অস্বীকাব কবে নয়, সমস্ত স্পর্শ নিযে শেষে পডে এক জায়গায…। এই মহাসমুদ্রকে এখন নাম দিযেছি মহামানব।'৩২

'মাতৃ-অভিষেক' তথা ভারততীর্থ কবিতায় সবার-পরশে-পবিত্র-করা-তীর্থ-নীবে যে মাতৃ-অভিষেক হল সেই মাতা হলেন জননী জন্মভূমি ভারতবর্ষ। মহামানব-সাগবতীরে এই মাতৃ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। এই মন্দিরের পুণ্যতীর্থে দাঁড়িয়ে কবি যে-দেবতার বন্দনা করলেন তিনি হলেন নতুন যুগের দেবতা—

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'নবদেবতা'। ভারততীর্থরূপ মহামানবের সাগরতীরে এই নবীন নবদেবতার বন্দনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশ-চেতনাকে বিশ্বচেতনায় অভিসিঞ্চিত করে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তার সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার রাখীবন্ধন ঘটালেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনমূলক 'ধর্মতত্ত্বে'র ভাষায় এই 'জাগতিক প্রীতি'ই প্রীতিবৃত্তির শেষকথা। বুদ্ধদেবের ভাষায় তারই নাম বিশ্বমৈত্রী।

## উল্লেখপঞ্জী

১. দ্রষ্টব্য 'গীতাঞ্জলি', সং বৈশাখ ১৩৮০, পৃ ১৩৪।
২. বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী, পরিষৎ-সংস্করণ, পৃ ৬২।
৩. রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিশ্বভারতী সং, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৫৭০।
৪. তদেব, পৃ ৫৭১।
৫, দ্রষ্টব্য, নন্দরাণী চৌধুরী সংকলিত 'সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ', পৃ ৪৫।
৬. 'কবি ও কবিতা প্রকাশন' থেকে 'ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য' অচিরকাল-মধ্যে প্রকাশিত হবে।
৭. প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত 'ভূদেব-রচনাসম্ভার', পৃ ৩৪৫।
৮. তদেব পৃ ৩৪৫-৪৬।
৯. তদেব, পৃ ৪৩৬।
১০. 'ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য', সপ্তম অধ্যায়, ভূদেব ও রবীন্দ্রনাথ।
১১. তদেব।
১২. দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রকবিতাশতক-১, 'নমস্কার' প্রবন্ধ, পৃ ৯৩-১১৫।
১৩. Sri Aurobindo Birth Centenary Library, প্রথম খণ্ড, পৃ ৫৯।
১৪. তদেব, পৃ ৭০-৭১।
১৫. উদ্ধৃতিটি প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ থেকে উৎকলিত। এই গ্রন্থে অধ্যাপক সেন দুই পর্যায়ে 'ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত' সম্পর্কে তথ্যসংবলিত মূল্যবান আলোচনা করেছেন।
১৬. 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ', পৃ ২৪২।
১৭. দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রকবিতাশতক-১, পৃ ৬৭।
১৮. দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্ররচনাবলী-৬, পৃ ৪৭৯।
১৯. ইংরেজিতে অনূদিত আঁদ্রে মরোয়ার 'Seven Faces of Love' গ্রন্থের ভারতীয় [ Jaico Publishing House ] সংস্করণ, পৃ ১৬০।
২০. দ্রষ্টব্য, নন্দরাণী চৌধুরী সংকলিত 'সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ', পৃ ৫৩।
২১. দ্রষ্টব্য, কালান্তর। র-র-২৪, পৃ ৩৬৮-৬৯।

২২. তদেব। পৃ ৩৬৮।

২৩ তদেব।

২৪. তদেব, পৃ ৩৭০। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে 'রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতের ভৌগোলিক রূপ' এবং 'রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতের ঐতিহাসিক রূপ' প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

২৫. 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে উদ্ধৃত। দ্রষ্টব্য, উক্ত গ্রন্থ, পৃ ৭।

২৬. র-র-৪, পৃ ৩৮১।

২৭. তদেব। পৃ ৩৮২-৮৩।

২৮. র-র-১৮, পৃ ৪৫০।

২৯ নন্দরাণী চৌধুরী-সংকলিত 'সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ', পৃ ৫৩।

৩০. 'বিশ্বভারতী', ১২-সংখ্যক ভাষণ। দ্রষ্টব্য, র-র-২৭, পৃ ৩৯৫।

৩১. তদেব, পৃ ৩৭৫।

৩২. র-র ২০, পৃ ৪২৫-৪২৬।

# ঝুলন

১

মানুষেব সত্তায় 'দুই-আমি'র বসতি : প্রেয়োবোধেব আমি আব শ্রেয়োবোধেব আমি। একজন কুসুমাস্তীর্ণ পথে সুকুমাব জীবনচর্যাব উপাসক, অন্যজন কণ্টকাকীর্ণ পথে মৃত্যুবিজয়ী জীবনসংগ্রামেব সাধক। ললিতে-কঠোবে বিপবীত এই দুই-আমি'ব লীলা ববীন্দ্রজীবনের নানা পর্যাযে বিচিত্ররূপে বিলসিত।

কবি 'শেষসপ্তকে'র তেতাল্লিশ-সংখ্যক পত্রকবিতায তাঁব আত্মজীবনেব ইতিহাস-বচনা প্রসঙ্গে মুখ্যত এই দুই-আমি'ব লীলাবহস্যেব ইঙ্গিত দিযেছেন। বলেছেন, তাঁব 'জন্মদিনেব কিশোব জগৎ / ছিল রূপকথাব পাডাব গাযে-গায়েই, / জানা না-জানাব সংশযে।'

সেখানে বাজকন্যা আপন এলোচুলেব আববণে
কখনো বা ছিল ঘুমিযে,
কখনো বা জেগেছিল চমকে উঠে'
সোনাব কাঠিব পবশ লেগে।

দিন গেল।
সেই বাসন্তী রঙেব পঁচিশে বৈশাখেব
বং-কবা প্রাচীবগুলো
পডল ভেঙে।

যে পথে বকুলবনেব পাতাব দোলনে
ছাযায লাগত কাঁপন,
হাওয়ায জাগত মর্মব।
বিবহী কোকিলেব
কুহুববেব মিনতিতে
আতুর হত মধ্যাহ্ন,
মৌমাছির ডানায় লাগত গুঞ্জন
ফুলগন্ধের অদৃশ্য ইশারা বেয়ে,

সেই তৃণ-বিছানো বীথিকা
পৌঁছল এসে পাথরে-বাঁধানো রাজপথে।
* * *

সেদিন পঁচিশে বৈশাখ
আমাকে আনল ডেকে
বন্ধুর পথ দিয়ে
তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্রতীরে।
* * *

সেদিন জীবনের রণক্ষেত্রে
দিকে দিকে জেগে উঠল সংগ্রামের সংঘাত
গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে।

এই কবিতায় কবি তাঁর কৈশোরের 'তৃণ-বিছানো বীথিকা' যে একদিন যৌবনের 'পাথরে-বাঁধানো রাজপথে' এসে পৌঁছেছিল তার উল্লেখমাত্রই করেছেন, বলেছেন কি করে বকুলবনের বিরহী-কোকিলের কুহুরবের মিনতিতে আতুর মধ্যাহ্নের বাসন্তী রঙের দিনগুলি একদিন তাঁকে বন্ধুর পথ দিয়ে তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্রের তীরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। কবির এই উত্তর-সত্তরের স্মৃতিচারণই সন্ধ্যা-সংগীতের 'সংগ্রাম-সংগীত' এবং 'আমি-হারা' কবিতায় এবং 'সোনার তরী'র 'ঝুলন' কবিতায় কাব্যরসে উচ্ছলিত হয়ে উঠেছিল।

২

'সন্ধ্যাসংগীতে'র 'আমি-হারা' কবিতায় কৈশোরের প্রেয়োবোধের আমি-কে হারানোর বেদনাই ভাষা পেয়েছে। সে-আমি'র পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন,

ঘুমাইলে, নন্দন-বালিকা
গেঁথে দিত স্বপন-মালিকা,
জাগরণে, নয়নে তাহার
ছায়াময় স্বপন জাগিত;
আশা তার পাখা প্রসারিয়া
উড়ে যেত উধাও হইয়া,

চাঁদের পায়েব কাছে গিযে
জ্যোৎস্নাময় অমৃত মাগিত।
বনে সে তুলিত শুধু ফুল,
শিশির করিত শুধু পান,
প্রভাতেব পাখিটিব মতো
হরষে করিত শুধু গান।

সেই 'আমি'ব পরিচয সম্পূর্ণ ক'বে কবি বলেছেন

সে আমাব শৈশবেব কুঁড়ি,
সে আমাব সুকুমাব আমি।

এই 'শৈশবের কুঁড়ি', এই 'সুকুমাব আমি'কে কৈশোবোত্তীর্ণ কবি যেন হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই হাবানোব বেদনা এবং 'সুকুমার আমি'কে ফিবে পাওয়ার ব্যাকুলতাই ভাষা পেয়েছে 'সংগ্রাম-সংগীতে'। কবি বলছেন—

হৃদযেব সাথে আজি
কবিব বে কবিব সংগ্রাম।

হৃদযেব অপরাধ কি? তাব উত্তরে কবি বলেছেন,

বিদ্রোহী এ হৃদয আমাব
জগৎ কবিছে ছাবখাব।

কিভাবে বিদ্রোহী হৃদয জগৎকে ছাবখাব কবছে তাবও উত্তব আছে কবিতায। 'উষাব মুখেব হাসি লযেছে কাড়িযা।' 'প্রাণেব পাখিব গান দিযেছে থামায়ে।' 'বেড়াত যে সাধগুলি / মেঘেব দোলায দুলি, / তাদেব দিযেছে হায ভূতলে নামায়ে।' অর্থাৎ 'বিদ্রোহী হৃদয' কবিব 'সুকুমাব আমি'কে পবাভূত কবে তাঁর স্বপ্নোপম নিসর্গলোককে মরুভূমিতে পবিণত করেছে। তাই কবিব সংকল্প

ফিবে নেব হাবানো সংগীত
ফিবে নেব মৃতের জীবন,
জগতেব ললাট হইতে
আঁধাব কবিব প্রক্ষালন।

অর্থাৎ, সন্ধ্যাসংগীতেব 'আমিহারা' ও 'সংগ্রাম-সংগীত'—এই দুটি কবিতায় কবি তাঁর 'সুকুমার আমি'কেই ফিবে পাওয়াব জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কাব্য প্রভাতসংগীতেই কবিকণ্ঠে আশ্বাসেব সুব ফুটে উঠেছে। 'অনন্ত জীবন' কবিতায তিনি বলছেন,

নাই তোর নাই রে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না।

'পুনর্মিলন' কবিতায় কবি তাঁর 'ছেলেবেলার জগতের সঙ্গে' পুনর্মিলনে আনন্দিত হয়েছেন। ছেলেবেলায় প্রকৃতি-জননীর কোলে কবি আনন্দে খেলা করতেন। 'হৃদয়-অরণ্যে' পথ হারিয়ে তিনি 'একলা' হয়ে পড়েছিলেন, একটি পাখি তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল 'অরণ্য-বাহিরে', নিয়ে এল 'আনন্দের সমুদ্রের তীরে।'

'পুনর্মিলন' কবিতার এই ভাবানুষঙ্গই মোহিতচন্দ্র সেনকে 'হৃদয়-অরণ্য' থেকে 'নিষ্ক্রমণ'-তত্ত্বরচনায় প্রাণিত করেছিল। কিন্তু এই 'হৃদয়-অরণ্য' এবং 'নিষ্ক্রমণ'-তত্ত্বব্যাখ্যায় সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাতসংগীতের কবিমানসকে ভুল বোঝারও সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা অন্যত্র এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছি।[১]

রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থে'র 'হৃদয়-অরণ্য' পর্যায়ে সংকলিত কবিতাগুলির যে 'প্রবেশক' কবিতাটি লিখে দিয়েছিলেন [ ১৩১০ ], তাতে তিনি বলেছেন,

কুঁড়ির ভিতরে আকুল গন্ধ ভাবিছে বসে—
ভাবিছে উদাসপারা,—
জীবন আমার কাহার দোষে
এমন অর্থহারা।
কহিছে সে—হায় হায়।
কেন আমি কাঁদি, কেন আছি গো
অর্থ না বুঝা যায়।
ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা।
যে শুভ প্রভাতে সকলের সাথে
মিলিবি, পুরাবি কামনা,
আপন অর্থ সেদিন বুঝিবি।
জনম ব্যর্থ যাবে না।

অর্থাৎ, 'যে-শুভ প্রভাতে সকলের সাথে' মিলন সম্ভব হবে সেদিন 'আপন অর্থ' বুঝতে পারা যাবে, কাজেই 'জনম ব্যর্থ যাবে না।' কবির একুশ বৎসর বয়সে লেখা 'সন্ধ্যাসংগীত' সম্পর্কে বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে লেখা এই কাব্যভাষ্যও যথাযথ

হয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না। সন্ধ্যাসংগীত-প্রভাতসংগীতের যুগে যে-নিসর্গ-প্রকৃতির সঙ্গে 'সুকুমার আমি'র লীলা, সেই 'নিসর্গ-প্রকৃতি' আর প্রবেশক-কবিতার 'সকল' কিন্তু সমার্থক নয়। এই 'সকল' নিসর্গবিশ্ব এবং মানববিশ্ব—দুইকে নিয়েই সম্পূর্ণ। সন্ধ্যাসংগীতে নিসর্গবিশ্বই মুখ্য। 'আমিহারা' কবিতার রূপকল্প-গুলি কেবল নিসর্গবিশ্ব থেকেই সমাহৃত।

পঞ্চাশোত্তর বয়সে লেখা 'জীবনস্মৃতি'র বিশ্লেষণটিও এখানে উদ্ধার করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না,—

'মানুষের মধ্যে একটা দ্বৈত আছে। বাহিরের ঘটনা, বাহিরের জীবনের সমস্ত চিন্তা ও আবেগের গভীর অন্তরালে যে-মানুষটা বসিয়া আছে, তাহাকে ভালো করিয়া চিনি না ও ভুলিয়া থাকি, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহার সত্তাকে তো লোপ করিতে পারি না। বাহিরের সঙ্গে তাহার অন্তরের সুর যখন মেলে না—সামঞ্জস্য যখন সুন্দর ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না তখন সেই অন্তরনিবাসীর পীড়ার বেদনায় মানসপ্রকৃতি ব্যথিত হইতে থাকে।.........সন্ধ্যাসংগীতে যে বিষাদ ও বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে তার মূল সত্যটি সেই অন্তরের রহস্যের মধ্যে। সমস্ত জীবনের মিল যেখানে আছে সেখানে জীবন কোনোমতে পৌছিতে পারিতেছিল না। নিদ্রার অভিভূত চৈতন্য যেমন দুঃস্বপ্নের সঙ্গে লড়াই করিয়া কোনোমতে জাগিয়া উঠিতে চায়, ভিতরের সত্তাটি তেমনি করিয়াই বাহিরের সমস্ত জটিলতাকে কাটাইয়া নিজেকে উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে থাকে—অন্তরের গভীরতম অলক্ষ্য প্রদেশের সেই যুদ্ধের ইতিহাসই অস্পষ্ট ভাষায় সন্ধ্যাসংগীতে প্রকাশিত হইয়াছে'।[২]

এই উদ্ধৃতিতে রবীন্দ্রনাথ 'অন্তরের গভীরতম অলক্ষ্য প্রদেশের' যুদ্ধের কথা বলেছেন। কিন্তু এই যুদ্ধের হেতুনির্দেশ খুব স্পষ্ট হয় নি। 'জীবনস্মৃতি'র প্রভাত-সংগীত অধ্যায়ে কবি পুনশ্চ সন্ধ্যাসংগীতের কথা তুলেছেন। সেখানে তাঁর বক্তব্য স্পষ্টতর। তিনি বলছেন:

'আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ ও নিবিড় যোগ ছিল।.. সকালে জাগিবামাত্রই সমস্ত পৃথিবীর জীবনোল্লাস আমার মনকে তাহার খেলার সঙ্গীর মতো ডাকিয়া বাহির করিত, মধ্যাহ্নে সমস্ত আকাশ এবং প্রহর যেন সুতীব্র হইয়া উঠিয়া আপন গভীরতার মধ্যে আমাকে বিবাগি করিয়া দিত এবং রাত্রির অন্ধকার যে-মায়াপথের গোপন দরজাটা খুলিয়া দিত তাহা সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা ছাড়াইয়া রূপকথার অপরূপ রাজ্যে সাতসমুদ্র তেরোনদী পার করিয়া লইয়া

যাইত। তাহার পর একদিন যখন যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয় আপনার খোরাকের দাবি করিতে লাগিল তখন বাহিরের সঙ্গে জীবনের সহজ যোগটি বাধাগ্রস্ত হইয়া গেল। তখন ব্যথিত হৃদয়টাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নিজের মধ্যেই নিজের আবর্তন শুরু হইল—চেতনা তখন আপনার ভিতর দিকেই আবদ্ধ রহিল। এইরূপে রুগ্ন হৃদয়টার আব্দারে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের যে-সামঞ্জস্যটা ভাঙিয়া গেল, নিজের চিরদিনের যে সহজ অধিকারটি হারাইলাম, সন্ধ্যাসংগীতে তাহারই বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে'।[৩]

এই ব্যাখ্যায় অন্তরের সঙ্গে বাহিরের সামঞ্জস্য ভাঙার কারণ হল শৈশবের নিসর্গবিহ্বলতার সঙ্গে যৌবনের প্রেমবিহ্বলতার দ্বন্দ্ব। সন্ধ্যাসংগীতের এই দ্বন্দ্ব কিন্তু প্রভাতসংগীতে বিদূরিত হয়েছে। কবি বলছেন, 'আমার শিশুকালের বিশ্বকে প্রভাতসংগীতে যখন আবার পাইলাম তখন তাহাকে অনেক বেশি পাওয়া গেল। এমনি করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে সহজ মিলন, বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনে জীবনের প্রথম অধ্যায়ের একটা পালা শেষ হইয়া গেল'।[৪]

অর্থাৎ, সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাতসংগীতে কবির 'শিশুকালের বিশ্ব'কে নিয়ে একটা পালা গড়ে উঠেছিল: কবি বলেছেন, সে পালার সেখানেই সমাপ্তি। কিন্তু, রবীন্দ্রকাব্যরসিক বারবার লক্ষ্য করেছেন, সেই 'পালা' কবিজীবনের বিভিন্নপর্বে বিভিন্নরূপে দেখা দিয়েছে। শুধু রবীন্দ্রনাথের জীবনেই নয়, মানুষমাত্রেরই সত্তায় এই 'দুই-আমি'র লীলা নানাভাবে লীলায়িত। আমরা তার সাধারণ নাম দিয়েছি 'প্রেয়োবোধের আমি' ও 'শ্রেয়োবোধের আমি'। 'ছিন্নপত্রাবলী'র একখানি চিঠিতে কবি বলেছেন, 'আমি জানি আমার এক অংশ পাগল—যতই ইচ্ছা করি, আমি ইহজীবনে কিছুতেই তাকে বাঁধতে পারব না, আমার সহজ অংশ যা প্রতিজ্ঞা করে আমার পাগল তা রক্ষা করে না, ভেঙে দেয়'।[৫]

'চিত্রা'র যুগে দুটি কবিতা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'আবেদন' আর 'এবার ফিরাও মোরে'। বিশ্বভারতী সংস্করণ 'রচনাবলী'তে 'চিত্রা'র 'সূচনা'য় কবি বলেছেন, ' "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় কর্মজীবনের সেই বিচিত্রের ডাক পড়েছে। "আবেদন" কবিতায় ঠিক তার উলটো কথা। কবি বলছে, "কর্মক্ষেত্রে যেখানে কার্যক্ষেত্রের জনতায় কর্মীরা কর্ম করছে সেখানে আমার স্থান নয়। আমার স্থান সৌন্দর্যের সাধকরূপে একা তোমার কাছে।" জীবনের দুই ভিন্ন মহলে কবির এই ভিন্ন ভিন্ন কথা'।[৬]

আমবা বলি, 'আবেদন' কবিতায কবিমানসের প্রেযোবোধের প্রকাশ, আর 'এবার ফিবাও মোবে' কবিতায শ্রেযোবোধের।

৩

শৈশব-কৈশোবেব 'সুকুমাব আমি'ব লীলানিকেতন নিসর্গপ্রকৃতিব সঙ্গে 'সহজ মিলন, বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনে'ব পালা কিন্তু সন্ধ্যাসংগীত-প্রভাতসংগীতেই নিঃশেষিত হয নি। 'ছবি ও গানে'ও এই 'সুকুমাব আমি'বই প্রাধান্য। 'ছবি ও গানে' কবি তাঁব আত্মপবিচয দিযেছেন 'পাগল' আব 'মাতাল' কবিতায। 'পাগল' কবিতায তিনি বলছেন—

যেখান দিযে যায সে চলে সেথায যেন ঢেউ খেলে যায,
বাতাস যেন আকুল হযে ওঠে,
ধবা যেন চবণ ছুঁযে শিউবে ওঠে শ্যামল দেহে
লতায যেন কুসুম ফোটে ফোটে।

আব 'মাতালে'ব পবিচয হল—'চাঁদেব কিবণ পান কবে ওব ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি'। বলাই বাহুল্য, এই পাগলে আব মাতালে কোনো বৈভিন্ন্য নেই। পাগলই চাঁদেব কিবণ পান ক'বে মাতাল হয। আব, স্বরূপত উভযেই কবির 'সুকুমাব আমি'র যুগলমূর্তি। 'ছবি ও গানে' এই 'সুকুমার আমি'কেই কবি সমস্ত দুঃখ-বেদনা থেকে আগ্‌লে বাখাব জন্য ব্যাকুল ছিলেন। 'নিশীথ-জগৎ' কবিতায তিনি সে কথা আবেগভবেই উচ্চাবণ কবেছেন—

'নিশীথেব কাবাগাবে কে বেঁধে বেখেছে মোরে
বযেছি পড়িযা,
কেবলি বযেছি বেঁচে স্বপন কুডাযে লযে
ভাঙিয়া গডিযা।
আঁধাবে নিজেব পানে চেযে দেখি, ভালো কবে
দেখিতে না পাই,
হৃদযে অজানা দেশে পাখি গায ফুল ফোটে
পথ জানি নাই।
অন্ধকারে আপনাবে দেখিতে না পাই যত
তত ভালোবাসি,

তত তারে বুকে করে বাহুতে বাঁধিযা লযে
হরষেতে ভাসি।
তত যেন মনে হয পাছে বে চলিতে পথে
তৃণ ফুটে পায়,
যতনেব ধন পাছে চমকি কাঁদিযা ওঠে
কুসুমেব ঘায।'

'ছবি ও গানে'ব এই 'যতনেব ধন'ই কবিব 'সুকুমার আমি'। 'ঝুলন' কবিতায সে-ই কবির 'পবানবধূ'। 'নিশীথ-জগতে'ব উদ্ধৃতাংশই 'ঝুলনে'ব চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তবকে পবিশীলিত কাব্যরূপ পেযেছে।

৪

'কড়ি ও কোমল' থেকে ধীবে ধীবে কবিমানসেব পবিবর্তন পবিলক্ষিত হল। 'জীবনস্মৃতি'ব শেষ অধ্যায 'কড়ি ও কোমল'। সেই পর্ব সম্পর্কে কবি বলেছেন তিনি যেন জীবনেব 'খাসমহালেব দবজাব কাছে' এসে পৌঁছলেন। সেখানে কত ভাঙাগড়া, কত জয-পবাজয, কত সংঘাত ও সম্মিলন। এই সমস্ত বাধা বিবোধ ও বক্রতাব ভিতব দিযে কবিব জীবনদেবতা আনন্দময নৈপুণ্যেব সঙ্গে একটি অন্তবতম অভিপ্রাযকে বিকাশেব দিকে এগিযে নিযে চলেছেন।

'আত্মপবিচযে'ব অন্তর্ভুক্ত 'আমাব ধর্ম' প্রবন্ধে ববীন্দ্রনাথ এই পর্বকে বলেছেন, 'বিশ্বমানবেব বণক্ষেত্রে ভীষ্মপর্ব'। এই প্রবন্ধে কবি তাঁব 'ধর্ম' অর্থাৎ আত্মবিকাশেব তিনটি স্তরেব কথা বলেছেন। 'ধর্মবোধেব প্রথম অবস্থায শান্তং, মানুষ তখন আপন প্রকৃতিব অধীন—তখন সে সুখকেই চায, সম্পদকেই চায, তখন শিশুব মতো কেবল তাব বসভোগেব তৃষ্ণা, তখন তার লক্ষ্য প্রেয। তাব পবে মনুষ্যত্বেব উদ্বোধনেব সঙ্গে তাব দ্বিধা আসে, তখন সুখ এবং দুঃখ, ভালো এবং মন্দ, এই দুই বিবোধেব সমাধান সে খোঁজে,—তখন দুঃখকে সে এড়ায না, মৃত্যুকে সে ডবায না। এই অবস্থায শিবং, তখন তাব লক্ষ্য শ্রেয। কিন্তু এইখানেই শেষ নয—শেষ হচ্ছে প্রেম, আনন্দ। সেখানে সুখ ও দুঃখেব, ভোগ ও ত্যাগেব, জীবন ও মৃত্যুব গঙ্গাযমুনা-সংগম। সেখানে অদ্বৈতং'।[৭]

'ঝুলন' কবিতায এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তব ।শল্পিত লীরিকে অনবদ্য কাব্যরূপ লাভ করেছে।

যে-পর্বকে কবি বলেছেন 'বিশ্বমানবের রণক্ষেত্রে ভীষ্মপর্ব', কবিতার ভাষায় 'তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্রতীরে' পৌঁছে যখন 'জীবণের রণক্ষেত্রে / দিকে দিকে জেগে উঠল সংগ্রামের সংঘাত', সে-পর্বের সূত্রপাত হয়েছে 'কড়ি ও কোমলে'র যুগ থেকেই। ওই কাব্যসংকলনের 'আহ্বান-গীত' কবিতায় তার ইঙ্গিত স্পষ্ট। তারও আগে 'স্বপ্নরুদ্ধ' এবং 'কবির অহংকার' শীর্ষক দুটি সনেটে যেন তারই নান্দীপাঠ। শ্রেয়োবোধের উন্মেষে আত্মধিক্কার দিয়েই 'স্বপ্নরুদ্ধে'র ষট্‌কবন্ধ বিরচিত—

আমি গাঁথি আপনার চারি দিক ঘিরে
সূক্ষ্ম রেশমের জাল কীটের মতন।
মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে,
দেখি না এ জগতের প্রকাণ্ড জীবন।
কেন আমি আপনার অন্তরালে থাকি,
মুদ্রিত পাতার মাঝে কাঁদে অন্ধ আঁখি।

'কবির অহংকার' সনেটে শুধু গান গাওয়া, অর্থাৎ শুদ্ধ কবিত্বকে কবি বলেছেন 'শূন্য অমরতা'। এই কবিতাটি যেন 'এবার ফিরাও মোরে'র প্রাথমিক খসড়া। কবি বলছেন—

কে আছ মলিন হেথা, কে আছ দুর্বল,
মোরে তোমাদের মাঝে করো গো আহ্বান,
বারেক একত্রে বসে ফেলি অশ্রুজল,
দূর করি হীন গর্ব, শূন্য অভিমান।
তার পরে এক সাথে এস কাজ করি,
কেবলি বিলাপ-গান দূরে পরিহরি'।

'আহ্বান-গীতে' এই পর্বের বোধনমন্ত্র উচ্চারিত—

চলো দিবালোকে, চলো লোকালয়ে,
চলো জনকোলাহলে—
মিশাব হৃদয় মানব-হৃদয়ে
অসীম আকাশতলে।

'মানসী'র যুগে 'জীবনমধ্যাহ্ন', 'দুরন্ত আশা', 'কবির প্রতি নিবেদন', 'পরিত্যক্ত' এবং 'ভৈরবী গান' কবিতায় কবিকণ্ঠে 'মনুষ্যত্বের উদ্বোধন' ক্রমশ অধিক সোচ্চার হয়েছে। 'জীবন-মধ্যাহ্ন' কবিতার অন্তিম স্তবকে কবি বলছেন

শুধু জেগে উঠে প্রেম মঙ্গল মধুব,
বেড়ে যায় জীবনের গতি,
ধূলিধৌত দুঃখশোক শুভ্রশান্ত বেশে
ধরে যেন আনন্দ-মুরতি।
বন্ধন হাবাযে গিয়ে স্বার্থ ব্যাপ্ত হয
অবাবিত জগতেব মাঝে,
বিশ্বেব নিশ্বাস লাগি জীবন-কুহরে
মঙ্গল আনন্দধ্বনি বাজে।

'ডুবন্ত আশা' কবিতায 'অন্নপাযী বঙ্গবাসী'কে যে 'স্তন্যপায়ী জীব' বলেছেন, সে-ভর্ৎসনাও নিজেকে বাদ দিযে নয। তাই কবি বলেছেন

বিপদ মাঝে ঝাঁপাযে পড়ে,
শোণিত উঠে ফুটে,
সকল দেহে সকল মনে
জীবন জেগে ওঠে।
অন্ধকাবে, সূর্যালোতে,
সন্তবিযা মৃত্যুস্রোতে
নৃত্যময চিত্ত হতে
মত্ত হাসি টুটে।
বিশ্বমাঝে মহান যাহা,
সঙ্গী পবানেব,
ঝঞ্ঝামাঝে ধায সে প্রাণ
সিন্ধুমাঝে লুটে।

এই স্তবকের রূপকল্পগুলিই 'ঝুলন' কবিতায ঘনীভূত হয়ে হীবকদ্যুতি লাভ কবেছে। 'ভৈরবী গান'-এব অন্তিম স্তবকে মানসী-যুগেব শ্রেযোবোধ যেন তুঙ্গশিখবে আরোহণ করল—

ওগো এব চেয়ে ভালো প্রখর দহন,
নিঠুব আঘাত চবণে।
যাব আজীবন কাল পাষাণ-কঠিন
সবণে।

যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ,
সুখ আছে সেই মরণে।

কৈশোরের 'তৃণ-বিছানো বীথিকা' যে একদিন 'পাথরে-বাঁধানো রাজপথে' এসে পৌঁচেছিল তারই সাক্ষ্য বহন করছে 'পাষাণ-কঠিন সরণে'র কবিভাষিত।

গ্রন্থাকারে 'মানসী' প্রকাশিত হয় ১২৯৭ সালে। পর বৎসর সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত হল 'সাধনা' মাসিক-পত্রিকা। প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ সাধনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। চতুর্থ বৎসরে স্ব-নামে সম্পাদন-ভারও গ্রহণ করেছিলেন। সাধনার প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ মাসে। অগ্রহায়ণেই এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখেন, 'দিন কতক খুব কঠিন কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার হয়েছে'।[৮]

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি [ ফাল্গুন ১২৯৯ ] ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকেও এক পত্রে কবি লিখছেন, 'সাধনা আমার হাতের কুঠারের মতো, আমাদের দেশের বৃহৎ সামাজিক অরণ্য ছেদন করবার জন্যে একে আমি ফেলে রেখে মরচে পড়তে দেব না—একে আমি বরাবর হাতে রেখে দেব'।[৯] তিন দিন পরে পুনশ্চ লিখছেন: 'আমাদের উপেক্ষিত দেশ, আমাদের উপেক্ষিত ভাষা, আমাদের অপমানিত লোকদের কাজে জীবন সমর্পণ করতে হবে'।[১০]

এই দু'খানি পত্রের সঙ্গে 'সোনার তরী'র 'দেউল' [ ২৩ ফাগুন ১২৯৯ ], 'বিশ্বনৃত্য' [ ২৮ ফাগুন ] এবং 'ঝুলন' [ ১৫ চৈত্র ] কবিতাত্রয়ের বস্তুনির্দেশ করলেই সেই পর্বের কবিমানসের পরিচয় স্পষ্ট হবে।

'দেউল' কবিতায় দেখা যাচ্ছে, কবি ত্রিভুবনকে বাইরে রেখে, বিশ্বজনকে ভুলে গিয়ে, একখানি দেউল রচনা করে তাতেই 'আপন-লীন' ছিলেন। সেই অন্ধকার দেউলে কোনো দরজা-জানালা ছিল না। সুতরাং বহির্জগতের সঙ্গেও ছিল না কোনো সম্পর্ক। এই ভাবেই বহুদিন গত হবার পর 'একদা এক ভীষণ ঘোর স্বরে/ বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে'। তারই ফলে দেউলের পাষাণরাশি চূর্ণ হয়ে গেল, অবরুদ্ধ অন্ধকার মন্দিরে দিনের আলো ফুটে উঠল। বহির্বিশ্বের সেই আলোক-পাতে দেউলের দেবতাও নতুন মহিমা লাভ করলেন। রুদ্ধদ্বার দেউল অর্গলমুক্ত হল। কবি বলেছেন—

দেউলে মোর দুয়ার গেল খুলি—
ভিতরে আর বাহিরে কোলাকুলি।

'বিশ্বনৃত্য' কবিতা 'ঝুলনে'র পথে আরো কিছু পথ পরিক্রমা করে এসেছে। কবিকণ্ঠে লেগেছে উদাত্ত স্বর—

হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানবহৃদয়ে মিশিতে—
নিখিলের সাথে মহা রাজপথে
চলিতে দিবসনিশীথে।

অন্তিম স্তবকে এই উদাত্ত সংগীত নিখাদে ঝংকৃত হচ্ছে—

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
বাজুক বিশ্ববাজনা।
উঠুক চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হয়ে আপনা।
টুটুক বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সংগীতে নূতন ছন্দ—
হৃদয়সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাক নবীন বাসনা।

এই 'নবীন বাসনা'ই 'নব সংগীতে নূতন ছন্দ' রচনা করেছে 'ঝুলন' কবিতায়।

৫

'ঝুলন' কবিতার কাব্যবিচার প্রসঙ্গে এই দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োজন অপরিহার্য মনে হয়েছে, কেননা কবির 'The Gardener' কাব্যে সংক্ষেপিত আকারে কবিতাটির যে ইংরেজি ভাবানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে তাতে কবিতাটিকে প্রেমের কবিতা বলেই মনে হয়। অনূদিত আকারে কবিতাটির আরম্ভ 'We are to play the game of death to-night, my bride and I.' এই 'মরণ-খেলা'র তাৎপর্য উপান্ত বাক্যে বিধৃত হয়েছে 'The push of death has swung her into life.' তারপর বর-বধূর পুনর্মিলনে কবিতাটির পরিসমাপ্তি, 'We are face to face and heart to heart, my bride and I'.[১১]

মূল কবিতায় প্রথমে ছিল 'প্রাণে'র সঙ্গে কবির 'মরণখেলার' কথা। এই 'প্রাণ'ই উপমিত অলংকরণের ভাষায় শেষ পর্যন্ত হয়েছিল 'প্রাণবধূ'। কিন্তু অনুবাদে 'প্রাণবধূ' অনলংকৃত ভাষায় হয়েছে 'bride', তারই ফলশ্রুতিতে কবিতাটি বরবধূর মিলনে মধুস্বাদী মিলনান্ত প্রেমকবিতার রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এই 'Bride and I'-অনুবাদে 'Bride' শব্দটি অভিধানিক অর্থ থেকে কিছুটা দূরে সরে গেছে। Oxford English Dictionary অনুসারে Bride-এর মুখ্য অর্থ : 'A woman at her marriage, a woman just about to be married or very recently married'.[১২]

অনূদিত কবিতায় 'ব্রাইড' 'very recently married' অর্থেও বধূ নয়; কেননা অনুবাদেই আছে 'Long have I loved her tenderly'. সুতরাং 'ব্রাইড' শব্দটি ব্যাঙ্গার্থেই গ্রহণযোগ্য। মূল কবিতায় 'আমি' ও 'আমার প্রাণে'র লীলাই আদ্যন্ত কাব্যলাবণ্যে মণ্ডিত হয়েছে। অন্তিম স্তবকেও কবি বলেছেন

প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ
চিনি লব দোঁহে ছাড়ি ভয় লাজ,
বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে
ভাবে বিভোল।

সুতরাং অনুবাদের 'my bride and I' মূলানুগ হয় নি।

এই অনুবাদ প্রকাশের দীর্ঘদীন পরে 'সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধে কবি নিজেই 'ঝুলনে'র অর্থটি বুঝিয়ে বলেছেন। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে বিধৃত এই প্রবন্ধে [ রচনা ১৩৪৩ সাল ] তিনি বলেছেন, 'বেগবান অভিজ্ঞতায় ব্যক্তিপুরুষের প্রবল আত্মানুভূতি। বদ্ধ জল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি ঘা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্তাবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে। তাই দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।

'একদিন এই কথাটি আমার কোনো একটি কবিতায় লিখেছিলেম। বলেছিলেম, 'আমার অন্তরের আমি আলস্যে আবেশে বিলাসের প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, নির্দয় আঘাতে তার অসাড়তা ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে তবেই সেই আমার আপনাকে নিবিড় করে পাই, সেই পাওয়াতেই আনন্দ'।[১৩]

এই বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ 'সত্তাবোধ' কথাটি ব্যবহার করেছেন। বলেছেন, 'নির্দয় আঘাতে' 'আমার অন্তরের আমি'র 'অসাড়তা ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে তবেই সেই আমার আপনাকে নিবিড় করে পাই', এবং 'সেই পাওয়াতেই আনন্দ'। অর্থাৎ 'আমার আপনাকে নিবিড় করে পাওয়া'র আনন্দই 'ঝুলনে' বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যতত্ত্ব প্রসঙ্গে উদাহরণ

হিসাবেই কবিতাটির উল্লেখ করেছেন, সামগ্রিক ভাবে তার কাব্যবিচারে প্রবৃত্ত হন নি। তাই তাঁব ভাববিশ্লেষণে ঝুলনলীলার তাৎপর্য অনুপস্থিত।

পূর্বে আমরা কবিব 'আত্মপরিচযে'র 'আমাব ধর্ম' প্রবন্ধে বিশ্লেষিত তিনটি স্তরের উল্লেখ কবে বলেছি, ঝুলনে আছে একই সঙ্গে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর। বস্তুত, ঝুলন দ্বৈতলীলা। মনুষ্যত্বেব উদ্বোধনে শ্রেযোবোধে সত্তা যে দ্বিধাবিভক্ত হয়, সুখ ও দুঃখ ভালো ও মন্দেব মধ্যে যে বিবোধেব উদ্ভব হয, তাবই সমাধানকল্পে শ্রেযোবোধই হয তার লক্ষ্য। কিন্তু, কবি বলেছেন, এখানেই শেষ নয়—শেষ হচ্ছে প্রেম, আনন্দ। 'সেখানে সুখ ও দুঃখেব, ভোগ ও ত্যাগেব, জীবন ও মৃত্যুব গঙ্গাযমুনা-সংগম। সেখানে অদ্বৈতং।' ঝুলন কবিতায এই দুই স্তবই একত্র বিধৃত। তাই তাকে বলা যেতে পাবে দ্বৈতাদ্বৈত লীলা। কবিতাটির শিল্পরূপ বা কলাকৃতিব বিশ্লেষণেও তাব পবিচয পাওযা যাবে।

৬

'ঝুলন' বাধাকৃষ্ণেব শ্রাবণপূর্ণিমাব মিলনোৎসব। ববীন্দ্রনাথ তাঁব 'দুই-আমি'ব মিলনোৎসবে বৈষ্ণবীয় লীলাব রূপকল্পই গ্রহণ কবেছেন। শুরুতে কবিতাটি ছিল 'মবণখেলা'। প্রথম স্তবকে কবি বলেছেন—

আমি পবাণেব সাথে খেলিব আজিকে
মবণখেলা
নিশীথবেলা।
সঘন ববষা, গগন আঁধাব,
হেবো বাবিধাবে কাঁদে চাবি ধাব,
ভীষণ বঙ্গে ভবতবঙ্গে
ভাসাই ভেলা,
বাহিব হযেছি স্বপ্নশয়ন
কবিযা হেলা
রাত্রিবেলা।

স্বভাবতই বসিকেব প্রথম জিজ্ঞাসা, ঝুলনকে কবি 'মবণখেলা' বললেন কেন? এর উত্তর 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধেই আছে। 'জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুব মধ্যে দিযে তার পরিচয চাই'।[১৪] অর্থাৎ, 'মবণখেলা' উপেয় নয, উপায। তাই

দেখা যাচ্ছে, অষ্টম স্তবকে এই 'নূতন খেলা' আর 'মরণখেলা' নয়, তা 'ঝুলন-খেলা'য় পর্যবসিত হয়েছে :

মরণদোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি,
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া
মারিবে ঠেলা—
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে
ঝুলনখেলা
নিশীথবেলা।

কিন্তু, একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ঝুলনখেলা উপমানরূপেই কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে। তবু বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ভাষা ও ছন্দের দিক দিয়ে কবি বৈষ্ণব-পদাবলীর ঝুলনলীলাকেই অনুসরণ করেছেন। প্রথম স্তবকে আছে

সঘন বরষা, গগন আঁধার
হেরো বারিধারে কাঁদে চারি ধার,
ভীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে
ভাসাই ভেলা।

এই উদ্ধৃতির প্রথম দুটি চরণ বৈষ্ণব কবি নন্দদাসের 'পিতম-প্যারে'র ঝুলনলীলার ভাষা ও ছন্দকে মনে করিয়ে দিচ্ছে—

সঘন মগন গগন ঘোর
হরখে গরজে বরখে জোর ॥[১৫]

পরবর্তী পংক্তিমিথুন স্মরণ করিয়ে দেয় কৃষ্ণানন্দকে—

ঝুলত রঙ্গে নাগর সঙ্গে
প্রেমতরঙ্গে পুলক অঙ্গে ॥[১৬]

কিন্তু ভাষা ও ছন্দগত এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি যে প্রাণধর্মে স্বতন্ত্র, তার প্রতিও দৃষ্টিনিবদ্ধ করা প্রয়োজন। এই স্বাতন্ত্র্যের ইঙ্গিত দিয়ে আমরা অন্যত্র বলেছি, 'বৈষ্ণবের ঝুলনলীলা একান্তভাবেই মাধুর্যলীলা। রবীন্দ্রনাথ তাকে মৃত্যুর তাণ্ডবের সঙ্গে যুক্ত করে 'পবনে গগনে সাগরে' সম্প্রসারিত করে দিয়েছেন। ঝঞ্ঝা এসে অট্টহেসে দোলনাকে প্রচণ্ডবেগে আন্দোলিত করেছে। লক্ষ যক্ষশিশুর

অট্টরোল শোনা যাচ্ছে। 'আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে' হট্টগোল উঠেছে। বৈষ্ণবের আনন্দোৎসব রবীন্দ্রনাথের হাতে মৃত্যুঞ্জয় জীবনতাণ্ডবে রূপান্তরিত হয়েছে'।[১৭]

তাছাড়া, একেবারে শুরুতে ঝুলনের রূপকল্প কবিমানসেও যথাযথভাবে পরিস্ফুট হয়নি। কেননা তখনো তা ছিল 'মরণখেলা', তাই কৃষ্ণানন্দের 'নাগর সঙ্গে' 'প্রেমতরঙ্গ' রবীন্দ্রনাথের কবিতায় হয়েছে 'ভীষণ রঙ্গে' 'ভবতরঙ্গ'। কবি এই ভবতরঙ্গেই ভেলা ভাসিয়েছেন। বিক্ষুব্ধ ভবতরঙ্গে 'ভেলা ভাসিয়ে' কবি ঝুলনলীলার ভাবানুষঙ্গ থেকে দূরে চলে গেছেন। চলে গেছেন মত্ত ঝটিকায় আন্দোলিত সাগর-কল্লোলে। দ্বিতীয় স্তবকে তাই 'আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে' হট্টগোল উঠেছে।

কিন্তু এই অট্টরোল হট্টগোলের মধ্যেই কবির অসাড় পরান জেগে উঠেছে—

আজি জাগিয়া উঠিয়া পরান আমার
বসিয়া আছে
বুকের কাছে।
থাকিয়া থাকিয়া উঠিছে কাঁপিয়া,
ধরিছে আমার বক্ষ চাপিয়া,
নিঠুর নিবিড় বন্ধনসুখে
হৃদয় নাচে,
ত্রাসে উল্লাসে পরান আমার
ব্যাকুলিয়াছে
বুকের কাছে।

এইখানে আবার বৈষ্ণবীয় ঝুলনলীলার রসরহস্য উন্মীলিত হয়েছে। কবিশেখরের একটি পদে আছে

ঝুলনা ঝমকে রাধিকা চমকে
তা দেখি মাধব ভোর।
হাসিয়া হাসিয়া বাহু পসারিয়া
ধনীরে কবল কোর॥[১৮]

মৃত্যুসাক্ষিক ঝঞ্ঝার তাণ্ডবে প্রাণের জাগরণেরও একই ফলশ্রুতি। উদ্ধৃত তৃতীয় স্তবকে তারই প্রকাশ: 'নিঠুর নিবিড় বন্ধনসুখে হৃদয় নাচে।'

'বেগবান অভিজ্ঞতায ব্যক্তিপুরুষেব এই প্রবল আত্মানুভূতি'র সঙ্গে কবি তাঁব অনারব্ধ যৌবনের 'সুকুমাব আমি'ব প্রেযোবোধসঞ্জাত মাধুর্যলীলার তুলনা কবেছেন কবিতাব চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তবকে। এই স্তবকচতুষ্টযে অর্ধনাবীশ্বব আত্মসত্তায 'পিতম-প্যাবে'ব প্রেমেব মাধুর্যলীলা ললিত সৌকুমার্যে বর্ণিত হযেছে। কিন্তু কবিতাটিব বিষযালম্বন প্রেযোবোধ নয, শ্রেযোবোধ। 'যে শ্রেয মানুষেব আত্মাকে দুঃখেব পথে দ্বন্দ্বেব পথে অভয দিযে এগিযে নিযে চলে সেই শ্রেযকে আশ্রয কবেই প্রিযকে পাবাব আকাঙ্ক্ষা' এই কবিতায বৈষ্ণবীয ঝুলনলীলাব রূপকল্পকে ভেঙে পুনবায নবরূপে গডে তুলেছে। কবিতাব উত্তবাংশে, অষ্টম নবম ও দশম স্তবকে কবি এই 'নূতন খেলা'ব কথাই বলেছেন। তাতে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগবে ভেলা ভাসানোব কল্পনা পবিত্যক্ত হযেছে। কিন্তু ঝুলন-লীলাব অনুষঙ্গ ফিবে এলেও বৈষ্ণবীয মাধুর্যলীলা থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা সে ঝুলনলীলা শুরু হযেছে 'মবণদোলা'য বসে। তাব ফলে 'শ্রেযকে আশ্রয কবেই প্রিযকে পাবাব আকাঙ্ক্ষা' পূর্ণ হযেছে। এই পূর্ণতাব আনন্দেই কবিতাব অন্তিম স্তবকযুগলেব পর্ববিন্যাসেও এসেছে অভিনবত্ব। প্রাণবধূব সঙ্গে পুনর্মিলনেব আনন্দ কবিতাব উপান্ত স্তবকে ভাষা পেযেছে—

দে দোল দোল।
দে দোল দোল।
এ মহাসাগবে তুফান তোল্।
বধূরে আমাব পেযেছি আবার—
ভবেছে কোল।
প্রিযাবে আমাব তুলেছে জাগাযে
প্রলযবোল।
বক্ষশোণিতে উঠেছে আবার
কী হিল্লোল।
ভিতবে বাহিবে জেগেছে আমাব
কী কল্লোল।

এই স্তবকের 'বধূবে আমার পেযেছি আবাব / ভবেছে কোল'—এই উপলব্ধিতেই কবিতাটির 'ঝুলন' নামকরণ সার্থক হয়েছে। অন্তিম স্তবকে তাবই আনন্দোদ্বেল প্রকাশ—

প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ
চিনি লব দোঁহে ছাড়ি ভয় লাজ,
বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে
ভাবে বিভোল।
দে দোল দোল।

'কড়ি ও কোমল' থেকে প্রেয়োবোধ আর শ্রেয়োবোধের মধ্যে যে দ্বন্দ্বসংঘাতে কবিচিত্ত আলোড়িত হয়েছে 'সোনার তরী'র ঝুলন কবিতায় তা এক অপূর্ব আনন্দময় সংগতিতে সার্থক হয়ে উঠেছে। তারই ফলে 'মরণখেলা'ও মাধুর্যরসে উচ্ছলিত হয়েছে, 'মরণখেলা'ই হয়েছে 'ঝুলনখেলা'। 'ভবতরঙ্গে'র রুদ্রলীলার মধ্যেই আস্বাদ্যমান হয়েছে 'প্রেমতরঙ্গে'র মাধুর্যলীলা।

৭

কবিতাটির উপসংহারে আছে দুটি পাগলের কথা—

স্বপ্ন টুটিয়া বাহিরিছে আজ
দুটো পাগল।

কবির 'ছবি ও গানে'ও আমরা 'পাগলে'র সন্ধান পেয়েছিলাম। সে পাগল 'চাঁদের কিরণ পান করে' 'মাতাল' হত। বলাই বাহুল্য, সে কবির 'সুকুমার আমি'র চাঁদে-পাওয়া স্বপ্ন-দেখা পাগল। কিন্তু 'ঝুলনে' যে-দুটো পাগলের কথা বলা হয়েছে, স্বপ্ন ভেঙেই তাদের বহিঃপ্রকাশ। তারা রুদ্রদেবতারই উপাসক। 'ঝুলন' কবিতা রচনার বারো বৎসর পরে, ১৩১১ সালের 'বঙ্গদর্শনে', কবি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার নাম 'পাগল'। 'পাগল' প্রবন্ধটি দিগম্বর ভোলানাথেরই ধ্যানমন্ত্র। নিবিড় মধ্যাহ্নের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে 'মৃত্যুর উলঙ্গ' শুভ্রমূর্তিতে তাঁকে মানসপ্রত্যক্ষ করে কবিশিল্পী তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছেন: 'হায়, শম্ভু, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সংসারের উপরে প্রতিদিনের জড়হস্তক্ষেপে যে-একটা সামান্যতার একটানা আবরণ পড়িয়া যায়, ভালমন্দ দুয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাহাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও সৃষ্টির নব নব মূর্তি প্রকাশ করিয়া তোল। পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত

হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়। সংহারের রক্ত-আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করো। সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটি-যোজনব্যাপী উজ্জ্বল নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে—তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসংগীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক।'[১৯]

ঝুলনের 'ক্ষ্যাপা পাগল' এই মৃত্যুঞ্জয় ভোলানাথেরই শিষ্য। পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে লেখা 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা'তেও কবি বলেছেন

আমি নটরাজের চেলা,
চিত্তাকাশে দেখছি খেলা,
বাঁধন খোলার শিখছি সাধন
মহাকালের বিপুল নাচে।

নটরাজের শেষ-কবিতার নাম 'দোল'। তার অন্তিম স্তবকে নটরাজ কিশোররূপে দেখা দিয়েছেন—

কিশোর, আজি তোমার দ্বারে
পরান মম জাগে।
নবীন করে করিবে তারে
রঙিন তব রাগে।
ভাবনাগুলি বাঁধনখোলা
রচিয়া দিবে তোমার দোলা,
দাঁড়িয়ো আসি হে ভাবে-ভোলা,
আমার আঁখি আগে।

ঝুলন বর্ষার উৎসব, দোল বসন্তের। কিন্তু উভয় উৎসবই প্রেমরাগে রঞ্জিত। 'দোল' কবিতায় কিশোর-রূপী নটরাজের 'দোলা' রচনা করেছে কবির বাঁধনখোলা ভাবনাগুলি। কেননা, তাঁর দ্বারেই কবিপ্রাণের জাগরণ ঘটেছে।

অবশ্য সোনার তরীর 'ঝুলন' আর নটরাজের 'দোলে'র প্রেক্ষাপট স্বতন্ত্র। 'ঝুলনে' আছে কবির অন্তর্লোকের লীলারহস্য—'তুই-আমি'র বৈপরীত্য ও সাযুজ্য, 'দোলে'র প্রেক্ষাপট বিশ্বলোকে সম্প্রসারিত—তার একদিকে আছেন রঙ্গেশ্বর নটরাজ, অন্যদিকে আছে মুক্তিপ্রয়াসী কবিচিত্ত।

আমরা বলেছি, ললিতে-কঠোরে বিপরীত এই 'তুই-আমি'র লীলা রবীন্দ্র-জীবনে নানা পর্যায়ে বিচিত্ররূপে বিলসিত। বিচিত্ররূপে হলেও একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, প্রতিভাবান কবির প্রেয়োবোধের আমিও যেমন একদিক দিয়ে পাগল, তাঁর শ্রেয়োবোধের আমিও তেমনি অন্যদিক দিয়ে পাগল। একটি দুর্লভ লগ্নে কবিমানসের এই দুই পাগল একক্রিয়তায় একত্র মিলিত হয়। 'ঝুলন' কবিতায় এই মিলন সম্ভব হয়েছে। দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ এই মিলনের আনন্দই বৈষ্ণবীয় লীলার রূপকল্পকে আশ্রয় করে ভাবে ভাষায় ও ছন্দে অনবদ্য গীতিকাব্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

## উল্লেখপঞ্জী

১ দ্রষ্টব্য, 'বালগোপালের ব্রজধামে : সন্ধ্যাসংগীত'। 'কবি ও কবিতা', বর্ষ ৪, সংখ্যা ৩, পৃ ৪৫৫ ৪৭২।

২ গঙ্গাতীর, জীবনস্মৃতি। রবীন্দ্ররচনাবলী-১৭, পৃ ৩৯৩।

৩ তদেব, পৃ ৪০২।

৪ তদেব।

৫ ছিন্নপত্রাবলী, [ বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৩৬৮ ], পত্রসংখ্যা ১২৯, পৃ ২৮৬।

৬ রবীন্দ্ররচনাবলী ৪, পৃ ৶০।

৭ আত্মপরিচয়, সংস্করণ বৈশাখ ১৩৫০, পৃ ৭৬-৭৭।

৮ রবীন্দ্রজীবনী-১ ৪র্থ সং, পৃ ৩১৫।

৯ ছিন্নপত্রাবলী পৃ ১৭৬।

১০ তদেব, পৃ ১৮২।

১১. Collected Poems and Plays of Rabindranath Tagore, ( ম্যাকমিলন, ১৯৫২ ), পৃ ১৪৪ ৪৫।

১২. The Compact Edition of the Oxford English Dictionary, Vol. I, p 1095

১৩ রবীন্দ্ররচনাবলী ২৩, পৃ ৪৪২।

১৪, 'আত্মপরিচয, পৃ ৭০।

১৫ দ্রষ্টব্য, সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' [ সাহিত্য সংসদ সং, বৈশাখ ১৩৬৮ ], পৃ ৯৩৫।

১৬ তদেব, পৃ ৮৪৮।

১৭ দ্রষ্টব্য, কবিমানসী ২, পৃ ২৮৯।

১৮. বৈষ্ণব পদাবলী [ সংসদ সং ], পৃ ৩৪৩।

১৯. রবীন্দ্ররচনাবলী ৫, পৃ ৫৪৭।

# দিঘি

১

'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের 'দিঘি' কবিতাটি রবীন্দ্রকাব্য-সমালোচনায় উপেক্ষিত। অজিত চক্রবর্তী তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ শেষ করেছেন 'খেয়া'তে পৌঁছে। কিন্তু তিনি 'দিঘি'র উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। পরবর্তী সমালোচকগণের মধ্যেও অনেকেই কবিতাটি সম্পর্কে নীরব। কেউ একে কবির 'নিসর্গ-প্রেরণা'র কবিতা হিসাবেই গুরুত্ব দিয়েছেন।[১] কেউ আবার এর মধ্যে কবির ভগবৎ-চেতনার সন্ধান করেছেন। বলেছেন, 'বেলাশেষে তাঁহার কোলে ফিরিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, এখন আর সংসারের কাজ ভালো লাগে না।'[২] 'রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা'-কার বলেছেন, 'এ দিঘি সমস্ত ভৌগোলিক সীমা ছাড়াইয়া সমস্ত পার্থিব প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া মনোহংসের বিহার-সরোবরের রূপ লইয়াছে।'[৩] 'মনোহংসের বিহার-সরোবরে'র কল্পনাটি সমালোচকের অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। কিন্তু কবিতাটির গূঢ়ার্থব্যঞ্জনার সন্ধান করতে হলে এর মুখ্য অঙ্গসন্ধিগুলির প্রতি মনোনিবেশ করা একান্ত প্রয়োজন।

কবিতাটির বাচ্যার্থ হল, সারাদিন কর্মব্যস্ততার মধ্যে কাটিয়ে, পরিক্লান্ত চিত্তে সায়ংসন্ধ্যার প্রাক্‌কালে, গোধূলিলগ্নে, দিঘির জলে অবগাহন ও সানন্দ সন্তরণ। কিন্তু বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে অর্থান্তরের অভিব্যঞ্জনাই এই কবিতার প্রাণ। অর্থাৎ দিঘি বিশুদ্ধ ধ্বনিকাব্য। আমরা অন্যত্র বলেছি, 'সিসৃক্ষু কবিমানসের আত্মার অতল গভীরতারই উপমান এই দিঘি।'[৪] আমাদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করার পূর্বে কবিতাটির অঙ্গসন্ধিগুলির সন্ধান ফলপ্রসূ হতে পারে।

কবিতাটি সাতটি স্তবকে বিন্যস্ত। প্রথম স্তবকে আছে দিন ও রাত্রির সন্ধিলগ্নের বর্ণনা। দিনের দাহ জুড়িয়েছে, সব কাজও ফুরিয়েছে, সামনে আসছে 'সকল কর্মহীন' 'স্বপ্নভরা রাত'। 'তারি মাঝে দিঘির জলে যাবার বেলাটুকু' এসে উপস্থিত হয়েছে।—

সেই গোধূলি এল এখন, সূর্য ডুবুডুবু,
ঘরে কি মন রয়?

প্রথম স্তবকের গূঢ়ার্থব্যঞ্জনা নিহিত আছে শেষ বাক্যাংশে—'ঘরে কি মন রয় ?'

দ্বিতীয় স্তবকে আছে দিঘির 'জলরাশি'র বর্ণনা। 'কূলে কূলে পূর্ণ নিটোল গভীর ঘন কালো / শীতল জল-রাশি'। তার মধ্যে 'নিবিড় হয়ে নেমেছে' তীরতরুর সকল ছায়া। জলের কিনারায়, ওই পারে, দিনান্তের শেষ আলো পড়েছে রাঙা হয়ে। তার উপমান বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ির পথে-চলা বধূর রাঙা চোখ—

পথে চলতে বধূ যেমন নয়ন রাঙা ক'রে
বাপের ঘরে চায়।

তৃতীয় স্তবকে আছে দিঘির জলে অবতরণ এবং সন্তরণের আনন্দ। এই স্তবক দুটি পর্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম স্তরে আছে অবগাহনের পরিতৃপ্তি—

শেওলা-পিছল পৈঁঠা বেয়ে নামি জলের তলে
একটি একটি করে,
ডুবে যাবার সুখে আমার ঘটের মতো যেন
অঙ্গ উঠে পুরে।

দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে সন্তরণের উল্লাস—

ভেসে গেলেম আপন মনে ভেসে গেলেম পারে,
ফিরে এলেম ভেসে,
সাঁতার দিয়ে চলে গেলেম, চলে এলেম যেন
সকল-হারা দেশে।

এই 'সকল-হারা দেশে' চলে যাওয়াই এই স্তবকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংকেত। এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে, খেয়া কাব্যগ্রন্থের অন্তিম পর্যায়ের একটি কবিতার নাম 'সব-পেয়েছি'র দেশ।

চতুর্থ স্তবকে আছে দিঘির নিগূঢ় ব্যাঙ্গ্যার্থ।—

'ওগো বোবা, ওগো কালো, স্তব্ধ সুগম্ভীর
গভীর ভয়ংকর,
তুমি নিবিড় নিশীথ রাত্রি বন্দী হয়ে আছ,
মাটির পিঞ্জর।

এই পংক্তিচতুষ্টয়েই নিহিত আছে এই ধ্বনিকাব্যের মর্মবাণী। দিঘির এই

সাংকেতিক স্বরূপবর্ণনার পরে স্তবকের দ্বিতীয়ার্ধে আছে এব সঙ্গে 'প্রাণেব নিকেতন' এই 'ধুলার ধরা'—'কাজের রঙ্গভূমি'র সম্পর্কের কথা। কবি বলছেন, দিঘিব দর্পণেই এই ধুলার ধরা, এই প্রাণের নিকেতন নত হয়ে নিজেকে দেখছে।

চতুর্থ স্তবকেই কবিতাটি চূড়ান্ত শিখব স্পর্শ কবেছে। পঞ্চম স্তবক থেকে শুরু হযেছে দিঘির জলে অবগাহন ও সন্তবণেব ফলশ্রুতি। পঞ্চম স্তবকেব শেষার্ধে কবি বলছেন

ছাযা-নিচোল দিয়ে ঢাকা মবণভবা তব
বুকেব আলিঙ্গন
আমায় নিল কেড়ে নিল সকল বাঁধা হতে
কাড়িল মোব মন।

দিঘিব 'মবণভরা' 'বুকেব আলিঙ্গন' কবিকে, কবিব মনকে সকল বাঁধা হতে কেড়ে নিল। সকল-বন্ধন-মোচনের এই লৌকিক ক্রিয়াপদটি লক্ষ্য করার মতো। এই সঙ্গে অবশ্যই মনে পডবে যে, কবিতাটি বাংলাব লৌকিক ছন্দে, অমূল্যধনেব ভাষায শ্বাসাঘাতপ্রধান, এবং প্রবোধচন্দ্রেব ভাষায দলবৃত্ত ছন্দে বিবচিত।

ষষ্ঠ স্তবকের শেষার্ধে আছে দিঘিব মবণভরা বুকেব আলিঙ্গনেব পরিণাম-সংকেত—

মর্মবিযা মর্মরিযা বাতাস গেল মবে
বেণুবনের তলে,
আকাশ যেন ঘনিযে এল ঘুমঘোবেব মতো
দিঘিব কালো জলে।

সপ্তম স্তবকে বিষযালম্বনেব সমাপ্তি ঘোষিত হযেছে। সন্ধ্যাবেলাব প্রথম তারা আকাশে ফুটে ওঠাব সঙ্গে সঙ্গে গোধূলিব অবসান। 'বন্ধবিহীন অন্ধকারে' বকেব ঝাঁক পাখাব শব্দ মেলে উড়ে গেল। আব

পথে কেবল জোনাক জ্বলে নাইকো কোনো আলো
এলেম যবে ফিরে।
দিন ফুরাল রাত্রি এল, কাটল মাঝের বেলা
দিঘির কালো নীরে।

এই অন্তিম স্তবককে বলা যেতে পারে কবির মনোহংসের বিহার-সরোবর থেকে প্রত্যাবর্তন। রবীন্দ্রকাব্যলোকে কবিকৃতির এই রীতির সমাপ্তিরচনা তাঁর

অন্যান্য বহু কবিতাযও পরিলক্ষিত হবে। 'মানসী'র 'মেঘদূত' এবং 'কল্পনা'ব 'বর্ষশেষ' প্রভৃতি রচনায় এই রীতি সুপরিস্ফুট।

২

'খেয়া'র যুগে ববীন্দ্রকবিমানসেব বিচাব-বিশ্লেষণে 'দিঘি'র বিশেষ গুরুত্ব বয়েছে। দিঘি রচিত হয ১৩১৩ সালের সাতাশে বৈশাখ, অর্থাৎ ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দেব ১০ মে। তখন 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলন এবং তৎপববর্তী স্বদেশী আন্দোলনেব জোযাবে কলকাতা ডুবুডুবু, বাংলা ভেসে যায়। ১৯০৫ সালেব ১৬ অক্টোবর (ত্রিশে আশ্বিন, ১৩১২) বঙ্গচ্ছেদ ঘোষিত হল। এব প্রতিবাদে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ববীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'আগামী ৩০শে আশ্বিন [১৩১২] বাংলাদেশ আইনেব দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বব যে বাঙালিকে বিচ্ছিন্ন কবেন নাই তাহাই বিশেষরূপে স্মবণ ও প্রচাব কবিবার জন্য সেই দিনকে আমবা বাঙালিব রাখি-বন্ধনেব দিন কবিযা পবস্পবের হাতে হবিদ্রাবর্ণেব সূত্র বাঁধিযা দিব। রাখি-বন্ধনের মন্ত্রটি এই, 'ভাই ভাই এক ঠাঁই'।[৫]

ত্রিশে আশ্বিন কলকাতায যে 'রাখিবন্ধন' উৎসব অনুষ্ঠিত হল তাতে ববীন্দ্রনাথ সবার সঙ্গে মিলিত হযে 'বন্দেমাতবম্' সম্প্রদায-পবিচালিত শোভাযাত্রাব পুবোভাগে স্থান গ্রহণ কবলেন। কণ্ঠে তাঁবই বচিত 'বাংলাব মাটি বাংলাব জল' সংগীত। কবির বয়স তখন পঁযতাল্লিশ। শবীবও বিশেষ সুস্থ ছিল না। কিন্তু সেই দিনগুলিতে তরুণ যৌবনেব প্রমত্ত আবেগে তিনি ঝাঁপিযে পড়েছিলেন শৃঙ্খলিত স্বদেশের মুক্তির আন্দোলনে। অগ্নিবাণীতে লেখা তাঁর স্বদেশপ্রেমাত্মক সংগীতগুলি সেই যুগেই তাঁব উদাত্ত নির্ভীক কণ্ঠ হতে স্বতঃউৎসারিত হযেছিল। প্রভাতকুমাব তাঁব রবীন্দ্রজীবনীব দ্বিতীয খণ্ডে [তৃতীয় সংস্কবণ] ১২০ থেকে ১৫৫ পৃষ্ঠায রবীন্দ্রজীবনের সেই অবিস্মবণীয় দিনগুলিব বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ কবেছেন।

সেদিনকাব যে-সকল যুবক কবিব প্রত্যক্ষ প্রেবণায় প্রাণিত ও প্রবুদ্ধ হযেছিলেন তাঁদেবই একজন—রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

It was only the consummate leadership of Tagore which enabled the young men to keep their eyes fixed on their goal and ideal. Tagore used to meet them, almost every evening, in the rooms of the then Metropolitan Institution, and gave expression to the new-born spirit of freedom inspiring the youth of Bengal by the composition of

what are called his national songs, which rank very high in both the poetry and music of Tagore. Every evening would he come to the meeting with songs composed for the occasion and either sing them himself or have them sung for purposes of instruction by one his prominent disciples, the late Ajit Kumar Chakravarti. Very shortly he came out into the open to deliver a series of powerful polemics and threw himself heart and soul into political pamphleteering, just as Milton did under similar circumstances, leaving aside his lyre ৬

মিলটনের সঙ্গে তুলনা ঠিক সংগত হল না, কেন না লেখকেব ভাষাতেই বলা যায়, সেই স্বদেশ-প্রেমোন্মাদনাব দিনগুলিতে কবি যে সব গান বচনা কবেছিলেন কাব্য ও গীতিধর্মে সেগুলি জন্মভূমিব উদ্দেশে ববীন্দ্রনাথেব শ্রেষ্ঠ গীতাঞ্জলি। তাছাডা 'খেযা' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলি ১৩১২ সালেব আষাঢ থেকে ১৩১৩ সালেব জ্যৈষ্ঠ—এই এক বৎসবেব মধ্যে লেখা। খেযাব প্রথম কবিতা 'শেষ খেযা' প্রকাশিত হয ১৩১২ সালেব আষাঢেব বঙ্গদর্শনে। প্রভাতকুমাব লিখেছেন, 'কাব্যলক্ষ্মীব এই সোনাব কাঠিব স্পর্শে কবিজীবনে নূতন সুব ধ্বনিযা উঠিল। দেশেব বিচিত্র আন্দোলনেব চবম উত্তেজনাব মধ্যে কবিচিত্ত ক্ষণে ক্ষণে পবম গভীবেব মধ্যে অবগাহনেব জন্য আকুলিত হইতেছে।'৭

কিন্তু রাজনীতিব স্বভাবকুটিল পথ কবিব পথ নয। তাই দেশপ্রেমেব পবিত্র হোমবহ্নি অন্তবে প্রোজ্জ্বল বেখেই বাজনীতিব হট্টগোল থেকে দূরে সবে দাঁডাবাব জন্য কবিচিত্ত ব্যাকুল হল। দেখা যাচ্ছে, বাখিবন্ধন উৎসবেব দু'মাস যেতে না যেতেই ববীন্দ্রনাথ ১৩১২ সালের ২৬শে অগ্রহাযণ বামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদীকে এক পত্রে লিখছেন, 'উন্মাদনায যোগ দিলে কিয়ৎপবিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয এবং তাহাব পবিণামে অবসাদ ভোগ কবিতেই হয। আমি তাই ঠিক করিযাছি যে, অগ্নিকাণ্ডেব আয়োজনে উন্মত্ত না হইযা যতদিন আযু আছে, আমাব এই প্রদীপটিকে জ্বালিযা পথেব ধারে বসিয়া থাকিব।'৮

বলাই বাহুল্য, ববীন্দ্রনাথেব 'এই প্রদীপটি' কোনোদিনই নেভে নি। তাছাড়া, একথা অবশ্যই স্বীকাব করতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ কর্মকুণ্ঠ স্বপ্নলোকেব কবি কোনোদিনই ছিলেন না। তাঁর কর্মজীবন এবং কবিজীবন একই সঙ্গে পাশাপাশি চলেছে। তবে তাঁর পথ 'একলা চলার পথ'। সবার সঙ্গে চলা তাঁর স্বভাবধর্ম ছিল না বলেই কিছুদূর এগিয়ে তাঁর অন্তরে দেখা দিয়েছে কুণ্ঠা, চিত্তে

জেগেছে অবসাদ। কবির এই আত্মিক দ্বন্দ্ব-সংক্ষোভ ও তা থেকে উত্তরণের ইতিহাসের সাক্ষী 'খেযা'র কবিতাগুলি। এক বৎসর ধরে কবিমানস দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হতে হতে যখন তার 'অসূর্যম্পশ্য' সাধনায নিমগ্ন হতে পেরেছে তখনকার কবিকৃতি হল 'দিঘি'।

৩

রাজশেখরের 'অসূর্যম্পশ্য' অভিধাটি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সুপ্রযোজ্য হল কিনা সে বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু কবিকে যে কাব্যমীমাংসাকার চার শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন,—প্রাযোজনিক, দত্তাবসর, নিষণ্ণ এবং অসূর্যম্পশ্য—তা চিরকালের সত্য। আপৎকালীন প্রযোজনে কবি যখন অশিববিনাশী প্রেরণায লেখনী চালনা করেন তখন তাঁর বাঙ্‌নির্মিতি যতই সার্থক ও সুন্দর হোক্, তাকে প্রাযোজনিক বলা অসঙ্গত হবে না। এই প্রাযোজনিক স্তর থেকে অসূর্যম্পশ্য স্তরে কবিমানসের প্রত্যাবর্তনের আত্মিক ইতিহাসই পরিলক্ষিত হবে খেযার বিভিন্ন পর্যাযের কবিতায়। বিশেষ করে দিঘিতে।

কথাটা আরেকটু স্পষ্ট করা প্রযোজন। জ্যাক মারিতাঁ তাঁর 'Creative Intuition in Art and Poetry' গ্রন্থে নগণ্য কবি ও মহৎ কবির পার্থক্য বিশ্লেষণ করে বলেছেন,

The creative emotion of minor poets is born in a flimsy twilight and at a comparatively superficial level of the soul. Great poets descend into the creative night and touch the deep waters over which it reigns. Poets of genius have their dwelling place in this night and never leave the shores of these deep waters.[৯]

রবীন্দ্রনাথের 'দিঘি' কবিতার ভাববস্তুর সঙ্গে দার্শনিক মারিতাঁর এই মন্তব্যের আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করার মতো। রবীন্দ্রনাথ দিঘিকে বলেছেন 'তুমি নিবিড় নিশীথ রাত্রি', মারিতাঁ তাকেই বলেছেন 'creative night'। রবীন্দ্রনাথের ভাষায 'কূলে কূলে পূর্ণ নিটোল গভীর ঘন কালো / শীতল জলরাশি', মারিতাঁর ভাষায় তা-ই হযেছে 'deep waters over which it reigns',

মারিতাঁর বক্তব্য হল, মহৎ কবিরা যখন কবিতা রচনা করেন তখন তাঁরা 'descend into the creative night'। এই প্রসঙ্গে সেণ্ট জন অব দি ক্রসের 'Dark night of the soul'-এর কথা অবশ্যই মনে পড়বে। তিনি দুটি কৃষ্ণা রাত্রির কথা

বলেছেন, Night of the senses' এবং 'Night of the Soul'। Night-এর অর্থ হল ত্যাগ ও সর্বপ্রকার আসক্তি ও আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্তি।[১০]

সাধক-সন্ন্যাসী সেণ্ট জন [ ১৫৪২-১৫৯১ ] অবশ্য ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়েই দুটি কৃষ্ণা রাত্রির কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ শিল্পের প্রসঙ্গেই ব্যক্তিত্বের দুটি স্তবের উল্লেখ করেছেন। 'সাহিত্য' গ্রন্থে 'সাহিত্যের বিচারক' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'আমাদের অস্তিত্বেব মধ্যে দুইটা অংশের অস্তিত্ব অনুভব কবিতে পাবি। একটা অংশ আমার নিজত্ব। আর একটা অংশ আমার মানবত্ব।...সাহিত্যকাবেব সেই মানবত্বই সৃজনকর্তা।'[১১] 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালায 'আত্মার দৃষ্টি' প্রবন্ধে তিনি 'জীবচৈতন্য' এবং 'বিশ্বচৈতন্য'—এই দুটি শব্দ ব্যবহাব করেছেন। বলেছেন, 'আমি একটা আববণেব মধ্যে আবৃত হযে পৃথিবীতে সঞ্চরণ কবছি। ডিমেব মধ্যে পক্ষিশিশু যেমন পৃথিবীতে জন্মেও জন্মলাভ করে না এও সেই বকম। এই অস্ফুট চেতনাব ডিমেব ভিতব থেকে জন্মলাভই আধ্যাত্মিক জন্ম। সেই জন্মেব দ্বাবাই আমবা দ্বিজ হব। সেই জন্মই জগতে যথার্থরূপে জন্ম—জীবচৈতন্যেব বিশ্বচৈতন্যেব মধ্যে জন্ম।'[১২] 'আত্মাব প্রকাশ' নিবন্ধে অহং এবং আত্মা—এই দুই ভাগে ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ কবা হযেছে। 'আত্মাব প্রকাশরূপ যে অহং তার সঙ্গে আত্মার একটি বৈপবীত্য আছে।.. আত্মা অনন্তেব মধ্যে সঞ্চবণ কবতে চায়, অহং বিষযেব মধ্যে আসক্ত হতে থাকে।'[১৩] 'Personality' গ্রন্থে 'দ্বিতীয জন্মে'ব আলোচনায তিনি এই অহং এবং আত্মাকে বলেছেন 'personality of self' এবং 'personality of soul'—

The whole object of man is to free his personality of self into the personality of soul, to turn his inward forces into the forward movements towards the infinite, from the contraction of self in desire into the expansion of soul in love.[১৪]

কবিব্যক্তিত্বেব এই 'personality of soul'-ই 'বিশ্বচৈতন্য'। তাকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'মানবত্ব'। এই মানবত্বই সত্যকার সৃজনকর্তা। উপনিষদেব 'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং' তত্ত্বেব ব্যাখ্যায তিনি বলেছেন, এই 'অগোচবের সঙ্গে যোগের জন্য আমাদেব বিশেষ অন্তরিন্দ্রিয় আছে বলেই মানুষ এই জগতে জন্মলাভ ক'বে কেবল বাইরের জিনিসে সন্তুষ্ট থাকতে পাবে না।'[১৫] মানুষের সাধনা 'গুহাহিত', এই অর্থে যে তা 'মানুষেব চিত্তকে গভীরতার নিকেতনে' নিয়ে যায়। এই 'গভীরতার নিকেতনে' যাওয়ারই রূপক হল দিঘির জলে অবগাহন। এই

অর্থেই মারিতাঁর মন্তব্যটি পুনঃস্মরণীয়: Great poets descend into the creative night and touch the deep waters over which it reigns.

৪

এবার কবিতাটির অঙ্গসন্ধিগুলির তাৎপর্য সন্ধানের চেষ্টা করা যেতে পারে। প্রথম স্তবকেই দেখা যাচ্ছে কবি বলছেন, 'সেই গোধূলি এল এখন, সূর্য ডুবুডুবু/ ঘরে কি মন রয়?' অর্থাৎ আত্মার অতল গভীরতায় তলিয়ে যাওয়ার লগ্ন হল গোধূলি।

বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রমানসে গোধূলিলগ্ন বিশেষ তাৎপর্যে অভিব্যঞ্জিত। প্রথমে 'ছিন্নপত্রাবলী'র কয়েকখানি চিঠির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে। ছিন্নপত্রাবলীর পত্ররচনার যুগ হল কবিজীবনে পদ্মার যুগ। তিনি ১৪০ সংখ্যক চিঠিতে লিখছেন, 'সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তরঙ্গ পদ্মার উপরকার নিস্তব্ধতা এবং অন্ধকার ঠিক যেন নিতান্ত আমার অন্তঃপুরের ঘরের মতো' ··। 'জীবনের যে গভীরতম অংশ সর্বদা মৌন এবং সর্বদা গোপন - সেই অংশটি যেন আস্তে আস্তে বের হয়ে আসে পদ্মাতীরের অনাবৃত সন্ধ্যায়।' ১৪৫-সংখ্যক চিঠিতে লিখছেন, সন্ধ্যাবেলায় 'আকাশের নক্ষত্রলোক থেকে আর পদ্মার সুদূর ছায়াময় তীররেখা পর্যন্ত সমস্ত বৃহৎ দৃশ্যটি আমার চতুর্দিকে একটি নিভৃত আরামের গোপন গৃহের মতো ছোটো হয়ে ঘিরে দাঁড়ায়—আমার মধ্যে যে দুটি প্রাণী আছে, আমি এবং আমার সেই অন্তঃপুরবাসী আত্মা, এই দুটিতে মিলে সমস্ত ঘরটি দখল করে বসে থাকি।' ২৪৬-সংখ্যক চিঠিতে শিলাইদহ সম্পর্কে লিখছেন, 'এখানে কোথাও কিছু নেই, কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী, এবং তারই মাঝখানে একটি সঙ্গিহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা—মনে হয় যেন একটি সোনার চেলি-পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটু ঘোমটা টেনে একলা চলেছে। · তার বর যদি নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে!'

এই পত্রগুচ্ছে রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যা শব্দটি ব্যবহার করলেও আসলে ওটি হল দিন ও রাত্রির সন্ধিলগ্ন—গোধূলিতে তার শুরু এবং নিশারম্ভে তার সমাপ্তি। যে-লগ্নে আকাশে সোনার-চেলি-পরা বধূ কবিদৃষ্টিতে ধরা দেয় সে-লগ্নই প্রকৃতপক্ষে গোধূলিলগ্ন।

রবীন্দ্রকাব্যলোকে স্বভাবতই এই গোধূলি-সন্ধ্যা বারংবার দেখা দিয়েছে। 'মানসী'র 'গোধূলি' কবিতায় কবি বলেছেন

নিষ্ফল দিবস অবসান—
কোথা আশা, কোথা গীতগান !
শুয়ে আছে সঙ্গিহীন প্রাণ
জীবনের তটবালুকায় ।
দূরে শুধু ধ্বনিছে সতত
অবিশ্রাম মর্মরের মতো,
হৃদয়ের হত আশা যত
অন্ধকারে কাঁদিয়া বেড়ায় ।

'মানসী'তেই 'সন্ধ্যায়' কবিতায় কবির অন্তরঙ্গ অভিলাষ ভাষা পেয়েছে—

খুলে দাও কেশভার ঘনস্নিগ্ধ অন্ধকার
মোরে ঢেকে দিক স্তরে স্তরে ।
রাখো এ কপোলে মম নিদ্রার আবেশ-সম
হিমস্নিগ্ধ করতলখানি ।

'সোনার তরী'র 'শৈশবসন্ধ্যা' কবিতায় কবি নিজেকে মগ্ন করে দিয়েছেন 'অতলের তলে'। কিন্তু কবিমানসে গোধূলি-সন্ধ্যার পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি পরিস্ফুট হয়েছে 'খেয়া'র 'গোধূলিলগ্ন' কবিতায়। সেখানে কবির অন্তরে ছিন্নপত্রাবলীর চেলি-পরা-বধূটিই বাসনাবাসিত মূর্তিতে দেখা দিয়েছে—

আমার গোধূলিলগন এল বুঝি কাছে
গোধূলি-লগন রে ।
বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে আসে
সোনার গগন রে ।

কবিতার দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্তবকে কবির সারাদিনমান কিভাবে অতিবাহিত হয়েছে তারই বর্ণনা দিয়ে অন্তিম স্তবকে কবি বলছেন

আমি জানি যে আমার হয়ে গেছে গনা
গোধূলি-লগন রে ।
ধূসর আলোকে মুদিবে নয়ন
অস্ত-গগন রে—
তখন এ ঘরে কে খুলিবে দ্বার
কে লইবে টানি বাহুটি আমার,

আমায় কে জানে কী মন্ত্রে গানে
কবিবে মগন বে—
সব গান সেবে আসিবে যখন
গোধূলি-লগন বে !

কবিতাটি যেন 'দিঘি'ব পূর্বাভাস। এ মিলন যে কবি এবং তাঁব অন্তঃপুরবাসী আত্মার মিলন, তার সংকেত বযেছে উপান্ত বাক্যে – 'আমায কে জানে কী মন্ত্রে গানে / কবিবে মগন বে।' এখানেই 'ঘবে কি মন বয' বাক্যেব তাৎপর্য নিহিত আছে। এ ঘব হচ্ছে অহং-এব সংসাব, জীব-চৈতন্যের আসক্তিক্ষেত্র। গোধূলিলগ্নে কবি এই নিজত্বেব গণ্ডী পেবিযে মানবত্বেব বিশ্বলোকে উত্তীর্ণ হন। এই মানবত্ব তাঁর সৃজনকর্তা।

৫

দ্বিতীয স্তবকে কবি তাঁব অন্তঃপুববাসী আত্মাব প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা। দিঘিব রূপকে তাব বর্ণনা হল 'কূলে কূলে পূর্ণ নিটোল গভীব ঘন কালো / শীতল জলবাশি।' কিন্তু তখনও জীবচৈতন্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয নি। জলের কিনাবায দিনশেষেব আলোটি তারই প্রতীক। তাব উপমান হল শ্বশুবগৃহযাত্রিণী বধূব পিতৃগৃহেব দিকে 'নযন বাঙা কবে' ফিবে চাওযা। তাব সম্মুখে আছে দয়িতমিলনেব আনন্দ, পেছনে পিতৃগৃহত্যাগেব বেদনা।

তৃতীয স্তবকে, পূর্বেই বলা হয়েছে, দিঘিব জলে ডুবে যাওযার আনন্দ এবং সন্তবণেব উল্লাস ভাষা পেযেছে। এই স্তবকেব প্রথমার্ধে আছে ডুবে যাওয়ার কথা। 'ডুবে যাবাব সুখে আমার ঘটেব মতো যেন / অঙ্গ উঠে পুবে।' ঘটেব মতো পূর্ণ হযে ওঠার বাচ্যোৎপ্রেক্ষাটি ডুবে যাবাব স্বরূপবর্ণনায় অনবদ্য। ডুবে যাওযাব প্রসঙ্গে মনে পডছে কবিব তেইশ বৎসব বয়সে লেখা [ ভারতী, বৈশাখ ১২৯১ ] 'ডুব দেওযা' প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধে কবি বলছেন, 'জগতেব সর্বত্রই অতল সমুদ্র', কিন্তু 'ডুব দিবার ক্ষমতা ও অধিকাব সকলেব নাই।' এই প্রবন্ধে 'দিঘি' নেই, আছে সমুদ্র। এ সমুদ্র 'বিশ্বচরাচরেব মহাসমুদ্র'। ববীন্দ্রনাথ বলছেন, 'সীমা এবং তুলনীয়তা কেবল উপবে, একবাব যদি ইহা ভেদ কবিয়া ভিতবে প্রবেশ করিতে পার ত দেখিবে সেখানে সমস্তই একাকার, সমস্তই অনন্ত। এতবড প্রাণ কাহাব আছে সেখানে প্রবেশ কবিতে পারে, বিশ্বচরাচরেব মহাসমুদ্রে অসীম ডুব ডুবিতে পাবে ?'[১৬] এখানে তরুণ রবীন্দ্রনাথ প্রশ্নাকারে যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, দার্শনিক মারিতাঁ নগণ্য কবি এবং মহৎ কবির পার্থক্য দেখিয়ে তাকেই সুপরিস্ফুট করে

তুলেছেন। রামপ্রসাদ ভক্তিতত্ত্বের প্রেরণায় বলেছেন 'ডুব দে মন কালী বলে, / হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে'। রবীন্দ্রনাথ ভক্ত নন, কবি। কিন্তু কবিত্বও সাধনা। তাই হৃদয়ের অতল অগাধ জলে তাঁকেও ডুব দিতে হয়।

তৃতীয় স্তবকের শেষার্ধে আছে সন্তরণের উল্লাসে 'সকল-হারা দেশে' চলে যাবার কথা। এটি পূর্ণতারই ব্যঞ্জনাগর্ভ উক্তি। Personality গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'absolute infinite is emptiness'। 'বলাকা'র 'চঞ্চলতা' কবিতায়ও আছে

'যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।'

অন্যদিক দিয়ে দেখলে এই 'সকল-হারা দেশ'ই 'সব-পেয়েছির দেশ'। তাই শেষোক্ত কবিতার অন্তিম স্তবকে কবি বলছেন

ধুয়ে ফেল্ রে পথের ধুলো,
নামিয়ে দে রে বোঝা,
বেঁধে নে তোর সেতারখানা
রেখে দে তোর খোঁজা।
পা ছড়িয়ে ব'স্ রে হেথায়
সারাদিনের শেষে,
তারায়-ভরা আকাশতলে
সব-পেয়েছির দেশে।

৬

কবির উপলব্ধি তুঙ্গশিখরে আরোহণ করেছে কবিতার চতুর্থ স্তবকে। তার প্রথমার্ধে কবি বলছেন

ওগো বোবা, ওগো কালো, স্তব্ধ সুগম্ভীর
গভীর ভয়ংকর,
তুমি নিবিড় নিশীথ রাত্রি বন্দী হয়ে আছ,
মাটির পিঞ্জর।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বৎসর তিনেক পরে লেখা 'রাজা' নাটকের কথা মনে পড়বে। রাজা 'আঁধার ঘরের রাজা'। তাই তার ইংরেজি অনুবাদের নাম 'King of the Dark Chamber।'

এই 'আঁধার ঘরের রাজা'র কল্পনা খেয়াতেই আছে। 'আগমন' কবিতায় কবি বলেছেন 'গভীর রাতে এসেছে আজ আঁধার ঘরের রাজা।' 'রাজা' নাটকে রানী সুদর্শনার সঙ্গে রাজার মিলন ঘটে অন্ধকারে। দাসী সুরঙ্গমা বলছে, 'এ-ঘর মাটির আবরণ ভেদ করে পৃথিবীর বুকের মাঝখানে তৈরি। তোমার জন্যেই রাজা বিশেষ করে করেছেন।' তার কথা শুনে রাণী জানতে চাইলেন, 'তাঁর ঘরের অভাব কী ছিল যে, এই অন্ধকার ঘরটা বিশেষ ক'রে করেছেন?' উত্তরে সুরঙ্গমা বলছে, 'আলোর ঘরে সকলেরই আনাগোনা—এই অন্ধকারে কেবল একলা তোমার সঙ্গে মিলন।'

রাজা নাটকের 'এ-ঘর মাটির আবরণ ভেদ করে পৃথিবীর বুকের মাঝখানে তৈরি'—এই উক্তি দিঘি কবিতার 'তুমি নিবিড় নিশীথ রাত্রি বন্দী হয়ে আছ, / মাটির পিঞ্জর'—এই কবিবাক্যেরই গদ্যভাষ্য।

কবি দিঘিকে বলেছেন 'বোবা' 'কালো', 'স্তব্ধ সুগম্ভীর', 'গভীর ভয়ংকর'। ছিন্নপত্রাবলীর ১৪০-সংখ্যক চিঠিতে কবি 'জীবনের যে গভীরতম অংশ সর্বদা মৌন এবং সর্বদা গোপন' তার কথা বলেছেন। এই 'মৌন' অর্থেই দিঘি বোবা। 'শান্তিনিকেতনে'র 'গুহাহিত' প্রবন্ধে 'স্তব্ধ সুগম্ভীর' এবং 'গভীর ভয়ংকরে'র অর্থ বিশ্লেষিত হয়েছে। কবি বলছেন, 'হে গুহাহিত, আমার মধ্যে যে গোপন পুরুষ, যে নিভৃতবাসী তপস্বীটি রয়েছে, তুমি তারই চিরন্তন বন্ধু, প্রগাঢ় গভীরতার মধ্যেই তোমরা দুজনে পাশাপাশি গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে রয়েছ—সেই ছায়াগম্ভীর নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যেই তোমরা 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া'। তোমাদের এই পরম সখ্যকে মানুষ দিনে দিনে যতই উপলব্ধি করছে ততই তার কাব্য সংগীত ললিতকলা অনির্বচনীয় রসের আভাসে রহস্যময় হয়ে উঠছে।'

এই উদ্ধৃতির শেষ বাক্যে রয়েছে কবিতার চতুর্থ স্তবকের দ্বিতীয়ার্ধের অর্থ-সংকেত। কবিতায় দিঘি হয়ে উঠেছে 'প্রাণের নিকেতনে'র দর্পণ। সেই প্রাণের নিকেতনে আছে ধুলার ধরার কাজের রঙ্গভূমি। কবিমানসের আত্মার অতল-গভীরতার নিস্তরঙ্গ দিঘিজলের দর্পণেই তার স্বরূপ ফুটে ওঠে।

আত্মনিমগ্নতায—দিঘির রূপকে অতল জলের গভীরে ডুবে যাওয়াতেই—কবির মুক্তি। পঞ্চম স্তবকের 'মরণভরা বুকের আলিঙ্গন' ধ্বন্যালোকে হবে আত্মার মধ্যে অহং-এর, বিশ্বচৈতন্যের মধ্যে জীবচৈতন্যের বিলোপসাধন। এই প্রসঙ্গে 'সোনার তরী'র 'হৃদয়-যমুনা'র ভাবানুষঙ্গ মনে পড়বে। মুক্তপ্রেমের পরিবেশরচনার প্রয়োজনে 'যমুনা'র কল্পনা অপরিহার্য হলেও আসলে কবিতাটির নামকরণ হৃদয়-

যমুনা না হয়ে হৃদয়-সরসীও হতে পারতো। তার অন্তিম স্তবকে কবি বলছেন

যদি মরণ লভিতে চাও এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিল-মাঝে।
স্নিগ্ধ শান্ত সুগম্ভীর নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে।
নাহি রাত্রি দিনমান— আদি অন্ত পরিমাণ,
সে অতলে গীতগান কিছু না বাজে।

এই কবিতায় দিঘির অনেক রূপকল্পই আভাসিত হয়েছে। তফাৎ এই যে, হৃদয়-যমুনা বিশুদ্ধ প্রেমের কবিতা বলেই সেখানে আছে 'আমি' আর 'তুমি'র লীলা। দিঘি কবিতায় আছে দুই-'আমি'র কথা। অর্থাৎ দিঘিতে মানবত্বের কাছে নিজত্বের নিঃশেষ আত্মনিবেদন, তারই ফলে ঘটেছে পরিপূর্ণ বন্ধনমোচন।

চতুর্থ স্তবকে দিঘি হয়েছিল পার্থিব জীবনের—প্রাণের নিকেতনের—দর্পণ। উপান্ত স্তবকে দিঘির কালো জলে আকাশ ঘনিয়ে এসেছে 'ঘুমঘোরের মতো'। 'মানসী'র যুগে সন্ধ্যার হিমস্নিগ্ধ করতলখানি কবির কপোল স্পর্শ করেছিল 'নিদ্রার আবেশ-সম'। 'ঘুমঘোর' আর 'নিদ্রার আবেশ' অভিন্নার্থব্যঞ্জক। কিন্তু দিঘির বুকে ঘুমঘোরের মতো ঘনায়মান আকাশের কল্পনায় কবির বিশ্বচৈতন্যে আকাশ-পৃথিবীর সম্মিলন সম্পূর্ণ হয়েছে।

কবিতার অন্তিম স্তবকে আছে অবগাহনের অবসান-ঘোষণা। গানের পরিভাষায় এ যেন সমে এসে থামা। 'দিন ফুরাল রাত্রি এল, কাটল মাঝের বেলা / দিঘির কালো নীরে।'

আলোচনার উপসংহারে আবার জ্যাক মারিতাঁর কথা স্মরণ করতে হবে। তিনি বলেছেন, Poets of genius···never leave the shores of these deep waters. উক্তিটিকে প্রসঙ্গচ্যুত করে দেখলে ভুল করা হবে। মারিতাঁ 'সৃষ্টির আবেগ' [ creative emotion ] প্রসঙ্গেই মন্তব্যটি করেছেন। কিন্তু প্রতিভাবান কবিও অনুক্ষণ সৃষ্টির আবেগে 'বিভোর' হয়ে থাকেন না। তাঁকেও ঘরসংসার করতে হয়, জীবনের দায়-দায়িত্ব পালন করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ শুধু শিল্পী, শুধু কবি ছিলেন না। 'ছিন্নপত্রাবলী'র একখানি [ ১০৭-সংখ্যক ] চিঠিতে তিনি লিখছেন, 'আমার ক্ষুধানল বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্বত্রই আপনার জ্বলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়।' আমরা বলেছি, রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি ও কর্মী। বঙ্কিমচন্দ্রের

ভাষায় বলতে গেলে, বৃত্তিনিচয়ের প্রস্ফুরণ ও সামঞ্জস্য বিধানের ফলে তাঁর ব্যক্তিত্ব পূর্ণ-মনুষ্যত্বের প্রতীক। এই বিশ্বমনা সর্বব্যাপী ব্যক্তিত্ব যখন তার অন্তরঙ্গতম কবিসত্তার সৃজনাবেগে আবিষ্ট হয় তখন সে আত্মার অতল গভীরতায় ডুব দেয়। এই অবগাহনের অভিজ্ঞতাই দিঘির রূপকল্পে অনবদ্য কাব্যরূপ লাভ করেছে।

## উল্লেখপঞ্জী


১ 'চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র বাণী', ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, পৃ ১৩৯ ৪০।

২ 'রবি রশ্মি', পশ্চিমভাগে : দ্বিতীয় খণ্ড, পরিবর্ধিত ষষ্ঠ সং, পৃ ১০৩।

৩ 'রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা', ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৭৬, পৃ ২৩৩।

৪ দ্রষ্টব্য, কবিমানসী ২, পৃ ১৪১।

৫ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রজীবনী ২, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, তৃতীয় সং, পৃ ১৩৯।

৬. Tagore as a Political Thinker, 'Golden Book of Tagore', pp 170-171.

৭ রবীন্দ্রজীবনী ২, পৃ ১৩৪।

৮ তদেব, পৃ ১৪৫।

৯ দ্রষ্টব্য, কবিমানসী-২, পৃ ১৪১।

১০ এই তথ্য জানিয়েছেন আমাদের প্রিয়বন্ধু অধ্যাপক ফাদার পি ফালোঁ, এস জে, এম এ।

১১ রবীন্দ্র রচনাবলী ( বিশ্বভারতী ) ৮, পৃ ৩৫২।

১২ রবীন্দ্ররচনাবলী ( পশ্চিমবঙ্গ সরকার )-১২, পৃ ০৩।

১৩ তদেব, পৃ ২৪১।

১৪ Personality ( Macmillan ), পৃ ৯৭-৯৮।

১৫ রবীন্দ্ররচনাবলী ( প ব. সরকার ) ১২, পৃ ৩৩৫।

১৬. রবীন্দ্ররচনাবলী ( বিশ্বভারতী ), অচলিত সংগ্রহ ২, পৃ ১০।

## শুভক্ষণ

১

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিরোধে যে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছিল, বাঙালী জীবনে তাকে পরম শুভক্ষণ বলা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ১৩১২ সালে রচিত 'বিজয়া-সম্মিলন' প্রবন্ধে 'শুভক্ষণ' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যের সঙ্গেই ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, 'বঙ্গব্যবচ্ছেদ একটা উপলক্ষ্যস্বরূপ হইয়া সমস্ত বাঙালির হৃদয়ে এক-আঘাত সঞ্চার করিতেই অমনি আমাদের যেন একটা তন্দ্রা ছুটিয়া গেল অমনি আমরা মুহূর্তের মধ্যেই চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইলাম বহু কোটি বাঙালির সম্মিলিত হৃদয়ের মাঝখানে আমাদের মাতৃভূমির মূর্তি বিরাজ করিতেছে।...আমাদের গার্হস্থ্য, আমাদের ক্রিয়াকর্ম, আমাদের সমাজধর্ম একটি নূতন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে—সেই বর্ণ আমাদের সমস্ত দেশের নব-আশাপ্রদীপ্ত হৃদয়ের বর্ণ। ধন্য হইল এই ১৩১২ সাল,—বাংলা দেশের এমন শুভক্ষণে আমরা যে আজ জীবন ধারণ করিয়া আছি আমরা ধন্য হইলাম।'[১]

সেই শুভক্ষণের স্বদেশপ্রেরণা রবীন্দ্রমানসকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল সেকথা সর্বজনবিদিত। সেদিন রবীন্দ্রনাথ কবিতায় গানে প্রবন্ধে বক্তৃতায়, এবং জাতীয় আন্দোলনকে সুসংহত রূপ দেবার জন্য 'স্বদেশী সমাজ' সংগঠনের সুস্পষ্ট পরিকল্পনায়, জনসমাজের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৩১২ সালের আশ্বিনে প্রকাশিত 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন, 'কি আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তির প্রকৃতিতে, কি জাতির প্রকৃতিতে, কোনো একটি মহা-আহ্বানে আপনাকে নিঃশেষে বাহিরে নিবেদন করিবার জন্য প্রতীক্ষা অন্তরের অন্তরে বাস করিতেছে—সেখানে আমাদের দৃষ্টি পড়ে বা না পড়ে, তাহার নির্বাণহীন প্রদীপ জ্বলিতেছেই। যখন কোনো বৃহৎ আকর্ষণে আমরা আপনাদের আরামের, আপনাদের স্বার্থের গহ্বর ছাড়িয়া আপনাকে যেন আপনার বাহিরে প্রবলভাবে সমর্পণ করিতে পারি, তখন আমাদের ভয় থাকে না, দ্বিধা থাকে না, তখনই আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত অদ্ভুত শক্তিকে উপলব্ধি করিতে পারি—নিজেকে আর দীনহীন দুর্বল বলিয়া মনে হয় না। এইরূপে নিজের অন্তরের শক্তিকে এবং সেই শক্তির যোগে বৃহৎ বাহিরের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করাই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের এবং জাতিগত সত্তার একমাত্র চরিতার্থতা।'[২]

'কোনো একটি মহা-আহ্বানে আপনাকে নিঃশেষে বাহিরে নিবেদন করিবার জন্য প্রতীক্ষা', 'কোনো বৃহৎ আকর্ষণে' 'আপনাকে যেন আপনার বাহিরে প্রবলভাবে সমর্পণ' করার ব্যাকুলতাই 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের 'শুভক্ষণ' [এবং 'ত্যাগ' ] কবিতায় রূপকাশ্রিত কাব্যরূপ লাভ করেছে। 'শুভক্ষণ' এবং 'ত্যাগ' রচিত হয় বোলপুরে, ১৩১২ সালের ১৩ শ্রাবণ। এই যুগল-কবিতা কোথাও পৃথক্‌ভাবেই প্রকাশিত হয়েছে, কোথাও কেবল 'শুভক্ষণ' নামে দুটি পৃথক্ স্তবকে গ্রথিত হয়েছে। 'শুভক্ষণে' আছে প্রতীক্ষার কথা, 'রাজার দুলাল যাবে আজি মোর / ঘরের সমুখ পথে'। বালিকা তার মাকে বলছে, 'আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে / রহিব বলো কী মতে ?' সুতরাং গৃহকাজ ছেড়ে সে রাজার দুলালের দর্শনাভিলাষে নিজেকে সুসজ্জিত করেছে। 'ত্যাগ' কবিতায় রাজার দুলাল বালিকার ঘরের সমুখপথে তার স্বর্ণশিখর রথে চলে গিয়েছে। বালিকা তার বুকের মণিহার ছিঁড়ে তার উদ্দেশে সমর্পণ করেছে। কিন্তু রাজার দুলাল তার শ্রেষ্ঠধনকে গ্রহণ করে নি। তার 'নিঃশেষ নিবেদন' নিষ্ফল হতে দেখে সে ব্যথিত চিত্তে মাকে বলছে :

মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয়নি কুড়ায়ে
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে,
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে
পড়ে আছে শুধু আঁকা।
আমি কি দিলেম কারে জানে না সে কেউ
ধুলায় রহিল ঢাকা।

সুতরাং এই কবিতা-যুগল একই রূপকাশ্রিত হলেও অন্তর্গূঢ় উপলব্ধিতে দ্বিধা-বিভক্ত।

২

কবিমানসের এই অন্তর্গূঢ় বেদনার রহস্য উন্মোচনের পূর্বে ১৩১২ সালের সেই 'মহা-আহ্বান', 'সেই বৃহৎ আকর্ষণ'কে কবি যে-রূপকের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা আবশ্যক। নগরপরিক্রমারত রাজার দুলাল বা হৃদয়বল্লভের যে-রূপক 'শুভক্ষণে' অবলম্বিত হয়েছে, বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে তার সাক্ষাৎ বারবার পাওয়া যায়। কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে সংকলিত হল :

অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতে'র তৃতীয় সর্গের ১৩-২৩ শ্লোকে রয়েছে সিদ্ধার্থের নগরপ্রবেশের বর্ণনা। অশ্বঘোষ বলছেন,

"তারপর মহিলারা ভৃত্যদের মুখে কুমারের আগমনবার্তা শুনে মান্যদের অনুমতি নিয়ে তাঁকে দেখবার জন্য প্রাসাদে আরোহণ করলেন। নারীকুল কৌতূহলাক্রান্ত হওয়ায় তাঁদের মধ্যে কারো শিথিল কটিসূত্রের দ্বারা চলায় ব্যাঘাত জন্মাল। সবেমাত্র নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় কারো চোখ আকুল হয়েছিল, কারো অলংকার হয়েছিল বিপর্যস্ত। এদের মধ্যে কোনো কোনো কৌতূহলাক্রান্তা নারীর ত্বরিতগমনের বাসনা সত্ত্বেও বিশাল নিতম্ব এবং পীন পয়োধরভার দ্রুত-গতির প্রতিবন্ধক হয়েছিল। কেউ কেউ আবার দ্রুতগমনে সমর্থ, হয়েও মন্দগতি অবলম্বন করেছিলেন। গোপনে যে সব অলংকার ব্যবহার্য, লজ্জাবশত সেগুলিকে গোপন করার জন্যেই মন্দগমনের ছিল প্রযোজন। [ হ্রিয়া প্রগল্‌ভানি নিগূহমানা রহঃপ্রযুক্তানি বিভূষণানি। ] ··গবাক্ষপথে বিনির্গত পরস্পর কুণ্ডলসংলগ্ন নারীদের মুখগুলি বাতায়ন-সংলগ্ন পদ্মের মতো শোভা পাচ্ছিল। শরীরশোভায এবং সম্পৎ-শোভায সমুজ্জ্বল সেই রাজপুত্রকে দেখে নারীবৃন্দ শুদ্ধ-চিত্তেই বলেছিলেন, এঁর ভার্যা ধন্যা। কিন্তু তাঁদের চিত্তে অন্য কোনো ভাবের উদয় হয়নি।" এই বর্ণনায় অশ্বঘোষ সমাজনীতি ও শ্রেয়োবোধকেই বড় করে দেখেছেন। রাজপুত্রকে দেখবাব কৌতূহল নারীদের রয়েছে, কিন্তু দেখার পর কোনো বাসনা তাঁদের জাগ্রত হয়নি। "এঁর ভার্যা ধন্যা"—একথা উচ্চারণ করেছেন বটে, কিন্তু সেখানে ঈর্ষার কোনো স্থান নেই। তাঁরা বলেছেন "শুদ্ধৈর্মনোভিঃ খলু নান্যভাবাৎ।"

বৌদ্ধ পালি-সাহিত্যে রাজকুমার সিদ্ধার্থের নগরপরিক্রমার একটি অবিস্মরণীয় চিত্র পাওয়া যাবে 'নিদানকথা'য় "মহাভিনিষ্ক্রমণে"। সেখানে আছে, বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠরথে আরোহণ করে মহৎ যশ এবং অতিমনোরম শ্রীসৌভাগ্যের সঙ্গে নগরে প্রবেশ করলেন। সে সময় কৃশা-গৌতমী নাম্নী এক ক্ষত্রিয়কন্যা প্রাসাদের উপর-তলায় গিয়ে নগর-প্রদক্ষিণরত কুমার বোধিসত্ত্বের রূপশ্রী প্রত্যক্ষ করে প্রীতি ও সৌমনস্যযুক্ত হয়ে এই 'উদান' উচ্চারণ করলেন :

যাঁর এমন পুত্র সেই পিতার কি আনন্দ!
যাঁর এমন পুত্র সেই মাতার কি আনন্দ!!
যাঁর এমন স্বামী সেই নারীর কী আনন্দ!!!

বোধিসত্ত্ব কিন্তু কথাগুলোকে গ্রহণ করলেন অন্য অর্থে। কৃশা-গৌতমী আনন্দ অর্থে 'নিব্বুতো' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। এই নির্বৃতির কথা শুনে বিষয়ে-বিরক্ত-চিত্ত বোধিসত্ত্বের মনে নির্বাণের চিন্তা উদিত হল। তিনি ভাবলেন

তাঁকে আজই নির্বাণলাভের জন্যে গৃহবাস পরিত্যাগ করে যেতে হবে। "অজ্জ এব ময়া ঘরবাসং ছড্ডেত্বা নিক্খম্ম পব্বজিত্বা নিব্বাণং গবেসিতুং বট্টতি।" বোধিসত্ত্বের মনে হল কৃশা-গৌতমী তাঁকে 'সুশ্রবণ' শোনালেন। সুতরাং আচার্যদক্ষিণা এই নারীর প্রাপ্য। এই বিচার করে তিনি কণ্ঠ থেকে মহার্ঘ মুক্তাহার উন্মোচন করে কৃশা-গৌতমীর উদ্দেশে প্রেরণ করলেন। কৃশা-গৌতমী সেই দুর্লভ রত্নহার পেয়ে ভাবলেন, সিদ্ধার্থকুমার আমার প্রতি প্রতিবদ্ধচিত্ত হয়ে এই উপহার প্রেরণ করেছেন।

বলাই বাহুল্য, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে এই অংশটি অতুলনীয়। এই কৃশা-গৌতমীকে আমরা বৌদ্ধসাহিত্যে পুনরায় পেয়েছি মৃতবৎসা জননীরূপে। থেরীগাথায় সে কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ।

সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের 'রঘুবংশে'র সপ্তম সর্গে ৫-১১ শ্লোকে আছে স্বয়ম্বর-সভাশেষে অজ ও ইন্দুমতীর নগরপ্রবেশের বর্ণনা। এই প্রসঙ্গে কালিদাস কিন্তু অশ্বঘোষের উত্তরসূরি। অধ্যাপক কীথ এবিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, অজের নগরপ্রবেশের বর্ণনা বুদ্ধচরিতের সিদ্ধার্থকুমারের নগর-প্রবেশের বর্ণনার অনুকরণমাত্র। 'অনুকরণমাত্র' বলা অবশ্য বিদগ্ধজনসম্মত হয় নি, 'অনুরূপ' বললেই সমীচীন হত।

কালিদাস তাঁর 'কুমারসম্ভব' কাব্যের সপ্তম সর্গে বিবাহার্থী মহাদেবের হিমালয়-প্রদেশে প্রবেশের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্যেও অভিনবত্ব বিশেষ কিছু নেই। তবে বর্ণনার শেষাংশটিতে আছে মনস্তাত্ত্বিক সৌন্দর্য। মহাদেবকে দেখে নারীরা বলেছেন, "অপর্ণা কোমলাঙ্গী হয়েও যে এঁর জন্যে দুশ্চর তপস্যা করেছেন তা উপযুক্তই হয়েছে। যে নারী এঁর দাসীত্ব লাভ করতে পারে তার জীবনই ধন্য হয়ে যায়, আর যে সৌভাগ্যবতী এঁর অঙ্কশয্যা লাভ করেন তাঁর আর কথা কী?"

স্থানে তপো দুশ্চরমেতদর্থমপর্ণয়া পেলবয়াপি তপ্তম্
যা দাস্যমপ্যস্য লভেত নারী সা স্যাৎ কৃতার্থা কিমুতাঙ্কশয্যাম্ ॥৩

রাজপুত্রের নগরপরিক্রমার বর্ণনায় 'কাদম্বরী'-প্রণেতা বাণভট্ট তাঁর সমস্ত পূর্বসূরির মহিমাকে অতিক্রম করে গেছেন। সে বর্ণনা সবদিক দিয়েই অনবদ্য। 'কাদম্বরী'র চন্দ্রাপীড়ের নগরপরিক্রমার বর্ণনাকে আমরা সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদ বলে মনে করি। প্রবোধেন্দু ঠাকুরের স্বচ্ছন্দসুন্দর অনুবাদ থেকে আমরা নিয়ে সেই কাব্যসৌন্দর্য পাঠকগণকে উপহার দিলাম:

রাজধানীতে রাজকুমার এলেন—মূর্তিমান অনঙ্গ। খুলে গেল নগরীর লক্ষ-লক্ষ বাতায়ন-আঁখি। গৃহে গৃহে অন্তঃপুরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, "কুমার এসেছে, কুমার এসেছে।" প্রসাধন রইল পড়ে, আলতা পরতে পরতে ভিজে পা নিয়েই কেউ ছুটে চলে গেল দেখতে। তুড়তুড় করে মেয়েরা দৌড়ে উঠতে লাগল প্রাসাদের শিখরে শিখরে। সে কি ত্বরা, কি আকুলি-বিকুলি!

পূর্ণিমার চাঁদের মতো কারোর করতলে তখনো রয়েছে স্বর্ণমুকুর, পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে স্রস্ত মেখলা, কারোর পরনে রামধনু-আঁকা শাড়ী—ছুটে চলে গেল —যেন বর্ষালক্ষ্মী, কারো পায়ে নূপুর বেজে উঠল কন্‌কন্, চক্রবাকমিথুনের মতো পযোধরযুগলে জলরেখার মত কারো গলে পড়ল মুক্তার লতা—যেন সন্ধ্যাশ্রী; মণিপাত্র থেকে কারো পান করা হল না মদিরা—অধর-পল্লব থেকে তখনো ক্ষরে ক্ষরে পড়ছে মধুরস—ছুটে উঠে পড়ল হর্ম্যশিখরে।

মরকত-বাতায়নের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল হাজার হাজার লাবণ্যে-ভরা মুখ—আকাশহ্রদে দুলল ও কি হাজার হাজার পদ্ম!

* * *

নিশ্চল হল রমণীদের চোখের তারা চন্দ্রাপীড়কে দেখে। স্ফটিকের মত তাদের স্বচ্ছ হৃদয়ে প্রবেশ করল চন্দ্রাপীড়ের মূর্তি। তাদের ভাল লাগল চন্দ্রাপীড়কে, ভালবাসতে ইচ্ছে হল, বুকে তুলে নিতে, আদর করতে, সোহাগ করতে। মদনের এ কি দুরন্ত পরিহাস! তাদের কথাবার্তায় সকল রস পেল ঠাঁই।—ঈর্ষা, সম্ভ্রম, বিতর্ক, অসূয়া, বিলাস, কামনা, স্পৃহা।

কেউ বলে, "অত দৌড়ে যাস্‌নি, আমাকেও নিয়ে চল্।" কেউ বলে, "দেখতে দেখতে পাগল হবি নাকি, ওড়নাখানা ভাল করে পর্।" কেউ বলে, "মদনান্ধে, পূজার ফুলে দিলি পা।" কেউ বলে "একেবারে মন হারালি, মেখলা যে খুলে যায়।"

* * *

কিশোরী কিশোরীকে বলে, "এত ছল করে করে লুকিয়ে দেখছিস কেন—ভাল করেই চেয়ে দেখ। নিজেকে সামলে নে রে—ভাল করে না যাচিয়ে অনুরাগ করিস্ নি: কি লজ্জা, তোর এতটুকু তর সইল না—গুরুজনদের সামনে অমন করে দৌড়ে এলি?" একটি কিশোরী বলছে, "মুগ্ধে, রোমাঞ্চগুলো লুকিয়ে ফেল, কেউ না দেখে।" উত্তর এল, "নিজের চেহারা দেখতে পাও না? গাল যে রাঙা হয়ে উঠল।"

*　　*　　*

যুবতীরা তখন ভাবছে, "অমন হাত যে ধরবে ভাগ্য বলি সে মেয়ের।" বর্ষীয়সীদের মুখে ঐ এক কথা—"দেবী বিলাসবতী ধন্যা। গর্ভে ধরেছিল বটে ছেলে!"

কুমারকে নিয়ে এই রকম চলতে লাগল কথাবার্তা। নয়নগুলি তাকে পান করতে লাগল, ভূষণরব তাকে ডাক দিতে লাগল, তার পাছু পাছু চলল হৃদয়, তাকে বেঁধে ফেলতে চায় আভরণের রশ্মিরজ্জু, ডালি পাঠায় তাকে নবযৌবন।

মুঠো মুঠো ঝরতে লাগল লাজ আর কুসুম। চন্দ্রাপীড় রাজপুরীর দ্বারে এসে ইন্দ্রায়ুধ থেকে নামল।[৪]

বিদেশী সাহিত্যেও যে অনুরূপ চিত্র নেই তা নয়। পলগ্রেভের 'গোল্ডেন ট্রেজারি' নামক ইংরেজি কাব্যসংকলনের চতুর্থ ভাগে ২২৭-২২৮ পৃষ্ঠায় স্কট ও ক্যাম্বেলের দুটি কবিতা আছে। দুটি কবিতারই নাম 'The Maid of Neidpath'. স্কটের চার স্তবকের কবিতাটির প্রথম ও চতুর্থ স্তবক এখানে উদ্ধার করছি :

O Lovers' eyes are sharp to see,
　　And lovers' ears in hearing ;
And love, in life's extremity,
　　Can lend an hour of cheering.
Disease had been in Mary's bower
　　And slow decay from mourning,
Though now she sits on Neidpath's tower
　　To watch her Love's returning.

*　　*　　*

He came—he pass'd—an heedless gaze
　　As o'er some stranger glancing ;
Her welcome, spoke in faltering phrase,
　　Lost in his courser's prancing—
The castle-arch, whose hollow tone
　　Returns each whisper spoken,

Could scarcely catch the feeble moan
Which told her heart was broken.

এই কবিতাটির বিশেষ উল্লেখ করা হল এই জন্য যে, যে-বৎসর রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়, সেই বৎসর এই সংকলন-গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যাবে, স্কটের কবিতার প্রথম ও চতুর্থ স্তবকের অভিব্যঞ্জিত প্রতীক্ষা ও হতাশার সঙ্গে 'শুভক্ষণে'র প্রতীক্ষা-প্রত্যাশা এবং 'ত্যাগের' বেদনা-হতাশার আশ্চর্য মিল রয়েছে।

মধ্যযুগের ভারতীয় লোকসাহিত্যেও রাজপুত্রের নগরপরিক্রমার চিত্রটি নানা রূপ পরিগ্রহ করেছে। কোনো ক্ষেত্রে রাজপুত্রের রূপান্তর হয়েছে বরণীয় নায়কের মধ্যে। আমাদের বৈষ্ণবসাহিত্যেও শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে অনুরূপ সাহিত্য যে রচিত হয়েছিল লোচনদাসের রচনায় তার পরিচয় পাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে ভোজপুরী-মৈথিলী ঢঙের একটি হিন্দী গানের কথা মনে পড়ছে। এই গানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ গানটি শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদারের সংগ্রহভুক্ত রবীন্দ্রনাথের একটি বাঁধানো খাতায় আবিষ্কৃত হয়েছে। গানটি নিম্নে উদ্ধৃত হল :

রাজা দুলারকা বনারা আইল মা রাতচো
লেয়া সুধবীনি মেবোয়ি অঙ্গন বা
ধনরী তেরো ভাগ যো এশো বর
পায়া, নিরখী রহী কহুঁ কোন
সাজন বা। মেয়োরি আঙ্গন বা॥

এর বঙ্গানুবাদ হবে অনেকটা এই রকম · "রাজকুমারীর [ রাজদুলালীর ] বর এলো, মা, রাতে। আমার খবর নিতে আমার আঙিনায়।" "ধন্য তোমার ভাগ্য যে এমন বর পেয়েছ। চেয়ে চেয়ে দেখি কার স্বজন এল আমাব আঙিনায়।" এই গানটি 'মজুমদার-পুঁথি'তে আবিষ্কার করার জন্য আমরা কানাই সামন্ত মহাশয়ের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁর 'রবীন্দ্রপ্রতিভা' গ্রন্থে তিনি এই গানটি এবং তার বিশুদ্ধ পাঠান্তর সংকলন করেছেন।[৫] পাঠান্তরে অর্থ মোটামুটি ভাবে এই দাঁড়ায় : "রাজদুলালীর বর এল, মা, সুরভিত বাসে আমার আঙিনায়।" "ধন্য তোমার ভাগ্য যে এমন বর পেয়েছ।" "চল চেয়ে দেখি কার স্বজন এল আমার আঙিনায়।" বলাই বাহুল্য 'শুভক্ষণ' এবং 'ত্যাগ' কবিতাযুগল রচনার সময়

রবীন্দ্রনাথের এই গানটির কথাও মনে ছিল। মাতাপুত্রীর মধ্যে কথোপকথনের ভঙ্গিটি এই সূত্রেই প্রাপ্ত।

বাংলা সাহিত্যেও অনুরূপ বর্ণনা যে নেই তা নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে প্রফুল্ল যখন 'নতুন বৌ' হয়ে ব্রজেশ্বরের সংসারে ফিরে এল তখন গ্রামময় বাষ্ট্র হয়ে গেল যে, "ব্রজেশ্বর আবার একটা বিয়ে করে এনেছে, বড় না কি ধেড়ে বৌ। সুতরাং ছেলে বুড়ো কানা খোঁড়া যে যেখানে ছিল, সব বৌ দেখিতে ছুটিল।" সেই 'ধেড়ে বৌ' দেখার বিস্তারিত বর্ণনার শেষে বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন, "ছুটিতে যুবতীদের কাপড় খসিয়া পড়ে, আঁটিয়া পরিবার অবকাশ নাই। চুল খুলিয়া পড়ে, জড়াইবার অবকাশ নাই। সামলাইতে কোথাকার কোথায় টানেন, তারও বড় ঠিক নাই। হুলস্থূল পড়িয়া গেল। লজ্জায় লজ্জাদেবী পলায়ন করিলেন।"[৬]

৩

'ধন্য হইল ১৩১২ সাল, বাংলা দেশের এমন শুভক্ষণে আমরা যে আজ জীবন-ধারণ করিয়া আছি আমরা ধন্য হইলাম।' 'বিজয়া-সম্মিলন'-ভাষণে কবির এই উপলব্ধিরই কাব্যরূপ 'খেয়া'র 'শুভক্ষণ'। রাজার দুলালকে দেখতে পেয়ে তাঁর জন্য জীবনের শ্রেষ্ঠধন সমর্পণ করার নিমিত্ত প্রস্তুত হতে পেরে পুর-বালিকা যেভাবে নিজেকে ধন্য মনে করেছে তা-ই হয়েছে কবির উপলব্ধির উপমান। সেদিন স্বদেশের মহা-আহ্বানে আপনাকে নিঃশেষে নিবেদন করার জন্য প্রতীক্ষা, সেই বৃহৎ আকর্ষণে আপনাকে সমর্পণ করার ব্যাকুলতার এমন সার্থক উপমান আর কিছু হতে পারে না। জীবনের পরম ধনের আবির্ভাব-লগ্নের রূপক হিসাবে পুরনারীদের জীবনে রাজার দুলালের আবির্ভাব সাহিত্যে সিদ্ধরসে পর্যবসিত হয়েছে। তাই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সমর্পিতচিত্ত কবির মনোভাবের সার্থক রূপকল্প হয়েছে রাজার দুলালের প্রতীক্ষারত পুরবালিকা।

পরবর্তীকালে 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে স্বদেশী যুগের আবির্ভাবের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের এই প্রচলিত উপমানকেই ব্যবহার করে বলছেন, "পাড়ায় বর আসছে, তার বাঁশি বাজছে, তার আলো দেখা দিয়েছে, অমনি মেয়েরা যেমন ছাতে বারান্দায় জানালায় বেরিয়ে পড়ে, তাদের আবরণের দিকে আর মন থাকে না, তেমনি সেদিন সমস্ত দেশের বর আসবার বাঁশি যেমনি শোনা গেল মেয়েরা কি আর ঘরের কাজ নিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারে? হুলু দিতে দিতে শাঁক

বাজাতে বাজাতে, তারা যেখানে দরজা জানলা দেয়ালের ফাঁক পেলে সেইখানেই মুখ বাড়িয়ে দিলে।”৭

এই সম্পর্কে একটি কথা বলা প্রয়োজন। সেই আবির্ভাবের স্বপ্ন যখন সমগ্র সত্তাকে রাঙিয়ে তোলে তখন তার চিত্তরঞ্জক মূর্তি রাজার দুলালের রূপ পরিগ্রহ করে, আর যখন তার জন্য সর্বস্ব ত্যাগের আহ্বান আসে তখন দেখা দেন ‘দুঃখরাতের রাজা’। ‘খেয়া’র ‘শুভক্ষণ’-এর পরেই স্থান পেয়েছে ‘আগমন’। দুটি কবিতার মাঝখানে পনেরো দিনের ব্যবধান। ২৮শে শ্রাবণ রচিত ‘আগমন’ কবিতায় কবি বলছেন :

ওরে দুয়ার খুলে দে রে
বাজা শঙ্খ বাজা!
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
ছিন্নশয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল
দুঃখরাতের রাজা।

অর্থাৎ, শুভক্ষণের ‘সুন্দর’ আগমনে হয়েছেন ‘দণ্ডধর’। কিন্তু কাব্যোৎকর্ষের বিচারে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ তা কাব্যরসিককে ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন হয় না।

আসলে ধ্বনিকাব্য হিসাবে ‘শুভক্ষণ’ অনবদ্য। বাচ্যার্থে আছে কুমারী-হৃদয়ের সুকুমার অনুরাগ, ব্যঙ্গ্যার্থে ফুটে উঠেছে স্বদেশের প্রতি কবির পরম অনুরক্তি। এই প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যে অনুরূপ আরেকটি রচনার কথা মনে পড়ছে। ‘কমলাকান্তে’র ‘একটি গীত’। গীতটি রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীর অন্তর্গত বিশুদ্ধ প্রেমসংগীত—

এসো এসো, বঁধু এসো, আধ আঁচরে বসো,
নয়ন ভরিয়ে তোমা দেখি।
অনেক দিবসে, মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি।

* * *

বঁধু তোমায় যখন পড়ে মনে,
আমি চাই বৃন্দাবন পানে,
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালায় যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই,
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।

এই গানটি বঙ্কিমচন্দ্র এক শারদীয় মহাষ্টমীর রাত্রিশেষে রাণীহাটী পরগণার মনোহর দাসের কণ্ঠে শুনেছিলেন। গানটির বিশ্লেষণ করে কমলাকান্ত-রূপী বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন, 'প্রথমে আহ্বান, 'এসো এসো, বঁধু এসো', পরে আদর, 'আধ আঁচরে বসো', পরে ভোগ 'নয়ন ভরিয়া তোমা দেখি'। তখন সুখভোগকালীন পূর্ব-স্মৃতি—'অনেক দিবসে, মনের মানসে, তোমা ধনে মিলাইল বিধি।'

এই সংগীতটি বঙ্কিমমানসে স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপন হিসাবে কাজ করেছে। তিনি বলছেন, "সুখের কথায় বাঙ্গালির অধিকার নাই,—কিন্তু দুঃখের কথায় আছে।...আমার এই বঙ্গদেশে সুখের স্মৃতি আছে—নিদর্শন কই?...সুখ গিয়াছে—সুখ-চিহ্নও গিয়াছে, বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে, চাহিব কোন্ দিকে?...চাহিবার এক শ্মশানভূমি আছে,—নবদ্বীপ।...বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি সেই শ্মশানভূমি প্রতি চাই। যখন দেখি, সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌতবাহিনী গঙ্গা তর তর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাঁহার পা ধুয়াইতে, সেই মাতা কোথায়? যদি গঙ্গার অতল জলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী কোথায় গেলেন?"

বলাই বাহুল্য, এই রচনাও ধ্বনিকাব্যের অন্তর্ভুক্ত। রচনাটিকে কাব্য বলছি এইজন্য যে তা গদ্য হলেও কবির কলমে লেখা। কিন্তু এই রচনার ধ্বনি বাচ্য থেকে বাচ্যান্তরের অভিব্যঞ্জনাতেই সমাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ, তা বস্তুধ্বনি, ব্যঞ্জনার ক্রমটিও সংলক্ষ্য। সুতরাং এটি উৎকৃষ্ট ধ্বনিকাব্যের নিদর্শন নয়। 'শুভক্ষণে' উপমেয় কবিমানস, উপমান পুরবালিকা। উপমানের দ্বারা উপমেয় সম্পূর্ণ গ্রস্ত হয়েছে, তাই কবিতার সিদ্ধি ঘটেছে অতিশয়োক্তি অলংকারে। আর, বলাই বাহুল্য, উপমার চরম পরিণতি অতিশয়োক্তিতে। 'অলংকার-চন্দ্রিকা'-কারের অনুসরণে বলা যায়, শুভক্ষণ 'রূপকাতিশয়োক্তি'র অনবদ্য নিদর্শন। ধ্বনিকাব্য হিসাবে তার ব্যঞ্জনা অসংলক্ষ্যক্রম। রূপকাতিশয়োক্তি তাতেই পরম চারুতা প্রাপ্ত হয়েছে।

৪

পূর্বেই বলা হয়েছে, 'শুভক্ষণ' কবিতাটি দুটি ভাগে বিভক্ত। কখনো দুটি অংশকে পৃথগ্‌ভূত করে দুটি কবিতার আকারে প্রকাশ করা হয়েছে : 'শুভক্ষণ' ও 'ত্যাগ'। কখনো দুটি কবিতার পৃথক্ সত্তা একীভূত করে 'শুভক্ষণ' নামেই ১ ও ২—এই দুটি পৃথক ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে।[৮]

অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বলেছেন, '১৩১২ সালে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ উপলক্ষে দেশব্যাপী যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল, রবীন্দ্রনাথ সেই আন্দোলনের একজন উদ্যোগী ছিলেন।'[৯] অজিতকুমার আরো বলেছেন, 'খেয়া'র কবিতার এই সময়েই আরম্ভ। এই ফলাফলবিবেচনাহীন ত্যাগই, 'রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখ-পথে' কবিতাটিতে সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।'[১০]

অজিতকুমার চক্রবর্তীর এই 'ফলাফলবিবেচনাহীন ত্যাগ'ই পরবর্তী রবীন্দ্র-সমালোচনায় নির্বিচারে অনুসৃত হয়েছে। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রবিরশ্মি' গ্রন্থে বলেছেন, 'আমার এই ফলাফলবিবেচনাহীন ত্যাগের জন্য সাংসারিক বুদ্ধিমান সাবধানী বিবেচক লোকে আশ্চর্য হইবে তা হউক, কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়াই আমাকে আমার কর্তব্য পালন করিয়া যাইতে হইবে।'[১১] 'রবীন্দ্রজীবনী'-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'যে কর্মকে যথার্থভাবে দেখিতে পায়, সে ফলের আকাঙ্ক্ষা করে না, সে জানে মহৎ আহ্বানের সম্মুখে 'বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া' কী মতে সে রহিবে।'[১২] 'রবীন্দ্রকাব্যপরিক্রমা'য় উপেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'শুভক্ষণ' ও 'ত্যাগ' কবিতায় কবি বলিতে চাহেন যে, সুকঠিন ত্যাগের দ্বারা আমাদের সর্বপ্রকার গর্ব চূর্ণ করিতে হইবে। রাজার দুলাল রাজপুত্রকে ভালোবাসে এক সামান্য নারী। নারী জানে, প্রেমের প্রতিদান সে পাইবে না—তবুও সে শুধু ভালোবাসিয়াই তৃপ্ত। রাজপুত্রের ভালোবাসা পাইবার গর্ব তাহার নাই। প্রিয়তমের উপেক্ষায় তাহার হৃদয় দমিবে না, সে কেবল তাহার ভালোবাসা নিবেদন করিয়াই জীবন পূর্ণ মনে করিবে। সমস্ত ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত প্রেমেই সে তাহার জীবনের সার্থকতা পাইবে।'[১৩]

এই নির্বিচার পুচ্ছানুগ্রাহিতা রবীন্দ্রকাব্যসমালোচনাকে কুহেলিকাচ্ছন্ন করেছে। আবার এই কবিতাযুগলের মধ্যে কেউ কেউ 'রসাবেশে'র ক্ষুদ্র নিমেষ-গুলির সন্ধান পেয়েছেন।'[১৪] অন্য দিকে 'রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা'-কার 'খেয়ার রূপকতত্ত্ব ও রূপক-লীলা'র মধ্যে ভক্ত-ভগবানের প্রেমলীলার রূপবৈচিত্র্য খুঁজে-

পেয়েছেন। 'শুভক্ষণ', 'ত্যাগ' প্রভৃতি কবিতাকে রূপকতত্ত্ব পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করে তিনি বলেছেন, "ভগবান যে রাজাধিরাজ, ভক্ত যে অতি দীন ও উভয়ের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান, তাহা ভগবানের ভক্তবৎসলতার দ্বারা অবলুপ্ত হয়। ভগবানের প্রতি নিবেদিত সর্বাপেক্ষা বেশি মূল্যবান উপহারও কখনও কখনও আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়; কখনও তাহার তুচ্ছতম সেবাও তাঁহার প্রসাদলাভে ধন্য হয়। ভগবানের প্রেমলাভের জন্য ভক্ত প্রেমার্থিনী দীনা নারীর ন্যায় প্রতীক্ষা করে ও নানা অসম্ভব আশা-কল্পনা, নানা আশা-নৈরাশ্যের ক্ষুব্ধ দ্বন্দ্ব, প্রকৃতি-জগৎ হইতে সংক্রামিত নানা সূক্ষ্ম অনুভূতি-প্রবাহ এই বৈচিত্র্য ঘটায় ও উহার মধ্যে রসের সঞ্চার করে। এই সমস্ত মানস-লীলার মধ্যেও কিন্তু তত্ত্ববন্ধন দৃঢ় থাকে বলিয়াই উহাদের স্বরূপ নির্ধারণে আমাদের কোন অনিশ্চয়তা থাকে না।"[১৫]

কাব্যসমালোচনায় এই বিভিন্নমুখী বিচিত্র ব্যাখ্যা অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে বলেছেন, 'পাঠকেরা যখন কাব্যের বিচার করে তখন কাব্যের প্রকৃতির চেয়ে তাদের নিজের মনঃপ্রকৃতির পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে—সেটা অনিবার্য।'[১৬]

৫

আমরা 'শুভক্ষণ' ও 'ত্যাগ' সম্পর্কে বলেছি, এই কবিতাযুগল একই রূপকাশ্রিত হলেও অন্তর্গূঢ় উপলব্ধিতে দ্বিধাবিভক্ত। এবার কবিমানসের সেই অন্তর্গূঢ় বেদনার রসরহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করা যেতে পাবে।

ঐতিহাসিক বিচার-বিশ্লেষণে দেখা যাবে, 'খেয়া'র রূপকাশ্রিত কবিতাগুলিতে কবির ভগবৎচেতনা নয়, স্বদেশচেতনাই মুখ্য। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেই খেয়ার কবিতাগুলি বিরচিত। উদাহরণ হিসাবে এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম ও শেষ কবিতা—'শেষ খেয়া' ও 'খেয়া'র উল্লেখ করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক, খেয়ার কবিতাগুলি ১৩১২ সালের আষাঢ় থেকে ১৩১৩ সালের জ্যৈষ্ঠ—এই এক বৎসরের মধ্যে লেখা। কালক্রমানুসারে গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'শেষ খেয়া'ই প্রথমে স্থান পেয়েছে। কিন্তু শেষের কবিতা 'খেয়া' শেষভাগের রচনা নয়। 'শেষ খেয়া' লেখা হয়েছে ১৩১২ সালের আষাঢ়ে ('বঙ্গদর্শনে'র আষাঢ় মাসে তা প্রকাশিত হয়।) আর 'খেয়া' রচিত হয়েছে তার মাসেক কালের মধ্যে—১৫ শ্রাবণ ১৩১২ তারিখে।

'শেষ খেয়া'য় কবিমানসে 'কাজ-ভাঙানো গান' বেজে উঠেছে :

দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ঐ ছায়া
ভুলাল রে ভুলাল মোর প্রাণ।
ওপারেতে সোনার কূলে আঁধারমূলে কোন্ মায়া
গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো গান।

দ্বিতীয় স্তবকে কবি সন্ধান করেছেন সেই খেয়া-তরীর, যা ছিল 'তাঁর ঘাটে', 'তাঁর দেশে' :

সাঁজের বেলা ভাঁটার স্রোতে ওপার হতে একটানা
একটি-দুটি যায় যে তরী ভেসে।
কেমন করে চিনব ওরে ওদের মাঝে কোন্‌খানা
আমার ঘাটে ছিল আমার দেশে।

তৃতীয় স্তবকে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন মানসিক অবস্থা ব্যক্ত হয়েছে। অন্তর্গূঢ় বেদনায় কবি বলছেন :

ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘরপানে
পারে যারা যাবার গেছে পারে,
ঘরেও নহে পারেও নহে যে-জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে।
ফুলের বার নাইক আর ফসল যার ফলল না,
চোখের জল ফেলতে হাসি পায়,
দিনের আলো যার ফুরাল সাঁজের আলো জ্বলল না
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।

এখানে দেখা যাচ্ছে, পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করে কবি বলছেন, ফুলের বাহারও তাঁর নেই, জীবনে কোনো ফসলও তাঁর ফলল না। কী বেদনা, কী নৈরাশ্য থেকে এই দুরন্ত অভিমানের উদ্ভব হয়েছে তার সন্ধান অত্যাবশ্যক। পত্নী ও কন্যাবিয়োগে কবির পারিবারিক জীবনে যে বিপর্যয় ঘটেছিল তার আভাস অবশ্য আছে 'দিনের আলো যার ফুরাল সাঁজের আলো জ্বলল না'—এই পংক্তিতে। কিন্তু পারিবারিক বিপর্যয়ও এই দুর্জ্ঞেয় অভিমানের পক্ষে গৌণ। 'ফুলের বার নাইক আর ফসল যার ফলল না'—এই পংক্তিতে যে নিষ্ফলতার আভাস আছে তা রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন সম্পর্কেও প্রযোজ্য নয়। কারণ ১৩১১ সালে 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের জন্য কবি যে 'আত্মজীবনী' লিখেছিলেন তাতে নিজের

'স্বপনমুরতি গোপনচারী' যে কবিসত্তার কথা তিনি বলেছেন তার মধ্যে নিষ্ফলতার লেশমাত্র চিহ্ন কোথাও নেই। বরং সেই লেখা পড়ে দ্বিজেন্দ্রলাল 'দম্ভ ও অহমিকার' সন্ধানই পেয়েছিলেন। বঙ্গদর্শনে ১৩০৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রবীন্দ্রনাথ 'কবিচরিত' নামে যে কবিতা লিখেছিলেন তাব প্রথম ও শেষ স্তবক দিয়েই 'বঙ্গভাষায় লেখক' গ্রন্থের আত্মচরিতের উপসংহার রচিত হয়েছে। শেষ স্তবকে আছে :

মানুষ আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে.
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাঁহারে কাঁপায় স্তুতি নিন্দার জ্বরে···

এই 'স্তুতিনিন্দার জ্বরে' কাতব কবির মানবসত্তার অভিমানই 'শেষ খেয়া'র অন্তিম স্তবকে ভাষা পেয়েছে। 'ত্যাগে'র অন্তর্গূঢ় বেদনার হেতুও সেখানেই খুঁজতে হবে। তার আগে 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতাটির সঙ্গে প্রথম কবিতার যে ভাবসাদৃশ্য রয়েছে সে কথা বলে নেওয়া একান্ত আবশ্যক। 'শেষ খেয়া'র কবি 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' যাবার জন্য যে তবী এবং তার নেয়ের সন্ধান করেছিলেন, 'খেয়া'র পারাপারের নৌকার নেয়ের চোখে তিনি তারই সন্ধান করেছেন। তাঁর বিশ্বাস ওই নেয়েই তাঁকে 'তাঁব ঘাটে', 'তাঁর দেশে' পৌঁছে দেবে। সেই দেশের পরিচয় আছে 'সব পেয়েছির দেশ' কবিতায়।

৬

'শুভক্ষণে'র উৎসাহ ও উদ্দীপনা কেন 'ত্যাগে'র নিষ্ফলতাজনিত বেদনায পর্যবসিত হল তার সন্ধান পাওয়া যাবে কবির তৎকালীন কর্মজীবনের মধ্যে। 'ত্যাগে'ব বালিকা রাজার দুলালের বথের সম্মুখে তার বুকের হার-ছেঁড়া মণি ছুঁড়ে দিয়েছিল। 'হার-ছেঁড়া মণি' তাব শ্রেষ্ঠ ধনেরই প্রতীক। কিন্তু রাজার দুলাল বথের চাকায় সে মণিকে গুঁড়িয়ে চলে গেছে। তাই সে বলছে, "আমি কি দিলেম কারে জানে না সে কেউ / ধুলায় রহিল ঢাকা।"

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথেব সর্বশ্রেষ্ঠ দান কী—এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই মনে পড়বে তাঁর স্বদেশ-সংগীতের কথা। কিন্তু সেই অবিস্মরণীয় গীতগুলি ১৩১২ সালের ভাদ্র-আশ্বিন মাসেই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়। প্রভাতকুমার গীতবিতানের যে কালানুক্রমিক সূচী [ প্রথম খণ্ড ] রচনা করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে স্বদেশের উদ্দেশে কবিব এই সংগীতাগুলির প্রথম গান 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে' 'বান' শিবোনামে প্রকাশিত হয়েছিল ভাণ্ডারের ১৩১২ সালের

ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায়। তবে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি রচিত হয় বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কলিকাতার টাউন হলে ৭ই আগস্ট ১৯০৫ সালে যে সভা হয় সেই উপলক্ষে। এ থেকে এ কথা অনুমান করা যেতে পারে যে কবির স্বদেশ-সংগীতগুলি ১৩১২ সালের শ্রাবণ ভাদ্র-আশ্বিনে লেখা। গানগুলি যে অল্প সময়ের মধ্যে অতি দ্রুত লেখা হয়েছিল তার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় 'গোল্ডেন বুক অব টেগোরে' রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে।[১৭]

আমরা যে অন্তর্গূঢ় বেদনার কথা বলছি, তার আভাস পাওয়া যাবে কয়েকটি গানে। ভাণ্ডারের ভাদ্র-আশ্বিনে প্রকাশিত 'একা' গানটির দিকে লক্ষ্য করা যেতে পারে :

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে।

* * *

যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়—
তবে পরান খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে।

* * *

যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি ঝড়-বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে, কবি কী ডাক দিয়েছিলেন যে ডাকে সাড়া পান নি বলে তিনি একলা চলার সংকল্পই গ্রহণ করেছিলেন? এই গানের সঙ্গে 'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে, / তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না'—'প্রয়াস' শীর্ষক এই গানটির কথাও মনে উদিত হবে।

৭

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে অবিস্মরণীয় স্বদেশসংগীতমালা রচনা করেছিলেন তাকে আমরা গীতিকবির সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলে উল্লেখ করেছি। কিন্তু স্বদেশচিন্তায় প্রবুদ্ধ হয়ে বাঙালীর সেই অপূর্ব জাগরণের দিনে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল

মননশীল প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন তার মধ্যমণি হল 'স্বদেশী সমাজ'। এই প্রবন্ধটি প্রথমে পঠিত হয় ১৩১১ সালের ৭ই শ্রাবণ। চৈতন্য লাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে মিনার্ভা থিয়েটার গৃহে আয়োজিত মহতী সভায় কবি 'স্বদেশী সমাজ' পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য ছিল, 'আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়।' এই সভায় সভাপতি ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। তিনি বলেন, 'এরূপ প্রবন্ধ তিনি কখনও শুনিয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্মরণ নাই'। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, 'গত ৪০।৫০ বৎসর যাবৎ লোকের মনে যে-সকল কথা আভাসে উদয় হইয়াছে রবীন্দ্রবাবু তাহাই অপূর্ব ভাষায় পরিচ্ছদ পরাইয়া বাহিরে আনিয়াছেন।' ৭ই শ্রাবণ মিনার্ভা থিয়েটারে আয়োজিত সভায় প্রবেশ করতে না পেরে অনেকেই হতাশ হয়ে ফিরে যান। তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধে ১৬ই শ্রাবণ কর্জন-থিয়েটার গৃহে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার প্রবন্ধটি পাঠ করতে বাধ্য হন। এবার টিকিট বিতরণ করে শ্রোতাদের জন্য স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। ১২০০ টিকিট ৪ ঘণ্টার মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায়। নেতৃস্থানীয়ের মধ্যেও যাঁরা প্রথমবার প্রবন্ধটি শুনেছিলেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে দ্বিতীয়বার প্রবন্ধটি শোনার জন্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেদিন শ্রোতৃবৃন্দ জাতীয়তার যে আবেগ অনুভব করেছিলেন তা সভাগৃহকে মৌন স্বদেশভক্তির উচ্ছ্বাসে অপূর্বভাবে সজীব করে তুলেছিল।

রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজে'র যে মহৎ পরিকল্পনা করেছিলেন তার 'সংবিধান'ও রচনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে পল্লীসমাজেরও 'সংবিধান' তিনি রচনা করে দেন। পল্লীসমাজ গঠনের 'উদ্দেশ্যে'র প্রথমেই ছিল 'বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য ও সম্প্রীতি সংবর্ধন এবং দেশের ও সমাজের অহিতকর বিষয়গুলি নির্ধারণ করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা।'

স্বদেশগীতাঞ্জলি রচনার এক বৎসর পূর্বে রচিত এই 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটির যেমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা হয়েছিল তেমনি কোনো কোনো মহলে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়ারও উদ্ভব হয়। 'রবীন্দ্রজীবনী'-কার লিখেছেন, 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় 'বলাইচাঁদ গোস্বামী হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজে'র কার্যপদ্ধতির কি কি অন্তরায় হইতে পারে, সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঐ সাপ্তাহিকেই 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট নামে এক উত্তর প্রকাশ করেন। তাহা বঙ্গদর্শন ১৩১১ আশ্বিন সংখ্যায় পুনঃপ্রকাশিত হয়।

'বঙ্গবাসীর উক্ত লেখক আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের

লোক, তিনি ভাষার ছটায় মুগ্ধ করিয়া তলে তলে হিন্দুসমাজকে একাকার করিয়া দিবেন।'…

'অন্য পক্ষ হইতেই রবীন্দ্রনাথের মতের তীব্র সমালোচনা হইল; রাজনীতি ছাড়িয়া গ্রাম সংস্কারের প্রস্তাব সে যুগের নেতাদের নিকট উপহাসের ব্যাপার। পৃথ্বীশচন্দ্র রায় সে সময়ের একজন নামকরা রাজনীতিক ও অর্থনীতিক—তিনি বলিলেন, 'রবিবাবু যে সমস্ত রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদের দেশের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর ও নানা দোষে দুষ্ট মনে করি।"১৮

এই তীব্র সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ যে অন্তরে অন্তরে বিশেষ-ভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য। প্রথম দিন 'স্বদেশী সমাজ' পাঠের পর রমেশচন্দ্র দত্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বাংলার মনীষিগণ তাঁদের বক্তব্য বলার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুনশ্চ ভাষণে বলেন, 'যে লোকের ব্যবসা বাঁশী বাজানো, সহসা সর্পাঘাতের উপক্রম হইলে সে বাঁশিকে লাঠির মতো ব্যবহার করিয়া থাকে। আমার যাহা কিছু শক্তি আছে তাহা উদ্যত করিয়া আজ দেশের এই দুর্দিনে আসন্ন অমঙ্গলকে ঠেকাইতে চেষ্টা করিতেছি।'

আনন্দবৃন্দাবনের বংশীবাদক একদিন লোকহিতের জন্যই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে পাঞ্চজন্য শঙ্খ হাতে তুলে নিয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দিনে রবীন্দ্রনাথও প্রবন্ধে ও গানে বংশীধ্বনি নয়, পাঞ্চজন্য-নিনাদই করেছেন। কিন্তু তিনি ভোলেন নি, তিনি কবি, বাঁশী বাজানোই তাঁর কাজ। সূর্য-চন্দ্রের সমকক্ষ মর্যাদার লোভ তাঁর ছিল না। তাই গানে নিজের উপমান খুঁজে পেয়েছেন 'জোনাকি'র মধ্যে। বলেছেন,

ও জোনাকী, কী সুখে ওই ডানা দুটি মেলেছ।
আঁধার সাঁঝে বনের মাঝে উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ॥
তুমি নও তো সূর্য নও তো চন্দ্র
তোমার তাই বলে কি কম আনন্দ।
তুমি আপন জীবন পূর্ণ করে আপন আলো জ্বেলেছ।

'শুভক্ষণে'র রূপকাতিশয়োক্তিতে রাজার দুলালের প্রতীক্ষারত সামান্য বালিকাই কবির আত্মমানসের উপমান। কিন্তু যতই সামান্য হোক, সে তার শ্রেষ্ঠ ধনই রাজার দুলালকে উৎসর্গ করেছে। সে বলছে, 'ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার পথের ধুলার পরে।' কিন্তু তার হার-ছেঁড়া মণি রাজার দুলাল কুড়িয়ে নেয়

নি, তাকে সে রথের চাকায় গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। তাই তার বেদনাঘন কাতরোক্তি —'আমি কি দিলেম কারে জানে না সে কেউ / ধুলায় রহিল ঢাকা।'

কবির এই উপলব্ধিকেই আমরা বলেছি তাঁর 'অন্তর্গূঢ় বেদনা'। তাকে কেবল 'ফলাফলবিবেচনাহীন ত্যাগ' বললে কবিমানসের সেই সূক্ষ্ম বেদনাবোধের রসরহস্যই অনাবিষ্কৃত থাকবে।

কিন্তু এই নিগূঢ় বেদনা বুকে নিয়েই রবীন্দ্রনাথ সেদিন সর্বশক্তি দিয়ে স্বদেশের প্রতি কর্তব্য পালন করে গেছেন। ডাক শুনে কেউ যদি না আসে তবে একলাই চলতে হবে। আপন জনে ছেড়ে যাবে, আশালতা ছিঁড়ে পড়বে, 'তা বলে ভাবনা করা চলবে না'। তাই কবি গেয়েছেন,

আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে?
উঠে দাঁড়া, উঠে দাঁড়া, ভেঙে পড়িস না রে॥

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বঙ্গভঙ্গের জন্য কার্জনী চক্রান্ত শুরু হওয়ার সূত্রপাত থেকেই রবীন্দ্রনাথ কম্বুকণ্ঠে তার প্রতিবাদ করেছেন। কার্জন আমাদের শিক্ষা ও ঐক্যকে ধ্বংস করে বাঙালীকে দুর্বল করার চক্রান্ত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীন ভাষায় বলেছেন, 'শিক্ষা এবং ঐক্য এই দুটাই জাতিমাত্রেরই আত্মোন্নতি ও আত্মরক্ষার চরম সম্বল।' কার্জনী চক্রান্ত যখন বাঙালার 'চরম সম্বল'কে নস্যাৎ করার জন্য তৎপর হল তখন রবীন্দ্রনাথ অশিববিনাশী প্রেরণায় জাতিকে প্রবন্ধে প্রবন্ধে প্রবুদ্ধ করে তোলার জন্য সচেষ্ট হন।

স্বক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত থেকেই যদি রবীন্দ্রনাথ সেই আপৎকালীন দুর্যোগে তাঁর কবিকৃত্য পালন করতেন তাহলে কবিমানসে আক্ষেপের কোনো কারণ থাকতো না। কিন্তু কবির আসন থেকে উঠে এসে সেদিন তিনি সর্বভাবে সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের শরিক হয়েছিলেন। স্বদেশের 'কবি' হয়েছিলেন স্বদেশের 'সৈনিক'। রবীন্দ্রনাথের এই কবিমানস ও কর্মিমানসের দ্বন্দ্ব আন্দোলনের প্রবলতার অল্পদিনের মধ্যেই প্রকট হয়ে উঠল। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাংলার সর্বসম্প্রদায়ের মিলনের প্রতীক হিসাবে তাঁরই প্রস্তাবিত 'রাখীবন্ধন' উৎসবে তিনি যে উল্লসিত উদ্দীপনা প্রকাশ করেছিলেন দু'মাস যেতে না যেতেই তার প্রতিক্রিয়া কবিমানসে দেখা দিল। ১৩১২ সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে তিনি যে অন্তরঙ্গ পত্র লিখেছিলেন তাতেই তাঁর মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই পত্রে তিনি লিখলেন, 'উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎপরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয় এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নি-

কাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে, আমার এই প্রদীপটিকে জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব।'[১৯]

নিজের ক্ষুদ্র 'প্রদীপটিকে জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকা'র এই প্রতিশ্রুতি নতুন আকারে সত্য হয়ে উঠতে দেখি প্রথম-বিশ্বযুদ্ধের দিনগুলিতে। 'বলাকা'র পঞ্চম কবিতায় দেখি, ঝড়ের হাওয়া পালে লাগিয়ে দিয়ে, তরী বেয়ে, মত্ত সাগর পাড়ি দিয়ে, গহন রাত্রিকালে বিশ্বের কাণ্ডারী তাঁরই ঘাটের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন। কবি ওই কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে বলছেন :

এমন বাতে উদাস হয়ে কেমন অভিসারে
আসে আমার নেয়ে ?
সাদা পালের চমক দিযে নিবিড় অন্ধকারে
আসছে তরী বেযে।
কোন্ ঘাটে সে ঠেকবে এসে কে জানে তার পাতি,
পথ-হারা কোন্ পথ দিয়ে যে আসবে রাতারাতি,
কোন্ অচেনা আঙিনাতে তারি পূজার বাতি
রয়েছে পথ চেয়ে ?
অগৌরবার বাড়িয়ে গরব করবে আপন সাথি
বিরহী মোর নেয়ে।

এই কবিতার 'অগৌরবা'র সঙ্গে 'শুভক্ষণে'র সামান্য বালিকার কোনো পার্থক্য নেই। সেও 'অগৌরবা'।

বলাকার কবিতাটির ব্যাখ্যায় কবি বলছেন, 'ইতিহাসের বড়ো বড়ো বিপ্লবের ভিতর দিয়ে ইতিহাসবিধাতা সাগর পার হয়ে পুরস্কারের বরমাল্য নিয়ে আসছেন। সে মাল্য কে পাবে ? আজ যারা বলিষ্ঠ, শক্তিমান, ধনী, তাদের জন্য আসছেন না। তারা যে ঐশ্বর্যের জন্য লালায়িত ; কিন্তু তিনি তো ধনরত্নের বোঝা নিয়ে আসছেন না। তিনি প্রেমের শাস্তি বহন করে, সৌন্দর্যের মালা হাতে করে আসছেন। আজ তো শক্তিমানেরা সে মাল্যের জন্য অপেক্ষা করে বসে নেই, তারা যে রাজশক্তি চেয়েছে। কিন্তু যে অচেনা তপস্বিনী আপন অঙ্গনে বসে পূজা করছে আমার নাবিক রজনীগন্ধার মালা তারই জন্য নিয়ে আসছেন। সে ভয়ে ভয়ে রাত কাটাচ্ছে, মনে করছে তার অজ্ঞাত অঙ্গনে পথিকের বুঝি পদচিহ্ন পড়ল না। সে যখন মাল্যোপহার পেয়ে ধন্যা হয়ে যাবে তখন সে বলবে, 'তোমার হাতের প্রেমের মালা চেয়েছিলাম, এর বেশি কিছু

আমি আকাঙ্ক্ষা করি নি। ধনধান্যে আমার স্পৃহা ছিল না।' এই রিক্ততার সাধনা যে করেছে, এই কথা যে বলতে পেরেছে, সে দুর্বল অপরিচিত দরিদ্র হোক, নাবিক সেই অকিঞ্চনের গলায় মালা পরিয়ে দেবেন। এরই জন্য এত কাণ্ড, এত যুগ-যুগান্তের অভিসার! হ্যাঁ, এরই জন্য। সকল ইতিহাসের এটাই অন্তর্নিহিত বাণী।'২০

এই বিশ্লেষণে 'শুভক্ষণ' ও 'ত্যাগে'র অন্তর্গূঢ় বেদনার রসমোক্ষ ঘটেছে। 'খেয়া'র যুগের যে প্রস্তুতি আশা ও নৈরাশ্যে আন্দোলিত হয়েছিল 'বলাকা'র যুগে তা নিঃসংশয় প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছে।

## উল্লেখপঞ্জী


১. দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্ররচনাবলী-৪, পৃ ৪৭০।
২. রবীন্দ্ররচনাবলী-৩, পৃ ৬০৮-৯।
৩ কুমারসম্ভব. ৭/৬৫।
৪ কাদম্বরী, প্রবোধেন্দু ঠাকুর অনূদিত। ২য় সং, পৃ ৭৩-৭৪।
৫. রবীন্দ্র-প্রতিভা, কানাই সামন্ত, পৃ ২৭৯ ও ৪০৭।
৬ বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ভাদ্র ১৩৪৬, পৃ ১৪১-৪২।
৭. রবীন্দ্ররচনাবলী অষ্টম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ১৫৩।
৮ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-পরিচয় . খেয়া, কানাই সামন্ত। বিশ্বভারতী পত্রিকা, বর্ষ ২৭, সংখ্যা ৪। পৃ ৩৮৭।
৯ রবীন্দ্রনাথ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, বিশ্বভারতী সং, ১৯৬৭, পৃ ১০৯।
১০, তদেব, পৃ ১১১।
১১ দ্রষ্টব্য, রবিরশ্মি, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সং, পৃ ৭৬-৭৭।
১২. রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, পরিবর্ধিত সং, মাঘ ১৩৫৫, পৃ ১৪৩।
১৩. রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা, প্রথম ওরিয়েন্ট সং, শ্রাবণ ১৩৬০, পৃ ৪১০, ৪২০-২১।
১৪. রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়, ক্ষুদিরাম দাস, দ্বিতীয় প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৬৮, পৃ ১৪৪।
১৫. রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৯, পৃ ২৩৮-২৪০।
১৬. বর্তমান প্রবন্ধকারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র। বিজয়া দশমী, ১৩৪৬। দ্রষ্টব্য, 'তরুণের স্বপ্ন', চতুর্দশ বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা, পৃ ৩৭-৩৮।
১৭. দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রকবিতাশতক, দ্বিতীয় দশক, পৃ, ৭০-৭১। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের দান সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য বর্তমান লেখকের 'বন্দে মাতরম্' গ্রন্থের [ প্রথম সংস্করণ ] ৪০ থেকে ৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
১৮. রবীন্দ্র-জীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, তৃতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৬৮, পৃ ১২৬।
১৯. দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রকবিতাশতক-২, পৃ ৭১।
২০. বলাকা, শতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৬৭, পৃ ১২১-২২।

# নাম্নী

১

'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থে একগুচ্ছ কবিতা আছে—নাম 'নাম্নী'। এই গুচ্ছের কবিতাগুলি লেখা হয় ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ থেকে আশ্বিনের মধ্যে। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত ১২৭ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে দেখা যাচ্ছে ৩১ থেকে ৩৫ পৃষ্ঠার মধ্যে লেখা শামলী, কাজলী, সাগরী, নন্দিনী [ ২৮ শ্রাবণ ১৩৩৫ ], দিয়ালী, জয়তী এবং পিয়ালী—এই সাতটি কবিতা, ১০২ থেকে ১০৫ পৃষ্ঠায় আছে ঝামরী, এবং ১০৬ থেকে ১০৮ পৃষ্ঠায় আছে মুরতি [ প্রথম নামকরণ মৃত্তিকা ]। নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত রবীন্দ্রনাথেব ৩১ ভাদ্র ১৩৩৫ তারিখের চিঠিতে কবি লিখছেন, 'নাম্নীতে নতুন যে নামাবলী যোগ করেছি ও পুরানোর মধ্যে যেগুলো সংস্করণ করা হয়েছে, তাই কাপি করতে করতে অনেক সময় চলে গেল।'[১] গ্রন্থাকারে 'মহুয়া'র প্রকাশ ১৩৩৬-এর আশ্বিন মাসে।

'মহুয়া' রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার সংকলন। বিশ্বভারতীর প্রকাশন-বিভাগের তাগিদে লেখা। কবি এক পত্রে লিখেছেন, 'লেখার বিষয়টা ছিল সংকল্প করা—প্রধানত প্রজাপতির উদ্দেশে—আর তাঁরি দালালি করেন যে-দেবতা তাঁকেও মনে রাখতে হয়েছিল।'[২] পত্রশেষে কবি 'মহুয়া' নামকরণের হেতু-নির্দেশ করে বলেছেন, 'মহুয়া বসন্তেরই অনুচর, আর ওর রসের মধ্যে আছে প্রচ্ছন্ন উন্মাদনা।'[৩]

কবিতায় 'মহুয়া'র অর্থের ইঙ্গিত স্পষ্টতর করে কবি বলেছেন,

রে মহুয়া, নামখানি গ্রাম্য তোর, লঘু ধ্বনি তার,
প্রাণ তোর উচ্চশির, রহে রাজকুলবনিতার
মর্যাদা বহিয়া।...
অনাবৃষ্টিশীর্ণ দিনে বনের প্রাঙ্গণ হতে ফেরে
বুভুক্ষু অতিথি যবে, বন্য নারী আসে তোর পথে,
দুর্ভিক্ষের ভিক্ষাঞ্জলি পূর্ণ করি দিস সদাব্রতে।

তাই কবিতার শেষ পংক্তিমিথুনে কবি বলেছেন :

যে বন্ধুরে ভাবি মনে, কানে-কানে কহি আমি তোরে,
যদি তার দেখা পাই ডাকিব মহুয়া নাম ধরে।

বলা নিষ্প্রয়োজন, এই 'আমি' কবির ব্যক্তি-আমি নয়, এই আমি নিখিল পুরুষ-সত্তার 'আমি'।

রবীন্দ্রকাব্যলোকে নারী বিচিত্ররূপিণী, স্বভাবতই নামরূপেও সে বিচিত্রা। কবির প্রথম জীবনের 'কৃষ্ণকলি' অবিস্মরণীয়া। শেষজীবনের গদ্যকাব্যের যুগে 'পুনশ্চে' আছে এক রহস্যময়ী,—যার সম্পর্কে কবি বলেছিলেন 'নাম রেখেছি কোমলগান্ধার'। কৃষ্ণকলি থেকে কোমলগান্ধারে রূপময় জগৎ এবং সুরময় জগতে নারীর নামকরণ নানা রূপে নানা রসে বিলসিত।

পরিণত জীবনে কবি নারীর 'নামকরণ' নিয়েই অন্তত তিনটি কবিতা লিখেছেন। আপাতত মনে পড়ছে প্রহাসিনীর 'নামকরণ'[৪] কবিতার 'দেয়ালি', 'খ্যাঁকশেয়ালি' এবং 'কেদারি'কে। তারপর আছে 'আকাশপ্রদীপের'[৫] 'চৈতালি-পূর্ণিমা' এবং সানাই-এর[৬] 'শোনামণি' ওরফে "সুনয়নী'।

'প্রহাসিনী'র 'নামকরণ' হাস্যরসের ভিয়ানে রচিত হলেও নিতান্তই হাসির কবিতা নয়। যাদের 'ঘর হতে আঙিনা বিদেশ', সত্য যাদের কাছে হেঁয়ালি, [ দেয়াল ]-এর মধ্যেই যে বন্দিনী তারি নাম 'দেয়ালি'। যার স্বভাবটা খিটখিটে, 'খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করে মিছে, / সব-তাতে দাঁত খিঁচে', কবি তার নামকরণ করেছেন 'খ্যাঁকশেয়ালি'। সারাদিনের খাটুনির পব গৃহে এসে পুরুষ যার কাছে 'আরাম্-কেদারা'র স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, যাব 'ঠিক সুরে তাব বাঁধা, / মূলতানে তানসাধা', কবি তার নামকবণ করেছেন 'কেদাবি'। এই তিনটি নাম কবির বক্রহাসিজারিত হলেও নিরর্থক নয়।

'সানাই' কাব্যগ্রন্থেব 'নামকরণ' কবিতার অন্তরালে একটি বিশেষ বাস্তবী নারীসত্তা বয়েছে একথা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। কালিম্পঙের গৌরীপুর ভবনে রচিত এই কবিতায় কবি বলেছেন :

বাদলবেলায় গৃহকোণে
রেশমে পশমে জামা বোনে,
নীরবে আমার লেখা শোনে,
তাই সে আমার শোনামণি।

কবি বলছেন, এটি প্রচলিত ডাক নয়, যাকে ডাকছেন এবং যিনি ডাকছেন, উভয়েই জানেন এটা 'নেহাতই পাগলামি', তবু কবিতার শেষে রোমান্টিকতার স্পর্শে নামকরণটি গভীরতর ব্যঞ্জনা পেয়েছে :—

সে হাসে, আমিও তাই হাসি,—
জবাবে ঘটে না কোনো বাধা।
অভিধান-বর্জিত বলে
মানে আমাদের কাছে সাদা।
কেহ নাহি জানে কোন্ খনে
পশমের শিল্পের সাথে
সুকুমার হাতের নাচনে
নূতন নামের ধ্বনি গাঁথে
শোনামণি, ওগো সুনয়নী।

এখানে দৃষ্টিচেতনা আর শ্রুতিচেতনায় যে 'নূতন নামের ধ্বনি' গাঁথা হয়েছে। তা অকস্মাৎ হাস্যপরিহাসের স্তর পেরিয়ে আনন্দঘন রসলোকে উত্তীর্ণ হতে পেয়েছে।

কিন্তু 'নামকরণ' শিরোনামায় রচিত এই তিনটি কবিতার মধ্যে সার্থকতম কবিতা হল 'আকাশ-প্রদীপে'র কবিতাটি।

এই কবিতার নায়িকাকে কবি 'চৈতালিপূর্ণিমা' বলে ডেকেছেন। কবিতাটি ১৩৪৫ সালের ২১ চৈত্র, চৈত্রপূর্ণিমায়, শান্তিনিকেতনে লেখা। কেন যে কবির মনে হঠাৎ এই নামকবণের জন্ম হল তার উত্তরে কবি বলেছেন, 'রসনায় রসিয়েছে, আর কোনো মানে / কী আছে কে জানে।'

কিন্তু কবির বক্তব্য এই লঘু পরিহাসোক্তিতেই থেমে যায় নি। তাই তিনি বলেন :

পুরুষ যে রূপকার
আপনার সৃষ্টি দিয়ে নিজেরে উদ্‌ভ্রান্ত করিবার
অপূর্ব উপকরণ
বিশ্বের রহস্যলোকে করে অন্বেষণ।
সেই রহস্যই নারী—
নাম দিয়ে ভাব দিয়ে মনগড়া মূর্তি রচে তারি,
যাহা পায় তার সাথে যাহা নাহি পায়
তাহারে মিলায়।

পাওয়া আর না-পাওয়া মিলিয়ে যে রহস্য 'সেই রহস্যই নারী'? কিন্তু এখানেও কবি থামেন নি, আরো গভীর চৈতন্যে ডুব দিয়ে বলছেন :

গভীর চৈতন্যলোকে
রাঙা নিমন্ত্রণলিপি দেয় লিখে কিংশুকে অশোকে :
হাওয়ায় বুলায় দেহে অনামীর অদৃশ্য উত্তরী,
শিরায় সেতার উঠে গুঞ্জরি গুঞ্জরি।

এখানে নারীলোক আর নিসর্গলোকের রাখীবন্ধন হয়েছে। অবশ্য নিসর্গলোক উদ্দীপন-বিভাব হয়ে 'অনামী'র অদৃশ্য উত্তরীর স্পর্শ বুলিয়েছে কবির মানসলোকে। তারি ফলে দেহের শোণিতপ্রবাহে সংগীতের গুঞ্জরন উঠেছে।

২

নারীকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিন্যস্ত ক'রে দেখার প্রয়াস সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও পরিদৃশ্যমান। রতিশাস্ত্রে পদ্মিনী-শঙ্খিনী প্রভৃতি পর্যাযে নারীর যে শ্রেণীবিন্যাস সেখানে অতনুলীলার তনুতন্ত্রই মুখ্য। অলংকারশাস্ত্রে আদিরসের আলম্বনবিভাব-রূপে নায়িকা হিসেবে নারীসত্তার অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নায়িকাভেদ-প্রকরণে স্বকীয়া পরকীয়া ও সাধারণী, মুগ্ধা মধ্যা ও প্রগল্‌ভা, কিংবা অভিসারিকা বাসকসজ্জিকা উৎকণ্ঠিতা খণ্ডিতা বিপ্রলব্ধা কলহান্তরিতা প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা প্রভৃতি পর্যায়বিন্যাস সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণেরই ফল। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে আদিরসের আলম্বন-বিভাব-রূপিণী নায়িকারূপেই নারীর বিচার। নারী সেখানে কেবল প্রেয়সী-সত্তাতেই বিলসিত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবেশে প্রেমরাগ-রঞ্জিত নারীসত্তার যে বিচিত্র স্ফুরণ, প্রকৃতি-পুরুষের বিরহ-মিলনে নারীর যে বিচিত্র ভাববৈভব তারই প্রকাশ সেখানে। আদি-ভিন্ন অন্যান্য রসের ক্ষেত্রেও নায়িকারূপিণী নারীর বিভিন্ন মূর্তি অলংকার-শাস্ত্রে অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'নারী' কবিতাগুচ্ছে নারী শুধু রসের ভূমিকাতেই প্রকাশিত হয়নি, আপন স্বরূপ-সত্তায়ও বিকশিত হয়ে উঠেছে।

সংগীত-শাস্ত্রে ছয় রাগের অন্তর্গত রাগবধূরূপে কল্পিত ছত্রিশ রাগিণীর যে আলেখ্য চিত্রিত হয়েছে তার মধ্যেও আছে নারীর বিচিত্র প্রকাশ। অবশ্য মুখ্যত শিবপার্বতী কিংবা রাধাকৃষ্ণের রূপকল্পের আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে বৈচিত্র্য-সৃজনের অবকাশ সেখানে সীমায়িত। কিন্তু সুরস্রষ্টা ও সুররসিকের চিত্তে এক-একটি-রাগ-রাগিণী যে ভাবমূর্তি পরিগ্রহ করে তাকে এক-একটি বিশিষ্ট রূপে ধ্যান করার মধ্যে শিল্পীর যে ধ্যান-তন্ময়তার পরিচয় পাওয়া যায়, সুরময় ভাবকে ভাবময় রূপে পরিণত করার মধ্যে যে অসামান্য সৃজন-নৈপুণ্য সেখানে পরিদৃশ্যমান, সংগীত-

শিল্পের ইতিহাসে তার তুলনা নেই। রবীন্দ্রনাথও কাব্যক্ষেত্রে কখনো কখনো সেই রীতির অনুসরণ করেছেন। 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধারে'র উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। আরো দু-একটি ক্ষেত্রে রূপকল্প বা 'ইমেজ'-রচনাতেও সংগীতশাস্ত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। নারদ-সংহিতায় বসন্ত রাগের অন্যতমা পত্নী 'দীপিকা'র বর্ণনায় পাই : রক্তপুষ্পমাল্যে সুশোভিতা ও অরুণবস্ত্রপরিধানা 'দীপিকা' সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু ধারণ ক'রে সন্ধ্যাসমাগমে প্রদীপ হাতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করছে। 'কল্পনা' কাব্যে সন্ধ্যাসমাগমের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের রূপকল্প তারই অনুরূপ : 'নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার-আঁচল-খসা, হাতে দীপশিখা।' রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি ও সুরকার। উভয় ক্ষেত্রেই ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রভাব তাঁর সৃষ্টিকর্মে অপরিসীম। আলোচ্য ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় সংগীতশাস্ত্রের প্রভাব পড়েছে বলে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না।

৩

'নাম্নী' কবিতাগুচ্ছে শুধু যে নারীর বিচিত্র সত্তার বাণীচিত্রই অঙ্কিত হয়েছে তা নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রে নামরূপের মধ্যেও ভাবরূপটি সমর্পিত হয়েছে। তাই নাম্নীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের প্রথমেই তাদের নামরূপের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ভক্তিশাস্ত্রে নাম ও নামীর অভেদত্ব স্বীকৃত। বৈষ্ণবভক্তিরসে নাম-মাহাত্ম্য বিশেষ ভাবে অভিব্যঞ্জিত। শ্রীচৈতন্যের 'নামৈব কেবলম্'-তত্ত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অভিনব সম্পদ। 'শিক্ষাষ্টকে'র দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে :

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।

অর্থাৎ নামের মধ্যেই নিজ সর্বশক্তি অর্পিত হয়েছে। তাই দেখি, নাম-শ্রবণে নাম-জপনে অন্তরে পূর্বরাগের সঞ্চার বৈষ্ণব প্রেমেরই বিশেষ কল্পনা। শ্যামনাম শুনে রাগবতী শ্রীরাধা বলেছেন :

জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥
নামপরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে হেরিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয়॥

রবীন্দ্রসাহিত্যেও প্রেমের ক্ষেত্রে নামের বিশেষ আসন রয়েছে। প্রেমিকের প্রথম প্রার্থনা :

ভালবেসে সখি নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখিয়ো তোমার
মনের মন্দিরে

তাজমহলের কল্পনায় কবির মনে হয়েছে :

জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।

প্রেমিক-কণ্ঠে প্রেয়সীর কানে-কানে ডাকা নাম সাজাহান চিরকালের জন্য অনন্তের কানে রেখে দিয়ে গেছেন, তাজমহল তারই শিল্পরূপ। 'শেষের কবিতা'য় অমিত রায়ও বলছে, এ-সব নাম বীজমন্ত্রের মতো। সেই বীজমন্ত্রে অমিত লাবণ্যের 'মিতা', আর লাবণ্য অমিতের 'বন্যা'। অমিতের কবিকল্পনায় তার বন্যার একমাত্র মিল অনন্যা,

হে মোর বন্যা, তুমি অনন্যা,
আপন স্বরূপে আপনি ধন্যা।

অর্থাৎ 'তুমি যা তুমি তাই, তুমি আর কিছুই নও।' অমিত-কণ্ঠে ভাষ্যরূপে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, 'দৈবাৎ এক একজন মানুষকে দেখতে পাওয়া যায় যাকে দেখেই চমকে বলে উঠি এ-মানুষটি একেবারে নিজের মতো।' নামের মধ্যে নামীর ধাতুপ্রকৃতিকে দেখতে পাওয়া, নাম ও নামীর মধ্যে অভেদত্ব সৃষ্টি করা এবং নামের মধ্যেই প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য সমর্পণ করা অবশ্য প্রতিভা-সাপেক্ষ। এক দিক দিয়ে প্রেমিক-ভক্ত, বা ভক্ত-প্রেমিকের পক্ষেই তা সম্ভব, আর সম্ভব অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞাসম্পন্ন কবির পক্ষে। নাম্নীর নামরূপের মধ্যেই কবি চরিত্ররূপকে ধরবার চেষ্টা করেছেন, নতুন অর্থে নতুন শব্দ সৃষ্টি ক'রে তার মধ্যে নতুন ব্যঞ্জনা এনে দিয়েছেন ; নাম্নীর নামগুলি তাই বীজমন্ত্র হয়ে উঠেছে।

৪

সবক্ষেত্রেই সে চেষ্টা চরম সার্থকতা পেয়েছে এ কথা কবির অন্ধ-ভক্তও বলবেন না, কিন্তু নারীর স্বরূপকে নামরূপের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা যে রবীন্দ্রনাথের হাতে অভিনবত্ব পেয়েছে তা অবশ্য-স্বীকার্য। এক্ষেত্রেও সংগীতের উপমা মনে পড়ে। সংগীতে ভাবের সুরমূর্তি চিত্ররূপে রসমূর্তি পেয়েছে। নাম্নীতে ভাবের বাণীমূর্তি নামরূপেই রসমূর্তিমতী। নামরূপ এখানে ভাবরহস্যের রূপক-সংকেত। জয়দেব গোস্বামীর গীতগোবিন্দে কৃষ্ণ নামসংকেতে বাঁশী বাজান: নামসমেতং কৃষ্ণসংকেতং বাদয়তে মৃদুবেণুম্। নাম্নীতে কবির মুরলী নাম-সংকেতেই নায়িকা-চিত্তকে আকর্ষণ করছে। সেই সংকেত অনুসারেই রসিকারা রসতীর্থের অভিসারিকা।

উদাহরণেই বক্তব্য স্পষ্টতর হবে। নাম্নীর প্রথম কবিতা 'শামলী'। 'সে যেন গ্রামের নদী, বহে নিরবধি, মৃদুমন্দ কলকলে।'—

জগৎ সামান্য তার, তারি ধূলি-'পরে
বনফুল ফোটে অগোচরে,
মধু তার নিজমূল্য নাহি জানে,
মধুকর তারে না বাখানে।
গৃহকোণে ছোটো দীপ জালায় নেবায়,
দিন কাটে সহজ সেবায়।

বলাই বাহুল্য, চিরন্তনী বঙ্গবধূর মূর্তি এটি। সে শিবোপাসিকা, তাই 'অপরাজিতা'র ফুলে তার প্রভাতের শুদ্ধস্নাত নীরব নিবেদন। কিন্তু নারী এখানে আত্মবিস্মৃতিময়ী। প্রাণের সহজ ধারা হারিয়ে সে পল্বলে বন্দিনী। মধ্যদিনের বাতায়নতলে সে যেন আপন স্বরূপকেই দেখতে পায়, 'দিঘিজলে শৈবালের ঘনস্তর, পতঙ্গের খেলা তারি পর।' কিন্তু হোক সে আত্মবিস্মৃতা, হোক সে বন্দিনী, তবু সে পুরুষের সংসারে তৃষ্ণার পানীয়ে পূর্ণ ঘটকক্ষে সায়াহ্নের শান্তি মূর্তিমতী। শেষের চিত্ররূপটি রবীন্দ্র-কাব্যলোকে বার বার দেখা দিয়েছে।'

দেখা গেল সবটুকু মিলিয়ে শামলী বিশুদ্ধ বঙ্গবধূ। এবার প্রশ্ন হল, শামলী নামের সার্থকতা কোথায়? রবীন্দ্র-সাহিত্যের রসিক পাঠকমাত্রেরই জানা আছে, বঙ্গবধূ আর বঙ্গপ্রকৃতি রবীন্দ্র-মানসে অভেদ-কল্পনায় গ্রথিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ-জীবনের বাসগৃহের নাম রেখেছিলেন 'শ্যামলী'। শ্রাবণে তার কালো

কাজল চাহনির দিকে তাকিয়ে কবির মনে হত, এ যেন 'চুপ ক'রে থাকা বাঙালি মেয়েটির ভিজে চোখের পাতায় মনের কথাটির মত।' এই ভাবটিই অন্যত্র গীতচ্ছন্দে ধরা পড়েছে :

হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে,
সেই সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।
অধর করুণা-মাখা, মিনতিবেদনা-আঁকা
নীরবে চাহিয়া থাকা বিদায়খনে ॥[৮]

আরো একটি গানের ভাষায় এই একই চিত্র :

মধু গন্ধে ভরা মৃদু স্নিগ্ধছায়া নীপ কুঞ্জতলে
শ্যাম কান্তিময়ী কোন্ স্বপ্নমায়া ফিরে বৃষ্টিজলে।[৯]

বাঙলার এই শ্যামকান্তিময়ী স্বপ্নমায়াই শামলী বঙ্গবধূ। শ্যামলী নয়, তার প্রাকৃত রূপ শামলীর মধ্যেই নারীর ঘরোয়া প্রাকৃত রূপটি কবির চোখে সম্যক্ ধরা দিয়েছে। অর্থাৎ বঙ্গবধূর মধ্যে বঙ্গ-প্রকৃতিরই যে মূর্তি বিষয়-বিষয়ীর অভেদ-কল্পনায় রূপকালংকারে গঠিত, তারই সংকেত শামলী নামের দ্যোতনায় অভিব্যঞ্জিত। 'বঙ্গবধূ' নামকরণে এ কবিতার নামপরিচয় স্পষ্ট হত, 'আত্ম-বিস্মৃতা' নামকরণে পাওয়া যেত ভাবমূর্তি, কিন্তু 'শামলী' নামকরণে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তার রসাত্মা। যে-মন্ত্রে অমিত হয় মিতা আর লাবণ্য হয় বন্যা, এখানেও সেই একই বীজমন্ত্রের লীলা।

৫

'কাজলী'ও বঙ্গবধূরই আরেকটি মূর্তি :

প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যভারে চিত্ত তার নত
স্তম্ভিত মেঘের মতো,
তৃষ্ণাহরা
আষাঢ়ের আত্মদান প্রত্যাশায় ভরা।

অর্থাৎ বঙ্গবধূর সেবাময়ী রূপটিই এখানে মুখ্য। 'সেবাকে তারা সুন্দর করে, তপঃক্লান্তের জন্যে তারা আনে সুধার পাত্র।'[১০] তার সত্তার রূপক হল অচঞ্চল কানায়-কানায়-ভরা কাকচক্ষু স্বচ্ছ দিঘি-জল। 'শীতল অতল-মাঝে প্রসন্ন কিরণ দেয় ধরা।' তার অশ্রু তার হাসিরই খেলার সাথি। মানুষের সংসারে সে যেন দেবতার করুণা-অঞ্জলি। কিন্তু তার নাম কেন 'কাজলী'? এখানেও

বঙ্গবধূ বঙ্গপ্রকৃতিরই দোসর। গ্রীষ্মের খরতাপে তৃষাতপ্ত প্রকৃতির কাছে আষাঢ় আসে আকাশের করুণা হয়ে। আকাশের সেই স্নিগ্ধ-সজল-মেঘকজ্জল রূপ, গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন-ছায়া সঞ্চারিত-করা সেই মেঘমেদুর মূর্তিটিই বাঙ্ময়ী হয়েছে 'কাজলী'তে।

কাজলী শামলীর সহোদরা। তেমনি 'হেঁয়ালি'র প্রাণলীলার সঙ্গে সঙ্গতি আছে খেয়ালীর। নারীর রহস্যময়ী মূর্তিটি হেঁয়ালিতে ধরা দিয়েছে। নারীচরিত্রের দুর্বোধ্য আলো-আঁধারি-লীলার সার্থক উদাহরণ হেঁয়ালি। 'যারে সে বেসেছে ভালো তারে সে কাঁদায়।'

তারপরে আপনার নির্দয় লীলায়
আপনি সে ব্যথা পায়,
ফিরে যে গিয়েছে তারে ফিরায়ে ডাকিতে কাঁদে প্রাণ;

নারীচরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্য দিয়ে গড়া হয়েছে হেঁয়ালিকে। সে যেন একটি দ্ব্যর্থব্যঞ্জক কবিতা। কখনো মনে হয় অর্থ প্রাঞ্জল হয়ে এলো, কিন্তু পরক্ষণেই বিমূঢ় চিত্তে ধরা পড়ে, তার সবটাই দুর্বোধ্য ছলনা।

'খেয়ালী'তে নারী স্বপ্নময়ী, সুদূরের পিয়াসিনী। না-দেখা জনের অজানা বেদনায় সে বিরহিণী। যুগান্তরপার হতে পুরাণকথা তার কাছে আসে কবিকল্পনার পাখা মেলে। তার ইচ্ছে হয়, ভূর্জপাতে লিপিখানি লিখে সে তাব উত্তর দেয় 'লেখনিতে ভরি লয়ে দুঃখে-গলা কাজলের কালি।' আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় স্বপ্নময়ী খেয়ালী বুঝি স্বপ্নেই পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু কবি 'দুঃখে-গলা' শব্দটির ধ্বনিমন্ত্রে তার মধ্যে জীবন্ত প্রাণের হৃৎস্পন্দন সঞ্চারিত করেছেন।

'কাকলী' আর 'পিয়ালী'তে নারীর বিপরীতধর্মী দুই সত্তা। কাকলী কলচ্ছন্দে পূর্ণ, ভাষার কল্লোলে 'সংগীতে তরঙ্গ তুলি, হাসিতে ফেনিল তার ছোটো দিনগুলি।'

আঁখি তার কথা কয়, বাহুভঙ্গী কত কথা বলে,
চরণ যখন চলে
কথা কয়ে যায়—

কাজেই সংশয় থাকে না যে সত্যসত্যই সে 'কাকলী'। 'পিয়ালী' তার সম্পূর্ণ বিপরীত। দিনের সব কোলাহল স্তব্ধ হবার পর সন্ধ্যার তিমিরে-ভাসা তারার মত পিয়ালীর চাহনি। নৈঃশব্দ্যের মধ্যেই তার অতল গভীর হৃদয়ের স্পর্শ। তার প্রেরণা নিগূঢ়-সঞ্চারী। 'পায়ের চলায় কিছু যেন দান করে ধূলির তলায়।'

নিঃশব্দে দ্বার খুলে অঞ্চলে আড়াল ক'রে সে যেন কার সৌভাগ্যের থালি বহন করে এনেছে। 'পিয়ালী' নামের মধ্যে পিয়াল বনের নিঃশব্দ গম্ভীর রহস্য ধরা পড়েছে।

'পিয়ালী'তে নারীমহিমা মৌনময়ী, 'দিয়ালী'তে সে বৈভবময়ী, ষড়ৈশ্বর্য-রূপিণী। পিপাসিত পুরুষ তার কাছে প্রার্থী-বেশে দণ্ডায়মান, আর সে রাজরানী-বেশে তার অনিঃশেষ প্রার্থনা পূরণ করছে। 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের 'মার্জনা' কবিতায়ও নারীর এই রাজরানী-মূর্তিটি উজ্জ্বল :

রানীর মতন বসিব রতন-আসনে,
বাঁধিব তোমারে নিবিড় প্রণয়শাসনে,
দেবীর মতন পুরাব তোমার বাসনা।

রবীন্দ্র-কাব্যলোকে নারীমহিমার এই মূর্তিটি সচরাচর চোখে পড়ে না। প্রকৃতি-পুরুষের মিথুনলীলায় পুরুষ যেন ভিখারী-শঙ্কর এবং নারী দশভুজা অন্নপূর্ণা। 'ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃত বারি'[১১] পিপাসার্ত পুরুষের জীবনে তারই সন্ধান এনে দেয় নারীর 'দিয়ালী' মূর্তি। দেহ-মৃত্তিকার অনাদি অন্ধকারে সে উজ্জ্বল ক'রে তোলে আনন্দের সহস্র দীপাবলী। তাই 'দিয়ালী' নামেই সে অনন্যসত্ত।

৬

'নাগরী'তে নারী লীলারঙ্গময়ী। এ নাগরী অবশ্য প্রাচীন নাগর-নাগরীর রঙ্গ-সঙ্গিনী নয়, আধুনিক যুগের নাগরিকা। 'ব্যঙ্গসুনিপুণা, শ্লেষবাক্য-সন্ধান-দারুণা।' বিদুষী সে,—'বিদ্যারে করেছে অলংকার।'—

প্রসাধনসাধনে চতুরা
জানে সে ঢালিতে সুরা
ভূষণভঙ্গীতে,
অলক্তের আরক্ত ইঙ্গিতে।

'নাগরী' বচনে চলনে জাদুকরী। তার অনুগ্রহ-বর্ষণের মধ্যেও বিদ্রূপ-বিদ্যুৎঘাত অকস্মাৎ মুগ্ধ-পুরুষের মর্মস্থল বিদ্ধ করে। তার প্রশ্রয়ের বীথিকায় ঘাসে ঘাসে সে কণ্টক-অঙ্কুর বুনে বুনে রেখেছে। মোহমন্ত্রে সে যে-হৃদয়কে জয় করে তার প্রতিই সে অবজ্ঞায় দারুণ নির্দয়। বলাই বাহুল্য, এ নারী বুঝি 'হেঁয়ালি'র নাগরিক

সংস্করণ। শুধু পার্থক্য এই যে, তার আলো-আঁধারি-লীলা অচেতন বা অবচেতন মনের লীলা হয়। নাগরী নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতনা।

নাগরীর ব্যক্তিত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু তার লীলারঙ্গ পুরুষের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। কিন্তু 'জয়তী' নিজেও যেমন ব্যক্তিত্বময়ী, পুরুষের মধ্যেও তার পৌরুষ-ব্যক্তিত্বকে সে প্রবুদ্ধ করে। এ সেই নারী যার আহ্বানে—

সুপ্তির তিমিরবক্ষ দীর্ণ করে তেজস্বী তাপস
দীপ্তির কৃপাণে :
বীরের দক্ষিণ হস্ত মুক্তিমন্ত্রে বজ্র করে বশ,
অসত্যেরে হানে।[১২]

মর্ত্যতলে 'জয়তী' বয়ে এনেছে ইন্দ্রাণীর গাঁথা বরমালা।

দিবে কণ্ঠে তার
কার্মুকে যে দিয়েছে টংকার,
কাপট্যেবে হানিয়াছে, সত্যে যার ঋণী বসুমতী,

সংস্কৃত বাণীশাস্ত্রে জয়তীর জয়ন্তী-রূপই সিদ্ধ। কিন্তু রবীন্দ্ররচনায় বাঙলার জয়তী নবতর সিদ্ধির অধিকারিণী হয়েছে।

৭

'ঝামরী' নামটিও পাঠকচিত্তকে কম বিস্মিত করে না। ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের মতে সংস্কৃত 'ক্ষাম' শব্দ প্রাকৃতে 'ঝাম' হয়েছে। নির্যাতিত, পরিশ্রান্ত, অবসন্ন তার অর্থ। স্বার্থে-র এবং র-ল-এর অভেদত্বে ঝামর শব্দের উৎপত্তি। বর্ষণোন্মুখ, জলভারাক্রান্ত অর্থেও ঝামব বাঙলা ভাষায় চলে। ক্রিয়ারূপে ঝাম্‌রানো অর্থ 'রসাধিক্যে ভারি হওয়া', 'বর্ষণোন্মুখ হওয়া' [ রাজশেখরের চলন্তিকা ]। কবি সত্যেন্দ্রনাথ ঝামর ঢেউএর ঝালব দুলিয়েছেন। বৈষ্ণব মহাজনগণ শ্যামর দেহকে ঝামর হতে দেখেছেন; 'শ্যামর দেহ ঝামর ভেল।' রবীন্দ্রনাথের 'ঝামরী' 'যেন খসিয়া-পড়া তারা।' 'সে যেন অকালে-ফোটা কুবলয়, / শিশিরে কুণ্ঠিত হয়ে রয়'। 'জানেনা কিসের বাধা তার'। 'অলক্ষ্য কী আচ্ছাদনে কেন সে আবৃতা'। স্বর্গ থেকে সে যেন মর্ত্যলোকে নির্বাসিত। তাই 'মন্দারের গন্ধ যেন আছে তার বিষাদে জড়ানো'। তবু তাকে সম্পূর্ণ চেনা গেল না। এই অপরিচয়ের কারণ তার নামের মধ্যে রয়েছে। 'বেদনার করুণানির্ঝ'রী' 'ঝামর ঢেউএর ঝালর' পরেছে, না লাঞ্ছনা ও অবসন্নতার অবগুণ্ঠন টেনে দিয়ে নিজের

নামরূপকে অবগুণ্ঠিত করেছে? মনে হয় কবিমানসে দুটি ছবিই মিশে আছে। কিন্তু যে কারণেই হোক, পাঠকচিত্তে তার নামরূপ স্বচ্ছ হয়ে ওঠেনি।

'করুণী' নামও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। কিন্তু তার মধ্যে নারীর জীব-বৎসলা মূর্তিটি যেমন স্নিগ্ধ তেমনি স্বচ্ছ। স্নেহ তার আকাশের আলোর মতন:

শিশু হতে শিশুতর
গাছগুলি বোবা প্রাণে ভয়-ভর,

তার প্রাণের সমতা সর্বত্রই স্নেহের মমতা বিছিয়েছে। কিন্তু ভুললে চলবে না, করুণী আর করুণাময়ী এক নয়। করুণাময়ীর অন্তরে জীবে-দয়া ভাবই নিত্যস্থায়ী, কিন্তু 'শিশু হতে শিশুতর বোবা' প্রাণের জগতে করুণীর যশোদা-মূর্তিই উজ্জ্বল। তার প্রাণে জীববাৎসল্যের অনন্ত প্রস্রবণ।

নারীর আর একটি স্নিগ্ধ রূপ আছে 'মালিনী'তে। সেখানে নারীর প্রিয়সখী প্রীতিময়ী মূর্তি। তার প্রসন্নতা অন্তহীন। মর্ত্যের ম্লানতা তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। ঘরে ঘরে হাসিমুখ নিয়ে সে সখীদের অবকাশ মধু দিয়ে ভরে দেয়। সে যেন রাশি রাশি আনন্দের হিল্লোল। অনসূয়া-প্রীতির পুষ্পমাল্য নিয়ে ঘরে ঘরে তার অমূল্য পশরা। 'সঙ্গহীন আঁধারের নৈরাশ্যক্ষালিনী' সে। 'মালিনী' নামের মধ্যেই তার সত্তার স্বরূপ সম্পূর্ণ ধরা দিয়েছে।

৮

'মুরতি'র মধ্যে আছে অমৃতে মাটিতে মেশা সৃজনের নতুন 'সুরতি'। 'সুরতি'র অর্থ রবীন্দ্রনাথ করেছেন 'আনন্দ'।[১৩] মুরতি-সত্তায় প্রাণের অমৃতহারা শুধুমাত্র রূপের মধ্যেই নারী বিরাজমানা:

রঙিন বুদ্বুদ সে কি, ইন্দ্রধনু বুঝি,
অন্তর না পাই খুঁজি—
সকলি বাহির,
চিত্ত অগভীর।
কারো পথ চেয়ে নাহি থাকে,
কারে-না পাওয়ার দুঃখ মনে নাহি রাখে।
মুগ্ধ প্রাণ-উপহার
অনায়াসে নেয়, আর অনায়াসে ভোলে দায় তার।

নারীসত্তার মন-দেওয়া-নেওয়ার এই অনায়াসলীলার তুলনা দিতে রবীন্দ্রনাথ

ধ্বনির জগতে প্রবেশ করেছেন। সুরে ও বাণীতে আসে সংগীতের সার্থকতা। সৌন্দর্য নারীদেহে যখন ভালবাসার অমৃত হয়ে ওঠে তখনই নারীসত্তার পূর্ণ সার্থকতা। তা না হলে সংগীত-জগতে 'রাগহীন বাণীহীন গুঞ্জনের স্বরে'র মতই সে অসম্পূর্ণ অসার্থক। 'মুরতি' নারীজগতে 'রাগহীন বাণীহীন গুঞ্জনের স্বর'।

অগভীর-চিত্ত 'মুরতি'র 'সকলই বাহির'। 'সাগরী' তার সম্পূর্ণ বিপরীত। বাহিরে সে দুরন্ত আবেগে উচ্ছল। সে উচ্ছলতা দেখে ভয় হয় কখন সে প্রচণ্ড অধৈর্যবেগে তটের মর্যাদা লঙ্ঘন ক'রে যায়। কিন্তু বাহিরে তার উচ্ছলতা যতই উদ্বেল হোক্ অন্তরে তার নিস্তরঙ্গ নিঃসীম প্রশান্তি :

গভীর অন্তর তার নিস্তব্ধ গম্ভীর
কোথা তলা, কোথা তীর :
অগাধ তপস্যা যেন রেখেছে সঞ্চিত করি'—

বলাই বাহুল্য, অতলান্ত সাগরের রূপকে এ নারীর নামকরণ 'সাগরী' ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। তার পরিদৃশ্যমান রূপ 'দুরন্ত আবেগে উচ্ছল', অপরিদৃশ্যমানতায় অপরিমেয় প্রশান্তি।

৯

'প্রতিমা'তে অমরাব অসীমতা মর্ত্যলোকের সীমায় বাঁধা পড়েছে।

'প্রতিমার প্রথম নাম ছিল 'উনিতা', তার পরে হল 'মৃত্তিকা', সবশেষে 'প্রতিমা'। নির্মলকুমারীকে ৩১ ভাদ্র ( ১লা আশ্বিন ) ১৩৩৫ তারিখে কবি লিখেছেন, 'উনিতা' নাম চলবে না—

অমর্ত্যের অসীমেরে সীমা দিল মর্ত্যের মৃত্তিকা,
নাম কি মৃত্তিকা ?

আরো একটি পাঠান্তর আছে :—

অমরার অসীমতা মাটিতে নিয়েছে সীমা
নাম কি প্রতিমা ?

এই চিঠিতেই কবি লিখেছেন, 'বৌমার নামটা সর্বসাধারণ্যে অত স্পষ্ট করে ব্যবহার করতে একটু সঙ্কোচ বোধ হচ্চে বলেই ইতস্তত করছি'।[১৪] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে নারীর কবিতাগুলির কোন্‌টি কাকে মনে করে লেখা, এ নিয়ে কিছু

কিছু অনুমানের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই ধরনের উৎসসন্ধান সব সময় ফলপ্রসূ হবে না।

প্রতিমা যেন চতুর্দশীর চাঁদ, পূর্ণিমার প্রান্তে এসে থেমে গেছে। কিন্তু প্রতিমার অর্থব্যঞ্জনা ধরা পড়েছে অন্যত্র :

সংসারজনতা মাঝে
আপনাতে আপনি বিরাজে।
দুঃখে শোকে অবিচল, ধৈর্য তার প্রফুল্লতা-ভরা
সকল উদ্বেগভারহরা।

দুর্যোগের মেঘে তার প্রভা কখনোই ম্লান হয় না। কিন্তু তাহ'লে ত সে স্বর্গেরই দেবী, মর্ত্যের মানবী নয়। তার মানবীত্ব তার অনুচ্ছ্বসিত অশ্রুজলের মধ্যে। সেখানেই তার 'বিষাদ-ইঙ্গিতে-ছোঁওয়া ঈষৎ বিহ্বল' মানবী-সত্তার পরিচয়। সে পরিচয় বাহিরে অপ্রকাশ্য, তাই সে দেবী নয়, দেবীর প্রতিমা।

'উষসী'তে এসে রবীন্দ্রনাথ নাম্নী কবিতাগুচ্ছের সমাপ্তি রচনা করেছেন। মহুয়া কাব্যগ্রন্থের 'বিষয়টা ছিল সংকল্প করা—প্রধানত প্রজাপতির উদ্দেশে।' তাই প্রিয়-মিলনের প্রতীক্ষারত নববধূর ধ্যানেই নাম্নীর সমাপ্তিরচনা সংগতিপূর্ণ হয়েছে। 'প্রভাত-মহিমা ওর সংবৃত রয়েছে নিশ্চেতনে',—উষসীর মধ্যে কবি তারই আভাস পেয়ে বলছেন :

চিত্ত তার আপনার গভীর অন্তরে
নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে
পরিপূর্ণ সার্থকতা লাগি।
সুপ্তিমাঝে প্রতীক্ষিয়া আছে জাগি
নির্মল নির্ভয়
কোন্ দিব্য অভ্যুদয়।
কোন্ সে পরমা মুক্তি, কোন্ সেই আপনার
দীপ্যমান মহা-আবিষ্কার।

রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের মিলনতত্ত্বের মর্মকথা এখানেই অনুস্যূত। পুরুষের জীবনে পরমা প্রকৃতি আর নারীর জীবনে পরম পুরুষের আবির্ভাব যখন সত্য হয় তখনই আসে জীবনের মুক্তিলগ্ন, তখনই ঘটে 'আপনার দীপ্যমান মহা-আবিষ্কার'। নরনারীর জীবনে আত্মবিকাশ বা আত্মপরিচয়-সাধনে প্রেম দেয় মহত্তম প্রেরণা। মহুয়ার 'প্রতীক্ষা' কবিতায় পুরুষের দিক থেকে যে 'প্রতীক্ষা'র কথা আছে, নাম্নীর

উষসীর মধ্যে নারীর দিক থেকে সেই একই পরম লগ্নের প্রতীক্ষা। মর্ত্য-জীবনে নরনারী-মিলন-যজ্ঞের এখানেই পূর্ণাহুতি।

১০

কিন্তু এই পূর্ণাহুতির পরেও একটি প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে। নর ও নারী পরস্পরের পরিপূরক। তাহলে পরস্পর-সাপেক্ষতা ছাড়া কি তাদের অস্তিত্ব সত্য ও সম্পূর্ণ নয়? 'উষসী'তে দেখছি নারীসত্তাকে একটি বীণাযন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। গুণীর অঙ্গুলি-স্পর্শ পেলেই সে বীণায় সংগীত বেজে উঠবে। কিন্তু নারীসত্তায় প্রাণের আনন্দ-সংগীত কি আপনি বাজে না? এই প্রশ্নেরই উত্তর রয়েছে নারীর 'নন্দিনী' কবিতায়।

'নন্দিনী'তে রয়েছে রবীন্দ্র-কাব্যলোকে নারীসৃষ্টির শেষ রহস্য। রবীন্দ্রনাথ নারী-দেহে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের ধ্যান করেছেন 'উর্বশী' ও 'বিজয়িনী'তে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই নারীত্বের সৌন্দর্যকে অতিক্রম করা সম্ভব হয় নি বলে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা পায় নি। নন্দিনীতে নারীসত্তায় বিশুদ্ধ আনন্দের প্রকাশ সার্থক হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে অনুরূপ আনন্দের অসম্পূর্ণ প্রকাশ আমরা পূর্বেও দেখেছি। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' রঘুদুহিতার মধ্যে 'নন্দিনী'র অস্ফুট কলিকামূর্তি রয়েছে। সে 'ধর্মভ্রষ্ট অনাচারী রঘু'র অস্পৃশ্যা কন্যা। গুহাবাসী সন্ন্যাসী চিত্তনিরোধের পথে মায়াবিনী প্রকৃতির স্নেহ প্রেম দয়া প্রভৃতি বিচিত্র কুহককে ভস্মীভূত করে, চন্দ্রসূর্য নিবিয়ে দিয়ে, মহাশ্মশানের বুকে প্রলয়ের রাজধানী রচনা করেছিল। নিবৃত্তিমার্গে 'বাসনার বহ্নিময় কশাঘাত'কে জয় করে সে বেরিয়ে এলো পথে,—এলো সুখ-দুঃখপূর্ণ লোকালয়ে। বালিকার প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছে:

> সুখ দুঃখ সে তো বাছা জগতের পীড়া!
> জগৎ জীবন্ত মৃত্যু—অনন্ত যন্ত্রণা;
> মরণ মরিতে চায় মরিছে না তবু
> চিরদিন মৃত্যুরূপে রয়েছে বাঁচিয়া।

কাজেই তার সংকল্প 'পাতিব প্রলয়াসন সৃষ্টির হৃদয়ে'। কিন্তু তার এই সংকল্প ব্যর্থ করে তার জীবনে এলো ওই অস্পৃশ্য কন্যাটি। সন্ন্যাসীর বিবিক্ত চিত্তের রুদ্ধ দ্বার সে খুলে দিল। তার মনে হল, 'মরি কী অমিয়াময়ী লাবণ্যপ্রতিমা!' তখন ওই

বালিকার স্পর্শই তার কাছে দেখা দিল 'ধ্যানের মতন'। 'সীমা হতে নিয়ে যায় অসীমের দ্বারে।' এই উপলব্ধিতে বিষয়বিরাগী সন্ন্যাসী বলছে :

সমুদ্রের এক পারে রয়েছে জগৎ,
সমুদ্রের পরপারে আমি বসে আছি,
মাঝেতে রহিলি তুই সোনার তরণী—
জগৎ-অতীত এই পারাবার হতে
মাঝে মাঝে নিয়ে যাবি জগতের কূলে।

কিন্তু সন্ন্যাসীর মন তখনো সংশয়াচ্ছন্ন। বালিকার স্নেহপাশ ছিন্ন করে সে আবার সমাধিতে বসল। কিন্তু 'হৃদয়ের প্রলয় আঁধার' ছিন্ন করে ভেসে ওঠে অমিয়াময়ী ওই লাবণ্যপ্রতিমা। ভগ্নব্রত সন্ন্যাসীর মনে হল ওই বালিকা লাবণ্য-প্রতিমা নয়, সে প্রকৃতির গুপ্তচর। সে 'আলেয়ার আলো'; সে 'মরীচিকা'। সুতরাং সন্ন্যাসী তাকে গুহামুখে পরিত্যাগ করে গেল। কিন্তু আনন্দের সন্ধান একবার যে পেয়েছে তার কাছে প্রলয়েব অন্ধকারে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। অরণ্যগুহা থেকে বেরিয়ে লোকারণ্যে এসেই সে পেল আনন্দের পরিচয়। অনুভব করল :

আনন্দহিল্লোল কাঁপে লতায় পাতায়,
আনন্দ উচ্ছ্বসি উঠে পাখির গলায়,
আনন্দ ফুটিয়া পড়ে কুসুমে কুসুমে।

সন্ন্যাসী ফিরে পেতে চাইল পরিত্যক্তা আনন্দময়ী লাবণ্যপ্রতিমাকে। ছুটে গেল গুহামুখে তার সন্ধানে। কিন্তু ততদিনে প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্পূর্ণ হয়েছে। সন্ন্যাসী তার জীবনে আনন্দের উৎসস্বরূপিণী সত্তার দেখা যখন পেল তখন তারই অবহেলিতা রঘুদুহিতা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব কবিভাষা খুঁজে পান নি। তাই তাঁর বক্তব্যও বাগর্থ-সম্পৃক্তিতে শিল্পসুন্দর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু নারী যে আনন্দের দূতী, 'অমিয়াময়ী লাবণ্যপ্রতিমা',—তার পরিচয় প্রথম 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'ই পাওয়া গেল।

বিসর্জন নাটকে 'অপর্ণা'র মধ্যে কবিসৃষ্টি সাফল্যের পথে আরো কিছু দূর অগ্রসর হয়েছে। এই নাটকে রাজা আর পুরোহিতের অধিকার ও আধিপত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষতবিক্ষত জয়সিংহের জীবনে এলো 'অপর্ণা' : নাটকের যা বক্তব্য সে যেন তারিই প্রাণপ্রতিমা!

অকণ্টক পুষ্পের মতন
নির্দোষ নিষ্পাপ শুভ্র সুন্দর সরল
সুকোমল বেদনাকাতর,...

জয়সিংহ তাকে বলছে ·
এই জনহীন
স্তব্ধ রজনীতে, এই বিশ্বজগতের
নিদ্রা মাঝে, বল্ রে অপর্ণা, যা শুনিলে
মনে হবে চারিদিকে আর কিছু নাই
শুধু ভালোবাসা ভাসিতেছে, পূর্ণিমার
সুপ্তরাত্রে রজনীগন্ধার গন্ধসম।

অপর্ণা এখানে 'রজনীগন্ধার গন্ধে'র প্রতীক। স্বরূপে অবশ্য জীববৎসলা অপর্ণা একই সঙ্গে বেদনাঘন ও প্রেমঘন। জয়সিংহকে মিথ্যা সংস্কারের নিগড় থেকে মুক্তিদানের জন্যই নাটকে তার আবির্ভাব। শাক্ত পুরোহিত রঘুপতির কাছে সে মায়াবিনী, সে উপদেবী। তাঁর কাছ থেকে জয়সিংহকে কেড়ে নিতেই যেন সে মন্দিরে এসেছে, তাই রঘুপতি তাকে তাড়াতেই ব্যস্ত। কিন্তু শক্তিমদমত্ত রঘুপতির সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হল প্রেমের মন্ত্রে। গুরুর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জয়সিংহ নিজের বক্ষশোণিত বিসর্জন করেই গুরুকে সত্যের পথ দেখালো। এই চরম আঘাতে মোহমুক্ত রঘুপতির কাছে অপর্ণা আর উপদেবী নয়। সে 'জননী অমৃতময়ী'। গোমতীর জলে দেবীপ্রতিমাকে বিসর্জন দিয়ে রঘুপতি বলছে :

পাষাণ ভাঙিয়া গেল,—জননী আমার
এবার দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা।
জননী অমৃতময়ী।

জীববৎসলা বালিকা অপর্ণা চূর্ণদম্ভ প্রতাপের কাছে অমৃতময়ী প্রত্যক্ষ প্রতিমা।

'প্রকৃতির প্রতিশোধে' আনন্দরূপিণী সত্তা ছিল অনামিকা, 'বিসর্জনে' সে হয়েছে তপশ্চারিণী 'অপর্ণা', 'রক্তকরবী'তে কবিকল্পনা পূর্ণতা পেল 'নন্দিনী'তে। মকররাজের অভিশপ্ত যক্ষপুরীর শ্রমদাসদের ঘরেই তার জন্ম। 'ঈশানী পাড়ার মেয়ে' সে, নিতান্তই মর্ত্যলোকের বাস্তবী মানবী। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'রক্ত-করবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে একটি মানবীর ছবি।'

নাটকের পাত্রপাত্রীরা তাকে নিজের নিজের মতন করে ভাবে। অধ্যাপক বলেন, 'এই যক্ষপুরে আমাদের যা-কিছু ধন সব ওই ধুলোর নাড়ির ধন—সোনা। কিন্তু সুন্দরী, তুমি যে-সোনা সে তো ধুলোর নয়, সে যে আলোর।' নন্দিনীর

হাতে 'রক্তকরবী'র কঙ্কণ। রঞ্জন তাকে কখনো কখনো আদর ক'রে ডাকে রক্তকরবী। নন্দিনী বলে, 'আমার রঞ্জনের ভালোবাসার রঙ রাঙা, সেই রঙ গলায় পরেছি, বুকে পরেছি, হাতে পরেছি।' খোদাইকর গোকুল তাকে বলে 'রাঙা আলোর মশাল'। যক্ষপুরীর মকররাজ তার মধ্যে দেখছে 'বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে ছন্দ বাজে সেই ছন্দ।' রাজা বলে, 'সেই ছন্দে বস্তুর বিপুল ভার হালকা হয়ে যায়: সেই ছন্দে গ্রহনক্ষত্রের দল ভিখারী নটবালকের মতো আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে। সেই নাচের ছন্দেই নন্দিনী, তুমি এমন সহজ হয়েছ, এমন সুন্দর।' চন্দ্রা বলে বিশু পাগলকে নন্দিনীতে পেয়েছে। চন্দ্রার প্রশ্নের উত্তরে বিশু বলে, নন্দিনী তাকে ভুলিয়েছে দুঃখে। 'এমন দুঃখ আছে যাকে ভোলার মত দুঃখ আর নেই।' নন্দিনী তার অপ্রাপণীয়া, সে বলে, 'কাছের পাওনা নিয়ে বাসনার যে দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে দুঃখ তাই মানুষের। আমার সেই চিরদুঃখের দূরের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।'

রঞ্জন সম্পর্কে নন্দিনী বলে, 'দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয়; বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায়; লাফ-দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হা হা করে হাসে। আমাদের নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে আমাকে নিয়ে তেমনি সে তোলপাড করতে থাকে। প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ করে সে হারজিতের খেলা খেলে। সেই খেলাতেই আমাকে জিতে নিয়েছে।'

রাজা রঞ্জনকে ঈর্ষা করে। রঞ্জনের কথা সে নন্দিনীর কাছে জানতে চায়। তাকে সে কী রকম ভালোবাসে। উত্তরে নন্দিনী বলে 'জলের ভিতরকার হাল যেমন আকাশের পালকে ভালোবাসে—পালে লাগে বাতাসের গান, আর হালে লাগে ঢেউয়ের নাচ।'

পুরাণবাগীশের প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক বলে, 'পৃথিবীর প্রাণভরা খুশি নিজের সর্বাঙ্গে টেনে নিয়েছে, ওই আমাদের নন্দিনী।'

নন্দিনী চেয়েছিল এই অভিশপ্ত যক্ষপুরীতে রঞ্জনকে সকলের মধ্যে আনতে। রঞ্জন যৌবনের দূত। 'যৌবন জরাসন্ধের দুর্গ ভেঙে ফেলে জীবনের জয়ধ্বজা উড়ায়।' রাজা তার দৃপ্ত যৌবনকে সহ্য করতে পারে নি। তাই তাকে সে হত্যা করেছে। কিন্তু মৃত্যুর মধ্য দিয়েই রঞ্জনের জয়যাত্রা শুরু হল। রাজা নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনায় বলছে, 'আমি যৌবনকে মেরেছি—এতদিন ধরে আমার

সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি।' তাই মরা-যৌবনের অভিশাপ সে বহন করে চলেছে। কিন্তু রঞ্জনের মৃত্যুতেই এলো তার মুক্তির লগ্ন। যক্ষপুরীর ধ্বজা ভেঙে ফেলে সে বেরিয়ে এলো পথে, অনেক ভাঙা তখনো যে বাকি আছে! নন্দিনীই হবে তার সঙ্গিনী, প্রলয়-পথে তার দীপশিখা। ওদিকে কারিগররাও বন্দীশালা ভেঙে ফেলেছে। নন্দিনী গেছে সকলের আগে এগিয়ে। শেষ মুক্তিতে। পেছনে ধুলোয় লুটোচ্ছে তার রক্তকরবীর কঙ্কণ। ডান হাত থেকে খসে পড়েছে। তার হাতখানি আজ সে রিক্ত করে দিয়ে চলে গেল। বিশু নন্দিনীকে বলেছিল, তার হাত থেকে সে কিছুই নেবে না। কিন্তু তার 'শেষ দান'—ধুলায় ফেলে-যাওয়া ওই রক্তকরবীর কঙ্কণ—তাকে ধুলা থেকে তুলে নিতে হল। রক্তকরবী নন্দিনীর প্রাণের প্রতীক। নন্দিনীই রক্তকরবী। উত্তর-য়ুরোপের মহাশিল্পী রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসরের জয়ন্তী উপলক্ষে বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথই ভারতবর্ষ, তিনি য়ুরোপের কাছে এক নতুন অধ্যাত্মবাণী নিয়ে এসেছেন—সে বাণী ক্রুশের বাণী নয়, পদ্মের বাণী।' পদ্ম সৌন্দর্যের প্রতীক। যক্ষপুরীতে পদ্ম নেই, সেই মৃত্যুপুরীতে অনেক খুঁজে-পেতে জঞ্জালের মধ্যে কিশোর আবিষ্কার করেছিল একটি রক্তকরবীর গাছ। ওর রাঙা ফুলের বুকে আছে যৌবনের রাঙা রঙ। তাই রক্তকরবী যৌবনের রক্তরাঙা সৌন্দর্যের প্রতীক। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই যে যৌবন মৃত্যুঞ্জয়, যে যৌবন বন্দীশালার বন্ধনভাঙা মুক্তির দূত, তারই প্রতীক রক্তকরবী। নন্দিনী তারই মানবী-প্রতিমা। তাই নন্দিনীই রক্তকরবী।

১১

'নাম্নী'র নন্দিনী বিশুদ্ধ আনন্দপ্রতিমা। তার অন্তিম পরিচয়ে কবি বলছেন 'দুস্তর-প্রস্তর-ঠেলা ফেনোচ্ছ্বস আনন্দ-জাহ্নবী'। নাম্নী গুচ্ছের শেষ কবিতাতে আছে 'আলোকের জয়ধ্বনি'। মহুয়ার কবিতাগুলি রচনার ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে নাম্নীর কবিতাগুলি পর পর লেখা হয় নি। মাঝে মাঝে অন্যান্য কবিতাও আছে। গ্রন্থপ্রকাশের সময় বিচিত্ররূপিণী নারীর রূপবৈচিত্র্যকে সপ্তদশ কবিতাগুচ্ছে কবি গ্রথিত করেছেন। এই কবিতাগুচ্ছ রচনার মধ্যবর্তী একটি কবিতার দিকে আমাদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবেই আকৃষ্ট হয়। সে কবিতার নাম 'সবলা'। 'সবলা' নাম্নীগুচ্ছে স্থান পায় নি, কেননা কবিকণ্ঠে প্রথম-পুরুষের ভাষায় সে বর্ণিত হয় নি, উত্তমপুরুষের ভাষাতেই সে তার আপন স্বরূপকে প্রকাশ করেছে।

'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার' অধিকার নিয়েই তার আবির্ভাব। এই অর্থে 'সবলা' কবির প্রথম জীবনের 'চিত্রাঙ্গদা'রই সহোদরা।
সে বলছে :

হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা,
রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা।
উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হতে
নির্বারিত স্রোতে।
যাহা মোর অনির্বচনীয়
তারে যেন চিত্ত-মাঝে পায় মোর প্রিয়।[১৫]

'সবলা'র এই আত্মপ্রকাশ কবিকল্পনায় অবশ্যই অসামান্য। কিন্তু কলাকৃতির দিক দিয়ে কবিতাটি দুর্বল, নারীর আত্মঘোষণা এই কবিতায় যত উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত, ভাষার অগম পারে ততটা অনির্বচনীয়তায় অভিব্যঞ্জিত হতে পারে নি।

'নাম্নী'র 'নন্দিনী' কবিতা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। কবি সারাজীবন নারীসত্তায় যে আনন্দরূপ যে অমৃতরূপের সন্ধান করেছেন তার অন্তিম ফলশ্রুতি 'নন্দিনী'। 'রক্তকরবী' নাটকে নন্দিনী আনন্দবাদের কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদের 'বাণী মূর্তিমতী'। এই অর্থেই 'রক্তকরবী' নন্দিনী নাম্নী একটি মানবীর ছবি। নিরানন্দ যক্ষপুরীতে সে আনন্দের প্রাণবন্যা। যে আনন্দকে হারিয়ে মানুষ অভিশাপগ্রস্ত জীবনে অমানুষ হয়ে উঠেছে সেই আনন্দেরই প্রাণপ্রতিমা নন্দিনী। নাটকে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রপাত্রীর বাসনাবেদনায় তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কিন্তু আনন্দলোকে যাত্রার পথই যে অভিশপ্ত মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ এই তত্ত্বেরই রসভাষ্য 'রক্তকরবী' নাটক। নন্দিনী নারীরূপে তারই আলম্বন, ভাবরূপে তারই আত্মা। কিন্তু পুরুষচিত্তের বিচিত্র বাসনা-সম্পর্কে এসেছে বলেই রক্তকরবীর নন্দিনী যেন বিশুদ্ধ আনন্দসত্তায় পূর্ণবিকশিত হতে পারে নি। 'নাম্নী'র নন্দিনীতে তা সম্ভব হয়েছে।

নন্দিনী ষোড়শ পংক্তিতে রচিত একটি ষোড়শীর বাণীমূর্তি। আনন্দ যেন ষোলো কলায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। সমগ্র কবিতাটি উদ্ধার করলে রেখাচিত্রেও যেন একটি ষোড়শীর আভাস পাওয়া যাবে :

প্রথম সৃষ্টির ছন্দখানি
অঙ্গে তার নক্ষত্রের নৃত্য দিল আনি
বর্ষা-অন্তে ইন্দ্রধনু
মর্তে নিল তনু।
দিগ্‌বধূর মায়াবী অঙ্গুলি
চঞ্চল চিন্তায় তার বুলায়েছে বর্ণ-আঁকা তুলি।
সরল তাহার হাসি. সুকুমার মূঠি
যেন শুভ্র কমলকলিকা,
আঁখি দুটি
যেন কালো আলোকের সচকিত শিখা।
অবসাদবন্ধ-ভাঙা মুক্তির সে ছবি,
সে আনিয়া দেয় চিত্তে
কলনৃত্যে
দুস্তর-প্রস্তর-ঠেলা ফেনোচ্ছল আনন্দজাহ্নবী।
বীণার তন্ত্রের মতো গতি তার সংগীতস্পন্দিনী—
নাম কি নন্দিনী॥

নন্দিনী ষোড়শী, কিন্তু কন্যারূপিণী বলেই নারীত্বের ষোলো-কলায়-পূর্ণ নারীসৌন্দর্য থেকে তার আনন্দতনু সম্পূর্ণ মুক্ত।

নাম্নীর নন্দিনী যে রক্তকরবীর নন্দিনীর সহোদরা, তার একটি প্রমাণ পাওয়া যাবে কবিতাটির পাণ্ডুলিপি-পাঠে। পরিশোধিত রূপে আছে :

সরল তাহাব হাসি, সুকুমার মূঠি
যেন শুভ্র কমলকলিকা,
আঁখি দুটি
যেন কালো আলোকের সচকিত শিখা।

এই চার পংক্তি প্রথম পাঠে ছিল :

নবীন ধান্যের শীর্ষ পরে
দোলাভরে
হেমন্ত শিশির ঝলি উঠে,
তেমনি চকিত দৃষ্টি চক্ষু হতে ছুটে।

এই পংক্তিচতুষ্টয় থেকেই নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশালায়

রক্তকরবীর নন্দিনীমূর্তিই পরে নাম্নীর নন্দিনীমূর্তি পরিগ্রহ করেছে। 'রক্তকরবী' নাটকের সূত্রপাত শিলঙে ১৩৩০ সালের গ্রীষ্মাবকাশে। প্রথম নাম 'যক্ষপুরী', পাণ্ডুলিপি-আকারেই নামকরণ হয় 'নন্দিনী'। ১৩৩১ সালের আশ্বিনের 'প্রবাসী' পত্রিকায় সম্পূর্ণ নাটকটি প্রকাশিত হয়। 'প্রবাসী'তে প্রকাশের সময় তার নতুন নাম হয় 'রক্তকরবী'। মহুয়ার 'নন্দিনী' রচিত হয় ১৩৩৫ সালের ২৮শে শ্রাবণ। 'রক্তকরবী'তে যক্ষপুরী থেকে অভিশাপ-মুক্তির সংকেতসূচক একটি গান আছে—'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে—আয়রে চলে আয় আয় আয়।' নাটকের পরিসমাপ্তিও ওই গান দিয়েই। নাটকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কবি কর্ষণ-জীবী ও আকর্ষণজীবী সভ্যতার কথা বলেছেন। রক্তকরবীতে আছে 'আকর্ষণজীবী' সভ্যতার অভিশাপ। যক্ষের ধন মাটির নিচে পোঁতা আছে। যক্ষপুরীর রাজা সুড়ঙ্গ খোদাই করে সেই ধন হরণে নিযুক্ত। অধ্যাপক তাকে বলেছে 'মরা ধনের শবসাধনা'। নাটকের ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, নন্দিনী এই 'শবসাধনা'র প্রতিবাদ। 'মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্যের'। সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্যেরই গান 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে'। তার এক কলিতে আছে :

আলোর খুশি উঠল জেগে
ধানের শিষে শিশির লেগে,
ধরার খুশি ধরে না গো, ওই যে উথলে,
মরি, হায় হায় হায়।

এই ধানের শিষের শিশিরের রূপকল্প দিয়েই কবি নাম্নীর নন্দিনীর চকিত দৃষ্টি রচনা করেছিলেন। পরিশোধিত সত্তায় রক্তকরবীর নন্দিনী এই বিশেষ পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে অবিমিশ্র আনন্দসত্তায় নবজন্ম লাভ করেছে। সেই আনন্দরূপের অনুপম সৌন্দর্যের তিনটি উপমান কবি ব্যবহার করেছেন, 'সরল তাহার হাসি', 'সুকুমার মুঠি / যেন শুভ্র কমলকলিকা', 'আঁখি দুটি / যেন কালো আলোকের সচকিত শিখা।'

নন্দিনীর সরল হাসিতে আনন্দই শুধু ঝরে পড়ছে। সে হাসি নিখিল পুরুষচিত্তকে মোহমুগ্ধ-করা হাসি নয়। দ্বিতীয় উপমানে এসেছে 'শুভ্র কমলকলিকা'। আমরা পূর্বে বলেছি, যক্ষপুরীতে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতীক—'Divine Symbol of the Lotus'—নেই। নাম্নীর নন্দিনীর সুকুমার মুঠি কাব্যোৎপ্রেক্ষায় হয়েছে 'শুভ্র কমলকলিকা'। এও আনন্দের বিশুদ্ধ সৌন্দর্যরূপ। তৃতীয় উপমানটি বিস্ময়কর।

নন্দিনীর আঁখি দুটি 'যেন কালো আলোকের সচকিত শিখা।' কালো পদটি শিখার বিশেষণ নয় আলোকের বিশেষণ। কালো আলোকের উৎপ্রেক্ষারচনা লোকোত্তর কবিপ্রতিভার পক্ষেই সম্ভব। এখানে রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টি নন্দিনীর কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুতারকায় সন্নিবিষ্ট। তাই 'আলোর খুশি' আর 'ধরার খুশি' একত্র মিলিত হয়ে সৌন্দর্যের নবজন্ম দিয়েছে 'কালো আলোকের সচকিত শিখা'য়।

এবার নাম্নীর নন্দিনীর আনন্দরূপকে সৌন্দর্যবীক্ষণে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। কালিদাসের যক্ষপ্রিয়া ছিল বিধাতার আদিসৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের নন্দিনী 'প্রথম সৃষ্টির ছন্দ' দিয়ে গড়া। সেই ছন্দই তার অঙ্গে নক্ষত্রের নৃত্য এনে দিয়েছে। বর্ষাশেষে আকাশে যে ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণের সৌন্দর্য মেঘমালায় বিচ্ছুরিত হয় নন্দিনী মর্ত্যলোকে সেই ইন্দ্রধনুর সৌন্দর্য। সে মাটিকে স্পর্শ করেছে বটে, কিন্তু তাকে দেখতে হয় আকাশের প্রেক্ষাপটে। রক্তকরবীর গানে আছে

হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে
দিগ্‌বধূরা ধানের খেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে।

এই গানের এই কলিতে ধানের ক্ষেতে দিগ্‌বধূরা হাওয়ার নেশায় মেতে উঠেছে। প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষায় তা-ই হয়েছে মাটির আঁচলে রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়া। নাম্নীর নন্দিনীতে তারই পরিশীলিত রূপ হয়েছে দিগ্‌বধূর মায়াবী অঙ্গুলিতে বর্ণ-আঁকা তুলির আল্পনা।

কবিতার শেষ পংক্তি-ষট্‌কে আছে নন্দিনীর স্বরূপ। সে 'অবসাদবন্ধভাঙা মুক্তির ছবি'। সে নিখিল মানবচিত্তে এনে দেয় 'কলনৃত্যে দুস্তর প্রস্তর-ঠেলা ফেনোচ্ছল আনন্দ-জাহ্নবী'। নন্দিনীর নৃত্যচ্ছন্দেই আছে মুক্তির রূপ। 'নটরাজে'র 'নৃত্য'-গীতিকবিতায় কবি বলছেন,

নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ
নৃত্যে তোমার মায়া।
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে
কাঁপে নৃত্যের ছায়া।[১৬]

'আনন্দজাহ্নবী' পদটিই এই অংশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিভাষা। 'আনন্দ-মন্দাকিনী' মর্ত্যের অতীত লোকের প্রাণপ্রবাহ। 'আনন্দজাহ্নবী' তারই মর্ত্যসত্তা।

এই নৃত্যময়ী আনন্দজাহ্নবী কবির অন্তিম কল্পনায় হয়েছে আনন্দসংগীত।

তিনি বলছেন, 'বীণার তন্ত্রের মতো গতি তার সংগীতস্পন্দিনী।' এ সংগীত স্বয়ং-সম্পূর্ণ। গুণীর অঙ্গুলিস্পর্শের সে অপেক্ষা রাখে না। সংগীতস্পন্দিনী বীণার তন্ত্রী যেমন ধাতব-সত্তা ছাড়িয়ে সংগীত-তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়, নন্দিনীর তনুতন্ত্রীও নিত্যগতিচ্ছন্দে সংগীতস্পন্দিনী আনন্দ-তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়েছে। নাম্নীর 'নন্দিনী' কবিতায় তাই নারীসত্তায় বিশুদ্ধ আনন্দের নবজন্ম হয়েছে। এই অভিনব রূপে নারীও আনন্দলোকে নবজন্ম পেল।

## উল্লেখপঞ্জী


১. 'দেশ', ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১।
২. রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী সং, পঞ্চদশ খণ্ড, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৫২৬।
৩. তদেব, পৃ ৫২৮।
৪ রবীন্দ্ররচনাবলী [ বিশ্বভারতী ]-২৩, পৃ ৫০-৫২।
৫ তদেব, পৃ ১১২।
৬. রবীন্দ্ররচনাবলী [ বিশ্বভারতী ]-২৪, পৃ ১২৭-১২৮।
৭ দ্রষ্টব্য, বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ 'রবীন্দ্র-জীবনে একটি নারী।' 'তরুণের স্বপ্ন,' ষষ্ঠ বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা, পৃ ৩১৯-৩২৮।
৮. গীতবিতান, প্রকৃতি-পর্যায়ের ৩০-সংখ্যক গান, পৃ ৪৪০।
৯ তদেব, পৃ ৪৬৬।
১০. শেষ সপ্তক, ৪৩-সংখ্যক কবিতা। র র-১৮, পৃ ৮৯ ৯৬।
১১. 'আহ্বান', পূরবী। র-র-১৪, পৃ ৪৮-৫২।
১২ তদেব, পৃ ৫০।
১৩. নির্মলকুমারীকে লেখা কবির পত্রসংখ্যা ৭৫। ২ আশ্বিন ১৩৩৫। দ্র° 'দেশ' ফেব্রুয়ারি ১৯৬১।
১৪. তদেব, পত্রসংখ্যা ৭৩।
১৫. মহুয়া, সং বৈশাখ ১৩৬৭, পৃ ৬৫। কবিতাটি-১৩৩৫ সালের ৭ ভাদ্র বিরচিত।
১৬. 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' ১৩৩৩ সালে রচিত। সুতরাং নন্দিনী রচনার পূর্বেই কবি নৃত্যে 'মুক্তির রূপ' দেখেছেন।

# ওগো তরুণী

১

মানুষের ভালবাসাই শিল্পগোত্র মানুষের পরম কামনার ধন। অথচ মর্ত্যলোকে মৃত্যুই জীবের নিয়তি। মানুষের জীবজীবনও মৃত্যুশাসিত। তবু মানুষ মৃত্যুর অমোঘ বিধানকে অস্বীকার করে অমরতা প্রার্থনা করে। 'কড়ি ও কোমলে'র তরুণ কবি বলেছিলেন :

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই!

এই চরণ-চতুষ্কে দেখা যাচ্ছে, কবি সুন্দর ভুবনে,—এই সূর্যকরে, এই পুষ্পিত কাননে—মানুষের মাঝে বেঁচে থাকতে চান। চতুর্থ চরণের 'যদি' বেঁচে থাকার শর্ত নয়, তা ঈপ্সার্থক। অর্থাৎ জীবন্ত হৃদয়-মাঝে স্থান পেলে তবেই মানবের মাঝে বেঁচে থাকা কমনীয়। দ্বিতীয় চতুষ্কে আছে বেঁচে থাকার উপায়ের সংকেত :

ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত
বিরহ-মিলন কত হাসি-অশ্রু-ময়—
মানবের সুখদুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয়।

অর্থাৎ, পৃথিবীতে 'প্রাণের খেলা'ই 'চিরতরঙ্গিত'। হাসি-অশ্রু-ময় এই প্রাণের খেলায় মানুষের সুখদুঃখ গেঁথে সংগীত রচনা করতে পারলে তবেই অমরতার ঈপ্সা সার্থক হতে পারে। মানুষের হাসি-অশ্রু সুখ-দুঃখে গড়া জীবন-সংগীত রচনা করলেই এই মরলোকে অমর আলয়ের প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

প্রাক্‌পঁচিশের এই আকাঙ্ক্ষা চল্লিশোত্তর সাহিত্যতত্ত্ব-রচনাকালে তাত্ত্বিক ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। কবি বলেছেন, "আমরা যে মূর্তি গড়িতেছি, ছবি আঁকিতেছি, কবিতা লিখিতেছি, পাথরের মন্দির নির্মাণ করিতেছি, দেশে-বিদেশে চিরকাল ধরিয়া এই যে একটা চেষ্টা চলিতেছে, ইহা আর কিছুই নয়, মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করিতেছে"।[১]

আমরা বলেছি, এ অমরতা শিল্পীর শিল্পজীবনের অমরতা। শিল্পীর ব্যক্তি-জীবনও আছে। ব্যক্তিজীবন ও শিল্পজীবনে পার্থক্য এই যে, শিল্পজীবনে শিল্পী ব্যক্তিজীবন অতিক্রম করে সর্বজনীনতা লাভ করে। ব্যক্তিসত্তা বিশ্বসত্তায় উন্নীত হয়। প্রাচীনেরা একে বলেছেন ব্যক্তিপরিচ্ছেদ-বিগলিত সাধারণীকৃতি।

ব্যক্তিজীবনে অমরতা লাভের উপায় প্রেম। প্রেমেই ব্যক্তিজীবন মৃত্যুর সীমা অতিক্রম করতে পারে। কেননা মরলোকে মৃত্যুপীড়িত হয়েও প্রেম চিরজীবী। তাই প্রেয়সীর কাছে প্রেমিকের অন্তিম প্রার্থনা 'তবু মনে রেখো'। এই প্রসঙ্গে 'মানসী'র অবিস্মরণীয় সনেট 'তবু' এবং তা থেকে গড়া-ওঠা রবীন্দ্র-নাথের একান্তপ্রিয় প্রেমসংগীত 'তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে'-র কথা বিশেষভাবে মনে পড়বে। সনেটের ষট্‌কবন্ধে কবি বলছেন :

তবু মনে রেখো, যদি তাহে মাঝে মাঝে
উদাস বিষাদভরে কাটে সন্ধ্যাবেলা,
অথবা শারদপ্রাতে বাধা পড়ে কাজে,
অথবা বসন্তরাতে থেমে যায় খেলা।
তবু মনে রেখো, যদি মনে পড়ে আর
আঁখিপ্রান্তে দেখা নাহি দেয় অশ্রুধার।

উদ্ধৃতাংশের অন্তিম পংক্তিমিথুন গানে হয়েছে 'যদি পড়িয়া মনে / ছলোছলো জল নাহি দেখা দেয় নয়নকোণে / তবু মনে রেখো।' অর্থাৎ হারানো প্রেমের বেদনার লেশমাত্র যদি প্রেমিকার মনে অবশিষ্ট নাও থাকে, তবু প্রেমিকের প্রার্থনা, শুধু মনে রেখো। এখানে ব্যক্তিগত প্রেমের সূত্রেই 'মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করিতেছে।'

২

মানুষের হৃদয়ের মধ্যে এই অমরতার প্রার্থনা রবীন্দ্রজীবনের বিভিন্ন পর্বে একাধিক কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে। এই প্রার্থনা কখনো প্রেমিকের, কখনো শিল্পীর। এই প্রসঙ্গে 'পত্রপুটে'র চোদ্দো-সংখ্যক কবিতাটি মনে পড়ছে। কবিতাটি রচিত হয় ১৩৪৩ সালের ১৯ বৈশাখ। অর্থাৎ কবির বয়স তখন পঁচাত্তর পূর্ণ হতে চলেছে। গ্রন্থে সংকলিত হওয়ার পূর্বে কবিতাটি কোনো সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়নি। পত্রপুটের যে-সব কবিতা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল কবি সেগুলির নামকরণ করেছিলেন। কিন্তু গ্রন্থপ্রকাশের সময় নামগুলি তুলে দিয়ে কেবল

সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। পত্রপুটের আলোচ্য চোদ্দো-সংখ্যক কবিতাটির কোনো নাম নেই। প্রথম পংক্তিতে আছে কেবল একটি সম্বোধন—'ওগো তরুণী'। এই সম্বোধনই রচনাটির প্রাণকেন্দ্র। তাই 'ওগো তরুণী' নামেই কবিতাটির ভাবসত্য ধরা পড়বে। পত্রপুটে এই কবিতার পংক্তিসংখ্যা হল ৩৭। কিন্তু পত্রপুটের পাণ্ডুলিপিতে সংশোধিত আকারে কবিতাটির যে প্রথম পাঠ পাওয়া যায় তার পংক্তিসংখ্যা হল ২০। আমরা প্রথমে পাণ্ডুলিপিধৃত পাঠটি উদ্ধার করছি :

ওগো তরুণী

ছিল অনেক দিনের পুরানো এক নতুন কাল
সেই কালের আমি।
আধো মুছে যাওয়া পথ বেয়ে
এসে পড়েছি বনগন্ধের সংকেতে
তোমাদের এই আজকে দিনের নতুন কালে।
পারো যদি মেনে নিয়ো সখা বলে
তোমাদের মিলনরাতে গান জোগাব
প্রহরে প্রহরে,
আমার সেই নিদ্রাহারা সুদূর রাতের গান,—
পাবে দূরের নতুনকে, তোমার লাগ্‌বে ভালো।
পাবে আপনাকে
আপনার সীমানা ছাড়িয়ে।
সেদিনকার বসন্তের বাঁশিতে বেজেছিল
যে প্রিয়বন্দনার সুর
আজ সঙ্গে এনেছি তাই,
তুমি নিয়ো সে তোমার দীর্ঘনিশ্বাসে!
আমার বিস্মৃত বেদনার সঞ্চয়
রেখে দিয়ে যাব তোমার বসন্তের হাওয়ায়।
সেদিনকার ব্যথা অকারণে বাজবে তোমার বুকে
মনে বুঝবে, সেদিন তুমি ছিলে না
তবু ছিলে।

ওগো চিরন্তনী
যখন তুমি থাকবে না
তখনো তুমি থাকবে আমার গানে।
বহুদিনের আমার নতুন কাল
আজ সহজে মিলেছে তোমার নতুন কালে।

৩

এবার পাণ্ডুলিপির এই পাঠের সঙ্গে 'পত্রপুটে' প্রকাশিত পাঠের তুলনা করা যেতে পারে। আমরা পাণ্ডুলিপির পাঠকে বলব প্রথম পাঠ এবং পত্রপুটের পাঠকে বলবো দ্বিতীয় পাঠ।

প্রথম পাঠের দ্বিতীয় পংক্তি ছিল·

ছিল অনেক দিনের পুরানো এক নতুন কাল

দ্বিতীয় পাঠে তা হয়েছে :

ছিল অনেক দিনের পুরোনো বছরে
এমনি একখানি নতুন কাল,
দক্ষিণ হাওয়ায় দোলায়িত,

দ্বিতীয় পাঠে প্রথম পাঠের বক্তব্য স্পষ্টতব হয়েছে। প্রথম পাঠের চতুর্থ পংক্তি ছিল 'আধো মুছে যাওয়া পথ বেয়ে', দ্বিতীয় পাঠে হয়েছে 'মুছে আসা ঝাপসা পথ বেয়ে'। নতুন কালেব তরুণীর কাছে কবির দাবি, 'পারো যদি মেনে নিয়ো [ আমায় ] সখা বলে'। এই সখার কাজ প্রথম পাঠে ছিল :

তোমাদের মিলন রাতে গান জোগাব
প্রহরে প্রহরে,
আমার সেই নিদ্রাহাবা সুদূর রাতের গান,—

দ্বিতীয় পাঠে তা হয়েছে :

আর কিছু নয়, আমি গান জোগাতে পারি
তোমাদের মিলন রাতে
আমার সেই নিদ্রাহারা সুদূর রাতের গান ;

এই পরিবর্তনে 'আর কিছু নয়' সংযোজনটি গুরুত্বপূর্ণ। কবির সেই নিদ্রাহারা সুদূর রাতের গানের মধ্যে নতুন কালের তরুণী কী পাবে? প্রথম পাঠে কবি বলছেন :

পাবে দূরের নতুনকে, তোমার লাগবে ভালো।
পাবে আপনাকে
আপনার সীমানা ছাড়িয়ে।

দ্বিতীয় পাঠে ঈষৎ পরিবর্তনে তা হয়েছে ·

তাব সুরে পাবে দূরের নতুনকে,
তোমার লাগবে ভালো,
পাবে আপনাকেই
আপনার সীমানার অতীত পারে।

দ্বিতীয় পাঠের 'তাব সুরে' সংযোজনে পাওয়ার মাধ্যমটি স্ফুটতর হয়েছে। প্রথম পাঠে 'তোমাব লাগবে ভালো'র পবে ছিল পূর্ণবিবতি-চিহ্ন, দ্বিতীয় পাঠে দাঁড়িব বদলে বসেছে কমা। ফলে পাওযা দু'দিক দিয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হযেছে। 'পাবে দূবেব নতুনকে', এবং পাবে 'আপনাকেই / আপনার সীমানার অতীত পাবে।' প্রথম পাঠেব 'আপনাকে ছাড়িয়ে' আপনাকে পাওয়া সংশোধনে হয়েছে 'আপনাব অতীত পাবে' আপনাকে পাওয়া। এই পবিবর্তনে সত্তা আপনাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে না, আপনাব সীমানার অতীত পাবে, অর্থাৎ আপনাকে পাচ্ছে আপনার অসীমতায়।

প্রথম পাঠের তেরো থেকে সতেরো পংক্তি ছিল—

সেদিনকাব বসন্তের বাঁশিতে বেজেছিল
যে প্রিয়বন্দনার সুব
আজ সঙ্গে এনেছি তাই,
তুমি নিযো সে তোমার দীর্ঘনিশ্বাসে।

দ্বিতীয় পাঠে তা হযেছে .

সেদিনকাব বসন্তের বাঁশিতে
লেগেছিল যে প্রিয়বন্দনার তান,
আজ সঙ্গে এনেছি তাই,
সে নিযো তোমার অর্ধনিমীলিত চোখেব পাতায়,
তোমার দীর্ঘনিশ্বাসে।

দুটি পাঠেই 'সে' পদটি বাক্যের সঙ্গে অন্বিত হয়নি, 'তাকে' হওয়াই ব্যাকরণ-সম্মত ছিল। কিন্তু কর্মকাবকে কর্তৃকারকের ব্যবহারে প্রিয়বন্দনার সুর বা তানেব

কর্তৃকারকতা নিগূঢ় ব্যঞ্জনা পেয়েছে। তাছাড়া, দীর্ঘনিশ্বাসের আগে 'অর্ধনিমীলিত চোখের পাতা' অর্থান্তর-সংক্রমণের সহায়ক হয়েছে।

প্রথম পাঠের ১৮-১৯ পংক্তি ছিল :

আমার বিস্মৃত বেদনার সঞ্চয়
রেখে দিয়ে যাব তোমাব বসন্তের হাওয়ায়।

দ্বিতীয় পাঠে হয়েছে :

আমার বিস্মৃত বেদনার আভাসটুকু
ঝরা ফুলের গন্ধেব মতো,
রেখে দিয়ে যাব তোমার নববসন্তের হাওযায়।

বলাই বাহুল্য, এই পরিবর্তন অনেক বেশি সৌকুমার্যমণ্ডিত হয়েছে। 'বেদনাব সঞ্চয' হয়েছে 'বেদনার আভাসটুকু', 'বসন্ত' 'নববসন্ত', নববসন্তের হাওয়ায় সেই আভাসটুকু থাকবে 'ঝরা ফুলেব মৃদু গন্ধের মতো'। 'সেদিনকার ব্যথা অকারণে বাজবে তোমাব বুকে'। তার ফলে 'মনে বুঝবে, তুমি ছিলে না তবু ছিলে'। প্রথম পাঠে পূর্ণবিরতি-চিহ্ন দিয়ে বাক্য এখানেই শেষ হযেছে; দ্বিতীয় পাঠে দাঁড়ির বদলে বসেছে কমা, তাব ফলে সেদিনের অস্তিত্ব নতুন তাৎপর্য পেয়েছে :

সেদিন তুমি ছিলে না তবু ছিলে,
নিখিল যৌবনেব রঙ্গভূমির নেপথ্যে
যবনিকার ওপারে।

এই পরিবর্তন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ একালেব তরুণী সেকালেও তরুণী ছিল 'নিখিল যৌবনের রঙ্গভূমির নেপথ্যে'। তাই সে 'চিরন্তনী' :

প্রথম পাঠে এই 'চিরন্তনী'কে সম্বোধন করে কবি বলেছিলেন

ওগো চিরন্তনী
যখন তুমি থাকবে না
তখনো তুমি থাকবে আমার গানে।
বহুদিনের আমার নতুন কাল
আজ সহজে মিলেছে তোমার নতুন কালে।

অর্থাৎ, নিখিল যৌবনের রঙ্গভূমির নেপথ্যে যবনিকার ওপারে রয়েছে যে তরুণী সেই চিরন্তনীর উদ্দেশেই কবির গান। যখন সে থাকবে না তখনো সে থাকবে কবির গানে।

দ্বিতীয় পাঠে কবিতাটির ভাব যেন আমূল বদলে গেছে। কবিসত্তায় শিল্পীর

পাশে এসে বসেছে প্রেমিক। তাই প্রথম পাঠের শেষ পাঁচ পংক্তি আট পংক্তিতে সম্প্রসারিত হয়ে চিরন্তনী তরুণীর সঙ্গে কবির নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। প্রথম পাঠে কবিতাটির বিষয়ালম্বন ছিল শিল্পীর অমরতা। দ্বিতীয় পাঠের উপসংহারে তা হয়েছে প্রেমিকের অমরতা। কবিপ্রেমিক বলছেন :

ওগো চিরন্তনী,
আজ আমার বাঁশি তোমাকে বলতে এল,—
যখন তুমি থাকবে না তখনো তুমি থাকবে আমার গানে।
ডাকতে এলেম আমার হারিয়ে-যাওয়া পুরোনোকে
তার খুঁজে-পাওয়া নতুন নামে।
হে তরুণী,
আমাকে মেনে নিয়ো তোমার সখা বলে,
তোমার অন্যযুগের সখা।

এই পরিবর্তনে দুটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। কবিতায় এই প্রথম 'বাঁশি'র আবির্ভাব। কবিমাত্রেই বংশীবাদক, কিন্তু এই বাঁশি কবির বাঁশি নয়, প্রেমিকের বাঁশি। এই বাঁশির সংকেতেই কবি বলছেন :

ডাকতে এলেম আমার হারিয়ে-যাওয়া পুরোনোকে
তার খুঁজে-পাওয়া নতুন নামে।

এই পংক্তিমিথুনের সংযোজনে কবিতাটি মধুর রসে স্বাদনীয় হয়ে উঠেছে। অবশ্য প্রথম পাঠের শেষ দুই পংক্তি—'বহুদিনের আমার নতুন কাল / আজ সহজে মিলেছে তোমার নতুন কালে' দ্বিতীয় পাঠের চেয়ে অনেক বেশি ব্যঞ্জনাবহ ছিল। দ্বিতীয় পাঠে কবিতার শেষ চরণ দুটি হল . 'আমাকে মেনে নিয়ো তোমার সখা বলে, / তোমার অন্যযুগের সখা'। 'সঞ্চয়িতা'য় এই শেষ পংক্তির অনুসরণেই কবিতার নামকরণ করা হয়েছে 'তোমার অন্যযুগের সখা'। কিন্তু যে-তরুণী চিরন্তনী তার সখা 'অন্যযুগের' হবে কেন, সে তো সর্বযুগের।

৪

কবিতাটি রবীন্দ্র-কাব্যরসিক-সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের দাবি রাখে। কেননা এই ভাবানুষঙ্গ—কবির শিল্পিমানস ও কবিমানসের এই স্বপ্নকামনা—তাঁর প্রৌঢ়-মানসেরই চেতনা নয়, তাঁর যৌবনলগ্ন থেকেই এই চেতনা দেখা দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'চিত্রা'র '১৪০০ সাল' কবিতাটিকে মনে পড়বে। ১৪০০ সালের কল্পনা করে

প্রায় একশ' বছর আগে ( ১৩০২ ) কবিমানসে ভাবী কালের এক তরুণীর ছবি ভেসে উঠেছিল। কৌতূহলভরে কবির কাব্য-পাঠরতা সেই অনাগতাকে সম্বোধন করে কবি বলেছিলেন :

আজি নববসন্তের প্রভাতের আনন্দের
লেশমাত্র ভাগ—
আজিকার কোনো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান,
আজিকার কোনো রক্তরাগ—
অনুরাগে সিক্ত করি পারিব না পাঠাইতে
তোমাদের করে
আজি হতে শতবর্ষ পরে।

তবু কবি বলেছেন, হে তরুণী, তোমার নববসন্তের দিনে দক্ষিণ দ্বার খুলে বাতায়নে বসে ভেবে দেখো :

একদিন শতবর্ষ আগে
চঞ্চল পুলকরাশি কোন্ স্বর্গ হতে ভাসি
নিখিলের মর্মে আসি লাগে,
নবীন ফাল্গুন দিন সকল-বন্ধনহীন
উন্মত্ত অধীর,
উড়ায়ে চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণু গন্ধমাখা
দক্ষিণ সমীর,
সহসা আসিয়া ত্বরা রাঙায়ে দিয়েছে ধরা
যৌবনের রাগে,
তোমাদের শতবর্ষ আগে।

সেদিনকার সকল বন্ধনহীন যৌবনরাগরঞ্জিত নবীন ফাল্গুন দিনে

সেদিন উতলা প্রাণে, হৃদয় মগন গানে,
কবি এক জাগে—
কত কথা পুষ্পপ্রায় বিকশি তুলিতে চায়
কত অনুরাগে,
একদিন শতবর্ষ আগে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, 'অনুরাগ' কথাটি প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তবকে দুবার উচ্চারিত হয়েছে। প্রথম স্তবকে অনুরাগে সিক্ত করার কথা কবি বলেছিলেন,

দ্বিতীয় স্তবকে কত কথা কত অনুরাগে পুষ্পপ্রায় বিকশিত করে তোলার কথা বলেছেন। বলা প্রয়োজন, এ অনুরাগ প্রেমানুরাগ নয়, তা এই সূর্যকরে—এই পুষ্পিত কাননে—সুন্দর ভুবনের প্রতি কবির অনুরাগ। তৃতীয় স্তবকে কবির মুখ্য অভিলাষটি ব্যক্ত হয়েছে। তিনি বলছেন :

আজি হতে শতবর্ষ পরে

এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি

তোমাদের ঘরে!

আজিকার বসন্তের আনন্দ-অভিবাদন

পাঠায়ে দিলাম তার করে।

শতবর্ষ পরের বসন্তদিনের নূতন কবিকে কবি তাঁর বসন্তের আনন্দ-অভিবাদন পাঠাচ্ছেন। 'আনন্দ-অভিবাদন' কথাটি এখানে অভিনব ব্যঞ্জনা পেয়েছে। 'অভিবাদন' এবং 'অভিনন্দন' প্রায়-সমার্থক হলেও এখানে অভিনন্দন কথাটিই হয়ত অধিকতর প্রয়োগসিদ্ধ হত। কিন্তু 'অভিবাদন' কথার মধ্যে অতিসূক্ষ্ম একটি বেদনাবোধ অনুস্যূত হয়ে আছে। কবির আনন্দিত চিত্ত অনাগত কালের তরুণ কবিকে ['তরুণ' অর্থেই এখানে 'নূতন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে] অভিবাদন জানাচ্ছেন। কেননা সেদিন 'আমি' থাকবো না, তাই তোমাদের কালের কবির হাতেই আনন্দিত চিত্তের জীবনানুরাগ তোমাকে পাঠালাম—

আমার বসন্তগান তোমার বসন্তদিনে

ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে—

হৃদয়স্পন্দনে তব, ভ্রমরগুঞ্জনে নব,

পল্লবমর্মরে

আজি হতে শতবর্ষ পরে।

বলাই বাহুল্য, এখানে বিশুদ্ধ কবিসত্তার অভিলাষই ভাষা পেয়েছে। 'সোনার তরী'র 'পুরস্কার' কবিতায় তরুণ রবীন্দ্রনাথ কবিকর্মের স্বরূপ বর্ণনা করে বলেছিলেন :

ধরণীর তলে গগনের গায়

সাগরের জলে অরণ্যছায়

আরেকটুখানি নবীন আভায়

রঙিন করিয়া দিব।

সংসার-মাঝে কয়েকটি সুর

রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর—
তার পরে ছুটি নিব।

তার ফল কি হবে?—

'সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতল
আরো আপনার হবে।
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে,
আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ 'পরে
শিশিরের মত রবে।

অর্থাৎ, কবির কাজ হল পৃথিবীর সৌন্দর্যকে আরেকটু সুন্দর করে রেখে যাওয়া, মানুষের সুখদুঃখকে আরো উজ্জ্বল আরো মধুর ক'রে তোলা, যার ফলে 'স্নেহ-সুধামাখা মানুষের বাসগৃহতল' তার 'আরো আপনার হবে।' শুধু নিজের কালের জন্যই নয়, অনাগত কালের মানুষের জন্যও এই হল অবশ্যকরণীয় কবিকৃত্য। এই কবিকৃত্যই অনাগত কালের জীবনকে অনুরাগে রঞ্জিত করবে—এই প্রতীতিই উচ্চারিত হয়েছে '১৪০০ সাল' কবিতায়।

৫

চিত্রার '১৪০০ সাল' কবিতায় কবি তাঁর শতবর্ষ পরের কৌতূহলী যে পাঠিকার কাছে আবেদন জানিয়েছেন তার সঙ্গে কবির ব্যক্তিসত্তার কোনো সম্পর্ক নেই। সে শুধু কাব্যরসিকা। কবিকে নয়, তাঁর কাব্যকে যিনি ভালবাসেন তাঁর উদ্দেশেই কবির কাব্য নিবেদিত। এই ভাবটি পরিস্ফুট হয়েছে কবির আটষট্টি বৎসর বয়সে প্রকাশিত 'মহুয়া'র উৎসর্গ-কবিতায়। তাতে কবি বলছেন :

শুধায়োনা, কবে কোন্ গান
কাহারে করিয়াছিনু দান।
পথের ধূলার 'পরে
পড়ে আছে তারি তরে
যে তাহারে দিতে পারে মান।

তুমি কি শুনেছ মোর বাণী,
হৃদয়ে নিয়েছ তারে টানি' ?
জানিনা তোমার নাম,
তোমারেই স'পিলাম
আমার ধ্যানের ধনখানি ॥

যিনি কবির বাণী শুনেছেন, তাকে হৃদযে গ্রহণ করেছেন, তাঁকেই কবির 'ধ্যানের ধনখানি' সমর্পিত। দুই স্তবকের এই উৎসর্গের পুরোভাগে আরো দুটি স্তবক ছিল। সিঙ্গাপুর থেকে নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা কবির ৬ অক্টোবর ১৯২৭ তারিখের চিঠিতে সেই দুটি স্তবকের সন্ধান পাওয়া যায়। তাতে কবি বলছেন :

ফুল ছিঁড়ে নিযে যায় হাওযা—
সে পাওয়া তাহার মিথ্যা পাওযা।
আনমনে একবার
বহিযা পুষ্পের ভার
ধূলায ছড়িযে দিযে যাওযা ॥

যে সেই ধূলায-পড়া ফুলে
হার গাঁথে, লয তারে তুলে
হেলা হতে নিমেষেই
সে ফুলেরে পায সেই,
মুকুট করিযা পরে চুলে ॥[৩]

নির্মলকুমারীকে লেখা এই চিঠির এই দুই স্তবকের পরেই আছে 'শুধায়োনা, কবে কোন গান / কাহারে করিয়াছিনু দান,' ইত্যাদি। অর্থাৎ, যিনি কবির কবিতাকে ভালবাসেন তাঁর উদ্দেশেই কবির কবিতা সমর্পিত।

এই 'স্বপনমুরতি গোপনচারী' কবিসত্তার সঙ্গে কবির ব্যক্তিসত্তার যে কোনো যোগ নেই একথাও বলা যাবে না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে 'পূরবী' কাব্যে সংকলিত কবির চৌষট্টি বৎসর বয়সে লেখা [ আণ্ডেস জাহাজ, ৪ নভেম্বর, ১৯২৪ ] 'ভাবী কাল' কবিতাটি। তাতে কবি 'ভাবী দূর শতাব্দীর' সপ্তদশীকে সম্বোধন করে বলছেন :

ক্ষমা ক'রো, যদি গর্বভরে
মনে মনে ছবি দেখি,—মোর কাব্যখানি লয়ে করে
দূর ভাবী শতাব্দীর অয়ি সপ্তদশী
একেলা পড়িছ তব বাতায়নে বসি।

... ... ...

হয়তো উঠিছে বক্ষ নেচে
হয়তো ভাবিছ, "যদি থাকিত সে বেঁচে,
আমারে বাসিত বুঝি ভালো।"
হয়তো বলিছ মনে, "সে নাহি আসিবে আর কভু,
তারি লাগি তবু
মোর বাতায়নতলে আজ রাত্রে জ্বালিলাম আলো।"

'চিত্রা'র '১৪০০ সাল' কবিতার সঙ্গে 'পূরবী'র এই 'ভাবী কাল' কবিতার তুলনা করলেই বুঝতে পারা যাবে, দ্বিতীয় কবিতায় কবির কবিসত্তার পাশে তাঁর ব্যক্তিসত্তাও যুক্ত হয়েছে।

একাত্তর বৎসর পেরিয়ে ১০ ভাদ্র ১৩৩৯ তারিখে লেখা 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'পত্র' কবিতাটিও এই সঙ্গে স্মরণীয়। কবি তাঁর কোনো অনুরাগিণীকে তাঁর একখানি কবিতার বই উপহার দিয়ে ওই কবিতাটি লিখেছিলেন। কবিতার শেষে অভিমানের সুরে কবি বলছেন :

জন্মেছি ছাপার কালিদাস হয়ে।
তোমরা আধুনিক মালবিকা,
কিনে পড় কবিতা
আরামকেদারায় বসে।
চোখ বুজে কান পেতে শোন না ;
শোনা হলে
কবিকে পরিয়ে দাও না বেলফুলের মালা,
দোকানে পাঁচসিকে দিয়েই খালাস।[৪]

এই 'পত্রে'র শেষ দুটি পংক্তি কবির ব্যক্তিসত্তারই অভিমান। 'পুরস্কার' কবিতায় কবি 'রাজকণ্ঠের মালা'কেই তাঁর কাব্যরচনার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার মনে করেছিলেন। কিন্তু 'ছাপার কালিদাস' হয়ে জন্মানোর দুর্ভাগ্যের ফলে কাব্যানুরাগিণীকে কবিতা শুনিয়ে প্রতিদানে বেলফুলের মালা পাওয়ার হৃদয়দৌর্বল্য চরিতার্থ হওয়ার কোনো

উপায় নেই। দোকানে পাঁচসিকে দিয়েই এযুগে কবির কাব্যগ্রন্থ কিনতে পাওয়া যায়। তাতে লেখকের সঙ্গে পাঠকপাঠিকার হৃদয়সংবাদের কোনোই সুযোগ নেই। কবির ব্যক্তিসত্তার এই অভিমান স্বাভাবিক বলেই মানবিক।

৬

এই ব্যক্তিসত্তার অন্তরতর পরিচয় হল কবির প্রেমিক-সত্তা। আমরা বলেছি, মানসীর 'তবু' কবিতায় ব্যক্তিগত প্রেমের সূত্রেই 'মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করিতেছে।' সেদিন রবীন্দ্রনাথ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। অন্তত, একজীবনের জন্মমৃত্যুর সীমানায় জীবনের লীলা যে অবসিত হয় না, এ বিশ্বাস কবিজীবনের অন্তিম স্তরেও পরিলক্ষিত হয়। প্রথম জীবনে, মানসীর যুগে, কবি বিশ্বাস করেছেন প্রেম ত্রিকালপ্লাবী। 'অনন্ত প্রেম' কবিতায় বলেছেন :

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি-কালের হৃদয়-উৎস হতে।[৫]

অনাদি-কালের হৃদয়-উৎস হতে ভেসে-আসা এই যুগল-প্রেমের স্রোত 'পুরাতন' হয়েও 'নিত্য-নূতন'। প্রেমের এই নিত্যনবীনতা স্মৃতির সরণীতেই কবিমানসে প্রত্যক্ষকল্প হয়ে ওঠে। 'কড়ি ও কোমলে'র 'স্মৃতি' কবিতাটির কথা এই সূত্রে মনে পড়বে :

ওই দেহ পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্বজনমের স্মৃতি।
সহস্র হারানো সুখ আছে ও নয়নে,
জন্মজন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।
যেন গো আমারি তুমি আত্মবিস্মরণ,
অনন্তকালের মোর সুখ দুঃখ শোক,
কত নব জগতের কুসুম-কানন,
কত নব আকাশের চাঁদের আলোক।[৬]

এই ছন্দচতুর্দশীতে কবি এই জন্মের প্রিয়ার মধ্যেই 'কত শত পূর্বজনমের স্মৃতি'-সুধা আস্বাদন করেছেন। এই স্মৃতির সরণী বেয়েই কবি খুঁজে পেয়েছেন শিপ্রা নদী-

পারে তাঁর পূর্বজন্মের প্রথমা প্রিয়াকে। 'কল্পনা'র 'স্বপ্ন' কবিতাটিতে কবির সেই 'জননান্তরসৌহৃদানি'র কথা অপূর্বতায় অনবদ্য।

এই কবিতায় দেখা যাচ্ছে কবি উজ্জয়িনীর 'শিপ্রা নদীপারে' তাঁর পূর্বজন্মের প্রথমা প্রিয়ার সন্ধানে স্বপ্নাভিসারে বেরিয়েছিলেন। বসন্তের দিনে দূরে বহুদূরে পথ চিনে চিনে অবশেষে তিনি উপনীত হয়েছিলেন 'মহাকাল মন্দিরের মাঝে'। কবিকে সেখানে পৌছে দিয়েছিলেন 'মেঘদূতে'র কবি কালিদাস। মন্দাক্রান্তা-ছন্দের কুটিলাবর্তে জননান্তর স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল কবির মনে।

'মহাকাল-মন্দিরের মাঝে / তখন গম্ভীর মন্দ্রে সন্ধ্যারতি বাজে'।[৭] 'জনশূন্য পণ্যবীথি,– ঊর্ধ্বে যায় দেখা / অন্ধকার হর্ম্যপরে সন্ধ্যারশ্মিরেখা'।[৮]

'প্রিয়ার ভবন / বঙ্কিম সংকীর্ণ পথে দুর্গম নির্জন।' 'দ্বারে আঁকা শঙ্খ চক্র, তারি দুই ধারে / দুটি শিশু নীপতরু পুত্রস্নেহে বাড়ে।'[৯]

প্রিয়ার কপোতগুলি ফিরে এল ঘরে,
ময়ূর নিদ্রায় মগ্ন স্বর্ণদণ্ড 'পরে।[১০]
হেনকালে হাতে দীপশিখা
ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা।

প্রিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের পর তার চোখে ফুটে উঠল নীরব জিজ্ঞাসা—'হে বন্ধু, আছ তো ভালো?' কবি তার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা খুঁজে পেলেন না·

সে-ভাষা ভুলিয়া গেছি,—নাম দোঁহাকার
দুজনে ভাবিনু কত,—মনে নাহি আর।
দুজনে ভাবিনু কত চাহি দোঁহাপানে
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে।

কিন্তু নাম-না জানা পূর্বজন্মের সেই প্রিয়ার সঙ্গে মিলন যেন দুজনের অজ্ঞাতসারেই ঘটল—

নাহি জানি কখন কী ছলে
সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি
আমার দক্ষিণ করে,—কুলায়-প্রত্যাশী
সন্ধ্যার পাখির মতো; মুখখানি তার
নতবৃন্ত পুষ্পসম এ বক্ষে আমার
নমিয়া পড়িল ধীরে ;—ব্যাকুল উদাস
নিঃশব্দে মিলিল আসি নিশ্বাসে নিশ্বাস।

কবিতার অন্তিম স্তরে সমৃদ্ধিমান স্বপ্নসম্ভোগের ব্যঞ্জনা ভাষা পেয়েছে তিনটি সংকেতে। ১. 'রজনীর অন্ধকার / উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার'। ২. 'দীপ দ্বারপাশে / কখন নিভিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে।' ৩. 'শিপ্রা নদীতীরে / আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে'। প্রথম দুটি সংকেতে আছে মিলনের অনুকূল অন্ধকার পরিবেশ। তৃতীয় সংকেতে কালাতিক্রমণের ব্যঞ্জনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কবি একবার বলেছেন 'হেনকালে হাতে দীপশিখা / ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা'। তারপরেই বলছেন, 'নাম দোঁহাকার / দুজনে ভাবিনু কত,—মনে নাহি আর।' কিন্তু জন্মান্তরের কবি-অনুরাগিণী মাত্রেরই নাম 'মালবিকা' বলে গ্রহণ করলে এই আপাত-বিরোধের নিরসন ঘটে। 'ক্ষণিকা'র 'সেকাল' কবিতায় কবি বলছেন:

আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে
বন্দি হতেম না জানি কোন্
মালবিকার জালে।১১

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'পত্র' কবিতায়ও কবি বলছেন, 'জন্মেছি ছাপার কালিদাস হয়ে। / তোমরা আধুনিক মালবিকা, / কিনে পড় কবিতা / আরামকেদারায় বসে'। এ থেকে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে যে, 'মালবিকা' ত্রিকালপ্লাবী প্রেমে কবিপ্রিয়ার সাধারণ নাম।

ক্ষণিকার 'সেকাল' কবিতায় পূর্বজন্মের স্মৃতি কালিদাসের কাব্য থেকেই রবীন্দ্রমানসে নেমে এসেছে। 'মানসী'র 'একাল ও সেকাল' কবিতায় কালিদাসের যক্ষপ্রিয়া এবং বৈষ্ণবের রাধা—প্রেমের স্বকীয়া ও পরকীয়া, দুটি ধারাই একালের কবিমানসে উজ্জীবিত হয়েছে:

যক্ষনারী বীণাকোলে ভূমিতে বিলীন,
বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ,
অযত্ন-শিথিল বেশ।
সেদিনো এমনিতর অন্ধকার দিন।

... ... ...

এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে।
এখনো প্রেমের খেলা,

সারা দিন, সারা বেলা
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটিরে।১২

মানসীর 'একাল ও সেকাল' কবিতা লেখা হয় ২১ বৈশাখ, ১৮৮৮। কবির বয়স তখন সাতাশ বৎসর। এই কবিতায় সেকাল যে একালেও বেঁচে আছে তার সাক্ষী কবির স্বীকৃতিবচন : 'এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটিরে'। কবির পঁচাত্তর বৎসর বয়সে লেখা 'স্বপ্ন' কবিতায় [ ৩০ মে, ১৯৩৬ ] 'তিন-শ বছর আগেকার / কবির জানা সেই বাঙালির মেয়েকে' মনে পড়ছে। সেও রাধা, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মহাভাবস্বরূপিণী হ্লাদিনীপ্রতিমা নয়। 'সোনার তরী'র 'বৈষ্ণব কবিতা'য় কবি বলেছিলেন :

সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।
… . এত প্রেমকথা,
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে।১৩

কবির জানা যে বাঙালি মেয়ের আদলে রাধার ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে 'শ্যামলী'র 'স্বপ্ন' কবিতায় কবি সেই বাঙালি মেয়েকেই স্মরণ করে বলছেন :

মনে পড়ছে ওই পদটা—
"রজনী শাঙন ঘন, ঘন-দেয়া গরজন…
স্বপন দেখিনু হেনকালে।"
সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে
কবির চোখের কাছে
কোন্ একটি মেয়ে ছিল,
ভালোবাসার-কুঁড়ি-ধরা তার মন।
মুখচোরা সেই মেয়ে,
চোখে কাজল পরা,

ঘাটের থেকে নীলশাড়ি
'নিঙাড়ি-নিঙাড়ি' চলা।

কবির কামনা :

আজ এই ঝড়ো বাতে
তাকে মনে আনতে চাই—
তাব সকালে, তাব সাঁঝে,
তার ভাষায, তাব ভাবনায,
তাব চোখের চাহনিতে,—
তিন-শ বছর আগেকার
কবিব জানা সেই বাঙালিব মেয়েকে।

কিন্তু আক্ষেপের সুরে কবি বলছেন 'তাকে দেখতে পাইনে স্পষ্ট করে'। সেই মেয়ে একালিনী মালবিকাদের ছায়ায় ঢাকা পড়েছে।

তবু--"রজনী শাঙন ঘন —
স্বপন দেখিনু হেনকালে।"
শ্রাবণের রাত্রে এমনি করেই বয়েছে সেদিন
বাদলের হাওয়া,
মিল রয়ে গেছে
সেকালেব স্বপ্নে আর একালেব স্বপ্নে।

সেকালেব স্বপ্নে আব একালেব স্বপ্নে মিল আছে বলেই 'অনেক দিনেব পুরোনো এক নতুন কালেব' কবির 'আমি', যুগল-প্রেমের স্রোতে 'চিরকালেব আমি' হয়ে বেঁচে থাকবে। ভাবী কালেব 'তরুণী'ও অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতেব 'চিরন্তনী'। 'ওগো তরুণী' কবিতায় তাই কবিব শিল্পিমানস আর প্রেমমানস শেষপর্যন্ত একসূত্রে মিলিত হয়েছে। প্রথম পাঠে 'ওগো তরুণী'তে '১৪০০ সাল' কবিতার মতো কবিব শিল্পিমানসেব অমরতাই প্রার্থনীয় ছিল। কিন্তু পরিশোধিত দ্বিতীয় পাঠে কবিব শিল্পিমানসের সঙ্গে মিলিত হয়েছে তাঁব ব্যক্তিগত প্রেমমানস। তাই পরিশোধিত পাঠে চিরন্তনী তরুণীব মধ্যে তিনি তাঁর প্রেমের দোসরকেই খুঁজে পেয়েছেন। কালিদাসের যক্ষপ্রিয়া এবং বৈষ্ণব কবির রাধা তাঁর বাসনাব সংস্কারকেই উজ্জীবিত করে চিরন্তন প্রেমকে আস্বাদ্যমান করে তুলেছে। তাই শুধু শিল্পের সূত্রেই নয়, প্রেমের সূত্রেও কবিব 'অমরতার প্রার্থনা' পূর্ণ হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে 'চিত্রা'র 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটি মনে পড়বে। এই কবিতায় কবি বলছেন,

…বাঁশরির ব্যথাপূর্ণ তান
কুঞ্জে কুঞ্জে তরুছায়ে করিছে সন্ধান
হৃদয়সাথিরে—হাত ধরে মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্যের সে নন্দনভূমি
অমৃত-আলয়ে। সেথা আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয় যৌবনময় দেবতা সমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী।

উদ্ধৃতাংশের 'অমৃত-আলয়ে' পদটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'কড়ি ও কোমলে'র কবিতায় কবি বলেছিলেন, মানুষের হাসি-অশ্রুময় সুখে-দুঃখে-গড়া জীবন-সংগীত রচনা করলে এই মরলোকে 'অমর-আলয়' প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এই জীবন-সংগীত রচনা কবির কাজ। অর্থাৎ কাব্য কবিকে 'অমর-আলয়ে' প্রতিষ্ঠিত করে; আর প্রেম কবিকে নিয়ে যায় 'অমৃত-আলয়ে'। দুটি পদই অমরতার অর্থবহ, কিন্তু অমৃত শব্দ-প্রয়োগে অমরতা মধুময় হয়ে উঠেছে। 'ওগো তরুণী' কবিতায় কবির 'অমর আলয়' আর প্রেমিকের 'অমৃত আলয়' একত্র মিলিত হয়েছে। তাই চিরন্তনী তরুণীকে সম্বোধন করে কবিপ্রেমিক বলছেন:

আজ আমার বাঁশি তোমাকে বলতে এল,—
যখন তুমি থাকবে না তখনো তুমি থাকবে আমার গানে।

অধিকন্তু, 'চিত্রা'র 'স্বপ্ন' কবিতা শ্যামলার 'ওগো তরুণী'তে এসে যেন পূর্ণতা পেয়েছে। 'স্বপ্ন' কবিতায় দুজনে দুজনের নাম ভুলে গিয়েছিলেন। 'ওগো তরুণী'তে সেই হারানো নামও তিনি খুঁজে পেয়েছেন। বলছেন:

ডাকতে এলেম আমার হারিয়ে-যাওয়া পুরোনোকে
তার খুঁজে-পাওয়া নতুন নামে।

এখানে 'মানসী'-যুগের অনন্ত প্রেমের ভাবানুষঙ্গ কবির প্রৌঢ়মানসে নতুন প্রতীতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমরা আলোচনার প্রথমেই বলেছিলাম, মানুষের ভালবাসাই শিল্পগোত্র মানুষের পরম কামনার ধন। কাজেই শিল্পের-মধ্য দিয়ে যখন শিল্পী 'মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করে' তখন শিল্প-

চেতনার মর্মমূলে অনুস্যূত থাকে শিল্পীর প্রেমচেতনা। রবীন্দ্রমানসের শিল্প-চেতনা ও প্রেমচেতনা 'ওগো তরুণী' কবিতায় একসূত্রে গ্রথিত হয়েই মৃত্যুশাসিত মর্ত্যালোকে 'মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতার প্রার্থনা' অভূতপূর্ব সার্থকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

## উল্লেখপঞ্জী


১. 'সাহিত্যের সামগ্রী', সাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী ( বিশ্বভারতী )-৮, পৃ. ৩৪৫।
২. গীতবিতান, প্রেম পর্যায়ের ১৫১-সংখ্যক গান, পৃ. ৩৩০।
৩. দ্রষ্টব্য, 'দেশ', ২৮ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ২৩ পৌষ ১৩৬৭। 'স্ফুলিঙ্গে'র ১৪৭-সংখ্যক কবিতায় ঈষৎ-ভিন্ন ছন্দে তিন স্তবকে গ্রথিত এর আরেকটি রূপ আছে। দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্ররচনাবলী ( পশ্চিমবঙ্গ সরকার )-৪, সং ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ৯০৪।
৪. দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্ররচনাবলী-১৬, পৃ. ১৮-২০।
৫. দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্ররচনাবলী-২, পৃ. ২৫৪।
৬. দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্ররচনাবলী-২, পৃ. ৮২।
৭. তুলনীয়, মেঘদূত, পূর্বমেঘ/৩৫।
৮. তুলনীয়, মেঘদূত, পূর্বমেঘ/৩৮।
৯. তুলনীয়, মেঘদূত, উত্তরমেঘ/১৯, ১৪।
১০. তুলনীয়, মেঘদূত, উত্তরমেঘ/১৪।
১১. দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্ররচনাবলী-৭, পৃ. ২৪৭।
১২. দ্রষ্টব্য, র-র-২, পৃ. ১৪০।
১৩. দ্রষ্টব্য, র-র-৩, পৃ. ৪১-৪২।


মুদ্রণপ্রমাদ

'ওগো তরুণী' প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠার [ পৃষ্ঠা ১২৫ ] পংক্তি বারোতে ছাপা হয়েছে 'কমনীয়', হবে 'কামনীয়'। ষোলো পংক্তিতে ছাপা হয়েছে মানবের সুখদুঃখে গাঁথিয়া সংগীত', হবে 'মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত।'

# একজন লোক

১

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁর কবিতাব ছুটি নির্বাচিত সংকলন প্রকাশিত হয়: 'চয়নিকা' আর 'সঞ্চয়িতা'। চয়নিকার প্রকাশ ১৯০৯ সালে। কবির বয়স তখন ৪৮ বৎসর। কবিব সঙ্গে পবামর্শ ক'রে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও অজিতকুমার চক্রবর্তী 'চয়নিকা'র কবিতাগুলি নির্বাচন কবেন। এতে ১৩৬টি কবিতা ছিল, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৫৯। কবিতাগুলিকে কবিমানস, উতলা, বসরূপ, রূপক, বিশ্বপ্রকৃতি, মানব, কণিকা, অতীত, কথা, ভূমা, পরিণাম, গান— এই দ্বাদশটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়।[১]

পরবর্তীকালে চয়নিকার নতুন সংস্কবণ হয় মূলত ববীন্দ্র-রসিক-সমাজের অভিমতেব ভিত্তিতে। ফাল্গুন ১৩৩২-এব সংস্করণে চয়নিকার 'পাঠপরিচয়ে' প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখছেন, 'কিছুদিন আগে, ববীন্দ্রনাথেব ২০০টি ভালো কবিতা বাছিয়া দিবার জন্য, বিশ্বভাবতী গ্রন্থালয হইতে একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় ৩২০ জন পাঠক যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভোটসংখ্যা দ্বারা কবিতাগুলির জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়া যায়।

'বর্তমান সংস্করণ চয়নিকা মোটামুটি এই লোকপ্রিয়তা অনুসারে সংকলন কবা হইয়াছে। সূচি-পত্রে প্রত্যেকটি কবিতাব পাশে তাহার ভোটসংখ্যা উল্লেখ করা হইল। আমরা কিন্তু শুধু ভোটসংখ্যা দিয়া বাছাই করি নাই। প্রত্যেকটি প্রচলিত বই হইতে যাহাতে কিছু কিছু কবিতা থাকে, এবং কোনো বিশেষ সময় বা বিশেষ ধরণের লেখা যাহাতে একেবারে বাদ না পড়ে সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি।...

'এই গ্রন্থে, কণিকার কবিতা ছাড়া অন্য সমস্ত কবিতাগুলি কালক্রমানুসারে সাজাইবার চেষ্টা কবা হইয়াছে।'...

'গান ও নাটক বাদ দিয়া, রবীন্দ্রনাথের কবিতার সংখ্যা প্রায় ১২০০ হইবে। এর আগের সংস্করণ চয়নিকায় তাহার মধ্যে মোট ১৩৬টি কবিতা ছিল; এবার ২০৮টি কবিতা দেওয়া হইল।'

চয়নিকার এই নতুন সংস্করণ 'পূরবী' পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। পৃষ্ঠাসংখ্যা

৫২৪। পাঠপরিচয়ের শেষ অনুচ্ছেদে প্রশান্তচন্দ্র জানিয়েছেন, 'কবির নিজের ইচ্ছা ছিল না যে 'মানসী'র আগেকার (অর্থাৎ ১২৯৩ সালের পূর্বের) লেখা কোনো কবিতা চয়নিকায় স্থান পায়। ...এ বিষয়ে বাঙ্‌লা দেশের পাঠকবর্গ কবির সহিত একমত নহেন। আমরা পাঠকবর্গের মত অনুসারেই চয়নিকা সংকলন করিতে চেষ্টা করিয়াছি।'

রবীন্দ্রনাথের কবিতার দ্বিতীয় নির্বাচিত সংকলন 'সঞ্চয়িতা' প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ সালের পৌষ মাসে। কবির বয়স তখন সত্তর পেরিয়ে একাত্তর চলছে। 'ভূমিকা'য় কবি জানিয়েছেন, 'সঞ্চয়িতাব কবিতাগুলি সংকলনের ভার আমি নিজে নিয়েছি।'

সঞ্চয়িতার তিনটি সংস্করণ কবির জীবিতকালে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৪০, তৃতীয় সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৪৪। এই সংস্কবণই পুনর্মুদ্রিত হয় ১৩৪৬ সালের বৈশাখে। তৃতীয় সংস্করণে 'শ্যামলী' পর্যন্ত কবিতা নির্বাচিত হয়েছে, এবং সাময়িকপত্র থেকে (মাঘ ১৩৪৩) 'আফ্রিকা' কবিতাটি যোজনা করে নির্বাচন সমাপ্ত হয। কবির তিরোধানের পব [শ্রাবণ ১৩৪৮] সঞ্চয়িতার চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয় চৈত্র ১৩৫০, কার্তিক ১৩৫১ এবং জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩ সালে। চতুর্থ সংস্করণের 'বিজ্ঞপ্তি'তে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন, 'সঞ্চয়িতা'র শেষ সংস্করণের [তৃতীয় সংস্কবণ] পর কবির যে-সমস্ত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি হইতে কবিতা চয়ন করিয়া সংযোজন-রূপে দেওয়া হইল। · সঞ্চয়িতার বর্তমান সংস্করণ প্রস্তুত করার ভার শ্রীকানাই সামন্তব উপর অর্পিত হইয়াছিল।'[২]

'সঞ্চয়িতা'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'এ-রকম সংকলন কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না। মনের অবস্থা-পরিবর্তন হয়, মনোযোগের তারতম্য ঘটে। অবিচাব না হয়ে যায় না।'

'চয়নিকা'র প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু 'সঞ্চয়িতা'য় যে-সব কবিতার প্রতি 'অবিচার' হয়েছে তার অন্যতম হল 'একজন লোক'। 'পুনশ্চ'র এই কবিতাটির প্রতি কবি নিজেই অবিচার করেছেন। কবিতাটিকে 'সঞ্চয়িতা'য় স্থান দেন নি। অবশ্য, 'একজন লোকে'র কাব্যোৎকর্ষ সম্পর্কে কবি যে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন তার একটি প্রমাণের উল্লেখ করা যেতে পারে। 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থ থেকে তিনি যে দুটি কবিতা ইংরেজিতে নিজে অনুবাদ করেন সে দুটি হল 'কোপাই' ও 'একজন লোক'।[৩]

২

'একজন লোক'-এর মধ্যে কবির যে-বেদনা প্রকাশিত হয়েছে তার আভাস তাঁর শেষজীবনের একাধিক কবিতায় পাওয়া যাচ্ছে। তার মধ্যে বিশেষ করে দুটি কবিতার উল্লেখ করছি। প্রথমটি হল 'নবজাতকে'র 'এপারে-ওপারে', দ্বিতীয়টি 'জন্মদিনে'র 'ঐকতান'। 'এপারে-ওপারে' কবিতাটি ১৩৪৬ সালের ২০ বৈশাখ পুরীতে লেখা। অর্থাৎ কবির মর্ত্য থেকে বিদায় নেওয়ার সোওয়া-দুই বৎসর পূর্বে কবিতাটি রচিত। কবি বলছেন :

রাস্তার ওপারে
বাড়িগুলো ঘেঁষাঘেঁষি সারে সারে।
ওখানে সবাই আছে
ক্ষীণ যত আড়ালের আড়ে-আড়ে কাছে-কাছে।
.. ... ..
প্রাণের প্রবাহে ভেসে
বিবিধ ভঙ্গীতে ওরা মেশে।
... ... ...
রাস্তার এপারে আমি নিঃশব্দ দুপুরে
জীবনের তথ্য যত ফেলে রেখে দূরে
জীবনের তত্ত্ব যত খুঁজি
নিঃসঙ্গ মনের সঙ্গে যুঝি,
সারাদিন চলেছে সন্ধান
দুরূহের ব্যর্থ সমাধান।
... ... ...
ভাবি এই কথা—
ওইখানে ঘনীভূত জনতার বিচিত্র তুচ্ছতা
এলোমেলো আঘাতে সংঘাতে
নানা শব্দ নানা রূপ জাগিয়ে তুলেছে দিনরাতে।
কিছু তার টেঁকে নাকো দীর্ঘকাল,
মাটিগড়া মৃদঙ্গের তাল
ছন্দটারে তার
বদল করিছে বারংবার।

তারি ধাক্কা পেয়ে মন
ক্ষণে-ক্ষণ
ব্যগ্র হয়ে ওঠে জাগি
সর্বব্যাপী সামান্তের সচল স্পর্শের লাগি।
আপনার উচ্চতট হতে
নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে।[৪]

এই কবিতায় কবির নিঃসঙ্গতা বোধই ভাষা পেয়েছে। আক্ষেপ করে তিনি বলছেন 'জীবনের তথ্য যত ফেলে রেখে দূরে / জীবনের তত্ত্ব যত খুঁজি।' কিন্তু 'সর্বব্যাপী সামান্তের' জীবনে 'মাটিগড়া মৃদঙ্গের তাল / ছন্দটারে তার / বদল করিছে বাবংবার'। কবি সেই নিয়তপরিবর্তনশীল সর্বব্যাপী সামান্তের স্পর্শ-লাভেব জন্য ব্যগ্র হয়েও তা থেকে বঞ্চিত, কেন না 'আপনার উচ্চতট হতে / নামিতে পাবে না সে যে সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে।'

এই অক্ষমতার জন্য কবিতায় কবিমানসের বেদনার সংবাদ আছে, কিন্তু বেদনার সঞ্চার নেই। নেই, কেন না এখানে কবির অনুভূতি নয়, কবির চিন্তাই মুখ্য। চিন্তা না বলে আত্মচিন্তা বলাই সমীচীন। প্রজ্ঞাপ্রবীণ দার্শনিকরা বলেন 'We think in terms of universals, but we feel particulars'.[৫] অর্থাৎ মানুষেব চিন্তা 'সামান্য'কে নিয়ে, মানুষের উপলব্ধি 'বিশেষকে' নিয়ে। 'সামান্য' শব্দটি 'যুনিভার্সাল' অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য 'সর্বব্যাপী সামান্য' বলতে সার্বজনিক তুচ্ছতাই বুঝিয়েছেন।

'বেদনা'কে যদি বৌদ্ধ পারিভাষিক অর্থে সম্প্রসারিত কবা যায় তাহলে সুখবেদনাও বেদনা, দুঃখবেদনাও বেদনা। অর্থাৎ 'ফিলিং'-মাত্রকেই 'বেদনা' বলা যেতে পারে। বিশুদ্ধ গীতিকবিতা কিন্তু সুখবেদনা এবং দুঃখবেদনা দিয়েই গড়ে ওঠে না, যদিও ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাষায় গীতিকবিতা হল Emotions recollected in tranquillity'. তবু একথা স্বীকার কবতেই হবে যে অনুভূতির সঙ্গে অভিজ্ঞতাও থাকা চাই। অথবা, সার্বজনিক জীবনের অভিজ্ঞতা-জাত উপলব্ধি যখন বহির্লোকের নয়, কবির অন্তর্লোকের সত্য হয়ে ওঠে, তখনই তা কাব্য-রচনার উপাদানে পরিণত হয়। এই সম্পর্কে রিল্‌কের উক্তি স্মরণীয়। তিনি বলছেন,

Verses are not, as people imagine, simply feelings, they are experiences. In order to write a single verse, one must see many

cities, and men and things...... Only when they have turned to blood in us, to glance and gesture, nameless and no longer to be distinguished from ourselves—only then can it happen that in a most rare hour the first word of a poem arises in their midst and goes forth from them.[৬] অর্থাৎ, অভিজ্ঞতা-জাত উপলব্ধি যখন অবিচ্ছেদ্য-ভাবে কবিসত্তার অঙ্গীভূত হয়ে ওঠে—রিল্‌কের ভাষায়—১. 'Only when they have turned to blood in us' এবং ২. 'no longer to be distinguished from ourselves', তখনই সত্যকার কবিতার জন্ম হয়। অবশ্য এই উপলব্ধির সংবাদ লিপিবদ্ধ করাই কবিতা নয়, রসিকচিত্তে তা সঞ্চারিত করার যোগ্য ভাষাপ্রকাশই কবিতা।

'নবজাতকে'র 'এপারে-ওপারে' কবিতায় উপলব্ধির আন্তরিকতা নিশ্চয়ই স্বীকার্য, কিন্তু কবিতার শেষাংশে কবি 'সর্বব্যাপী সামান্যের সচল স্পর্শের' জন্য যে ব্যগ্রতার কথা বলেছেন তাতে বেদনা আভাসিত, কিন্তু কবিভাষিত নয়। তাই শেষ দুটি চরণ সার্বজনিক জীবনের সঙ্গে মিলিত হতে না-পারার হেতু নৈয়ায়িক কার্য-কারণ-সূত্রে গ্রথিত হয়েছে মাত্র—'আপনার উচ্চতট হতে / নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে'। 'সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে' অবশ্যই বৈদগ্ধ্যভঙ্গিভণিতি। কিন্তু তা বেদনাবিদ্ধ সত্তার রক্তক্ষরণের সাক্ষ্য বহন করে না।

৩

'জন্মদিনে'র 'ঐকতান' কবিতাটিও কবির অকৃত্রিম আত্মকথা। মর্ত্য থেকে বিদায় নেবার মাত্র ছ'মাস আগে, ২১ জানুয়ারি ১৯৪১-এ লেখা এই কবিতাটি কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থের একটি বিশিষ্ট রচনা। 'ঐকতান'কে বলা যেতে পারে ভাবিকালের কাছে কবির অন্তিম মহাসনদ। যৌবনলগ্নে 'বসুন্ধরা'র কবি বলেছিলেন, 'ইচ্ছা করে, আপনার করি / যেখানে যা-কিছু আছে', বলেছিলেন, 'সকলের ঘরে ঘরে / জন্মলাভ ক'রে লই হেন ইচ্ছা করে'। কিন্তু জীবনের পথপরিক্রমার শেষপ্রান্তে পৌঁছে কবি বুঝতে পেরেছেন তাঁর সে ইচ্ছা অপূর্ণই রয়ে গেছে। অজিতকুমার চক্রবর্তী যাকে বলেছেন কবির 'সর্বানুভূতি' তা কবিকল্পনায় সত্য হলেও বাস্তব অভিজ্ঞতায় সার্থক হয়ে ওঠে নি। কবি 'ঐকতান' কবিতায় তা অকপটে স্বীকার করেছেন। এই স্বীকৃতিতেই সার্বভৌম জনজীবনের

সঙ্গে কবিমানসের মিলনাকাঙ্ক্ষার আন্তরিকতা সুপরিস্ফুট। কবিতার প্রারম্ভেই কবির আত্মজিজ্ঞাসা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে :

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে।

অথচ কবি বলছেন তিনি 'পৃথিবীর কবি'। যেখানে এই পৃথিবীর যত ধ্বনি ওঠে তাঁর বাঁশিতে তখনি তার সাড়া জেগে উঠলে তবেই 'পৃথিবীর কবি' [ বিশ্বকবি ] হিসাবে তাঁর কাব্যসাধনা সার্থক হতে পারে। কিন্তু সেই স্বরসাধনায় অনেক ফাঁক রয়ে গেছে। এই সমবেত সংগীতের উপমানেই কবিতাটির নামকরণ হয়েছে 'ঐকতান'। কবির ভাষায় এই ঐকতান তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত। নিসর্গবিশ্বের ঐকতান, মানববিশ্বের ঐকতান, এবং এই দুই ঐকতান দিয়ে গড়া কাব্যলোকের ঐকতান। কবি বলছেন, নিসর্গবিশ্বের ঐকতানের অসম্পূর্ণতা 'কল্পনায় অনুমানে' হয়তো পূরণ করা যায়, কিন্তু 'জীবনে জীবন যোগ করা' না হলে মানববিশ্বের ঐকতানের সন্ধান পাওয়া যায় না। কেননা মানুষ 'অন্তরময়'। 'অন্তর মেশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়' পাওয়া সম্ভব। তিনি তা পারেন নি। কেননা

পাইনে সর্বত্র আমি প্রবেশের দ্বার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
চাষি ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চমঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।

কবি বলছেন, সমাজের সেই উচ্চমঞ্চ থেকে তিনি মাঝে-মাঝে অন্ত্যজ-পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে গিয়েছেন, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করার শক্তি তাঁর একবারেই ছিল না। তাই যাঁরা তাঁকে বুর্জোয়া কবি বলে নিন্দা করেছেন, তাঁর অপূর্ণতার কথা বলেছেন, তাঁদের বক্তব্য তিনি মেনে নিয়ে বলেছেন,

আমার কবিতা জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

কেননা, কৃষাণের জীবনের শরিক হতে না পারলে, কর্মে ও কথায় তাদের সঙ্গে সত্যকার আত্মীয়তা অর্জন করতে না পারলে, অর্থাৎ মাটির কাছাকাছি গিয়ে অখ্যাত অজ্ঞাত জনের 'জীবনে জীবন যোগ করা' সম্ভব না হলে, 'কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পশরা'। তাই তিনি মর্ত্য থেকে বিদায় নেবার আগে 'অখ্যাত জনের নির্বাক মনের' কবিকে সাহিত্যের ঐকতান-সংগীতসভায় আহ্বান করে বলেছেন·

মূক যারা দুঃখে সুখে
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে,
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
... ... ...
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।

এখানে পৌঁছে কবিতাটি এই শতাব্দীর একটি মুখ্য জীবনবোধকে ভাষা দিয়েছে। কবি নিজেই এই জীবনবোধকে প্রকাশ করেছিলেন 'চিত্রা'র 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায়—

এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

কবির জীবনদিনান্তে মনে হয়েছে, তিনি জনজীবনের শরিক হতে পারেন নি বলে তাঁর কবিতায় মানববিশ্বের ঐকতান-সংগীত-রচনায় ফাঁক রয়ে গেছে। বলাই বাহুল্য, এখানে কবিপ্রতিভার একটি মৌল প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কবির ব্যক্তি-অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে তাঁর চিত্তে জনচেতনা পূর্ণতা পায় নি। কেননা তিনি জন্মেছেন আভিজাত্যের উচ্চশিখরে। সেখান থেকে মাটির মানুষের সঙ্গে 'কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা' স্থাপন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। অথচ যে 'কল্পনা'শক্তি কবিপ্রতিভার একটি প্রধান শক্তি বলে স্বীকৃত, যার দ্বারা কবির ব্যক্তিমানস বিশ্বমানসে রূপান্তরিত হয়, সেই কবিকল্পনাকে এখানে অস্বীকার করা হয়েছে। 'সাহিত্যের বিচারক' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, 'আমরা

আমাদের অন্তরের মধ্যে দুইটা অংশের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। একটা অংশ আমার নিজত্ব, আর-একটা অংশ আমার মানবত্ব। ..প্রকৃত সাহিত্যকারের অন্তঃকরণে যদি তাহার নিজত্ব ও মানবত্বের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে, তবে তাহা কল্পনার কাচের শার্সির স্বচ্ছ ব্যবধান। তাহার মধ্য দিয়া পরস্পরের চেনা-পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটে না। এমন কি, এই কাব্য দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণের কাচের কাজ করিয়া থাকে—ইহা অদৃশ্যকে দৃশ্য, দূরকে নিকট করে।'[৭]

'ঐকতান' কবিতা রচনার সময় কবি তাঁর 'নিজত্ব'কে—তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকেই—বড়ো করে দেখেছেন, সাহিত্যকারের 'মানবত্বে'র গুরুত্ব দেন নি। কিন্তু এই প্রসঙ্গ উত্থাপন না করেও বলা যায়, 'ঐকতান" কবিতাটি বিশুদ্ধ কবিতা হয়ে ওঠে নি। রচনাটিকে বলা যেতে পাবে ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের আত্মকথা। তাঁর আন্তরিকতায় অবিশ্বাস করার কোনো হেতু নেই। কিন্তু দুটি কারণে রচনাটি গীতিকবিতার গোত্র লাভ করেনি। প্রথম, কবির অভিজ্ঞতা-জাত উপলব্ধি ওতে যুক্তিপরম্পরায় সুগ্রথিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তাতে আছে কবির অক্ষমতার সংবাদ। রচনাটিকে সমগ্রভাবে গদ্যবন্ধে অনায়াসেই রূপান্তরিত করতে পারা যায়। এখানে কবিব বক্তব্য মুখ্যত জ্ঞানের বিষয়, ভাবের বিষয় নয়। তাই তা যতটা 'প্রমাণিত' হয়েছে ততটা 'সম্ভাবিত' হয়ে ওঠে নি। দ্বিতীয়, বচনাটিতে কবির উপলব্ধিই প্রকাশিত হয়েছে, সেই উপলব্ধিব 'বেদনা' প্রকাশিত হয় নি। তাই রচনাটি উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা হিসাবে অসার্থক। এই রচনার সঙ্গে 'পুনশ্চে'ব 'একজন লোক'-এব তুলনা করলেই আমাদেব বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

৪

কাব্যবিচারে একটি সত্য অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। এক মুহূর্তের হৃদয়াবেগের ফলে সার্থক কবিতার জন্ম হয় না। তার পিছনে থাকা চাই সারাজীবনের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত উপলব্ধি। 'একজন লোক' কবিতায় যে বেদনার প্রকাশ তার সঙ্গে আমরা পরিচিত হই কবির যৌবনলগ্নের রচনাবলীতে। প্রথমেই মনে পড়ছে 'ছিন্নপত্রাবলী'র একাধিক পত্র। ১৮৯২ সালের ২২ জুন [ কবির বয়স তখন একত্রিশ পেরিয়ে বত্রিশ চলছে ] ইন্দিরা দেবীকে কবি লিখছেন ·

'আজ খুব ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনছিলুম ঘাটে মেয়েরা উলু দিচ্ছে—শুনে মনটা কেমন ঈষৎ বিকল হয়ে গেল, অথচ তার কারণ ভেবে পাওয়া শক্ত। বোধ হয় এই রকমের একটা আনন্দধ্বনিতে হঠাৎ অনুভব করা যায় পৃথিবীতে

একটা বৃহৎ কর্মপ্রবাহ চলছে যার অধিকাংশের সঙ্গে আমার যোগ নেই—পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আমার কেউ নয়, অথচ তাদের কত কাজকর্ম সুখদুঃখ উৎসব-আনন্দ চলছে—কী বৃহৎ পৃথিবী! কী বিপুল মানবসংসার! কত সুদূর থেকে জীবনের ধ্বনি প্রবাহিত হয়ে আসে—সম্পূর্ণ অপরিচিত ঘরের একটুখানি বার্তা পাওয়া যায়। মানুষ যখন বুঝতে পারে 'আমার কাছে আমি যত বড়োই হই আমাকে দিয়ে সমস্ত বিশ্ব পরিপূর্ণ করতে পারি নে—অধিকাংশ জগৎ আমার অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়, অনাত্মীয়, আমা-হীন'—তখন এই প্রকাণ্ড ঢিলে জগতের মধ্যে আপনাকে অত্যন্ত খাটো এবং এক রকম পরিত্যক্ত ও প্রান্তবর্তী বলে মনে হয়— তখনই মনের মধ্যে এই রকমের একটা ব্যাপ্ত বিষাদের উদয় হয়।[৮]

দ্বিতীয় পত্র এর তিন বৎসর পরে লেখা, তারিখ ১ জুন, ১৮৯৫। পাতিসর-পথে 'পদ্মা'য় বসে লেখা এই পত্র। কবি বলছেন :

'ছোটোবড়ো নানাবিধ গ্রাম, তার নানা রকমের নাম।—দেখতে দেখতে যাই আর ভাবি যে, আমার কাছে এই গ্রামগুলি এক মুহূর্তের ছবিমাত্র কিন্তু কত লোকের কাছে এইই সমস্ত পৃথিবী। যারা ঐ জলে নেমে স্নান করছে এবং ডাঙায় বসে বাঁখারি ছুলছে তারা যথাসময়ে ঐ ঘন গাছগুলোর আড়ালে কোন্-একটা জায়গায় তাদের বাড়িতে যাবে। সেইখানেই তাদের নিত্যকর্ম এবং চির-জীবনের রঙ্গভূমি। সেখানকার অখ্যাতনামা অকৃতকীর্তি লোকেরা তাদেব সর্বাপেক্ষা পবিচিত এবং প্রভাবসম্পন্ন প্রতিবেশী। এই চিন্তাগুলি খুব যে অপূর্ব এবং অসামান্য তা বলতে পারি নে, কিন্তু তবু এরকম ক'রে ভেবে দেখতে গেলে একটু নতুন রকমের ঠেকে—আমবা সকলে নিজেদের পক্ষে কত বৃহৎ অথচ সাধারণের পক্ষে কত ছোটো সেইটে ভালো কবে মনে উদয় হয়। এখন সন্ধ্যা হযে এসেছে—দুই ধারের গ্রাম আপন-আপন ঘবে প্রদীপ জ্বেলে নিভৃত নিষ্কর্মা হয়ে বসেছে, গল্প করছে, তামাক খাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে—কেবল আমার একটিমাত্র বোট মাঝখানে দাঁড ফেলে ঝুপ্‌ঝুপ্‌ শব্দ করে চলেছে, দু ধারের লোকালয়ের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই।'[৯]

এবার আমরা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-তত্ত্বচিন্তা থেকে দুটি উদ্ধৃতি সংগ্রহ করব। 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধের শেষভাগে কবি লিখছেন, 'এই চঞ্চল সংসারে আমরা সত্যের আস্বাদ কোথায় পাই? যেখানে আমাদের মন বসে। রাস্তার লোক আসিতেছে যাইতেছে, তাহারা আমাদের কাছে ছায়া, তাহাদের উপলব্ধি আমাদের কাছে নিতান্ত ক্ষীণ বলিয়াই তাহাদের মধ্যে আমাদের আনন্দ নাই।'[১০]

'সাহিত্য' গ্রন্থেরই 'বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধে কবি পুনশ্চ বলছেন, 'আমাদের অন্তঃকরণে যত-কিছু বৃত্তি আছে, সে কেবল সকলের সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য। এই যোগের দ্বারাই আমরা সত্য হই, সত্যকে পাই।...

'জগতে সত্যের সঙ্গে আমাদের এই যে যোগ, ইহা তিন প্রকারের। বুদ্ধির যোগ, প্রয়োজনের যোগ, আর আনন্দের যোগ। .. আনন্দের যোগে সমস্ত পার্থক্য ঘুচিয়া যায়—সেখানে আর অহংকার থাকে না—সেখানে নিতান্ত ছোটোর কাছে দুর্বলের কাছে আপনাকে একেবারে সঁপিয়া দিতে আমাদের কিছুই বাধে না। সেখানে মথুরার রাজা বৃন্দাবনের গোয়ালিনীর কাছে আপনার রাজমর্যাদা লুকাইবার আর পথ পায় না। যেখানে আমাদের আনন্দের যোগ, সেখানে আমাদের বুদ্ধির শক্তিকেও অনুভব করি না, কর্মের শক্তিকেও অনুভব করি না, যেখানে শুদ্ধ আপনাকেই অনুভব করি মাঝখানে কোনো আড়াল বা হিসাব থাকে না। .. এই আনন্দের যোগ ব্যাপারখানা কী? না, পরকে আপনার করিয়া জানা, আপনাকে পরের করিয়া জানা।'[১১]

কবির এই-সব উক্তিতে তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও চিন্তার যে পরিচয় পাওয়া যায় তারই আলোকে 'একজন লোক' কবিতার মর্মার্থ গ্রহণ সুগম হবে।

৫

কবিতাটি 'সঞ্চয়িতা'য় স্থান না পাওয়ায় ঈষৎ উপেক্ষিত ও অবগুণ্ঠিত হয়ে আছে। তাই প্রথমে কবিতাটির কাব্যরূপের সঙ্গে আদ্যোপান্ত পরিচিত হওয়া অত্যাবশ্যক। মনে রাখতে হবে, কবিতাটি কবির প্রথম গদ্যকবিতাসংকলন 'পুনশ্চে'র অন্তর্গত। 'পুনশ্চে'র দ্বিতীয় সংস্করণে 'পরিশেষ' থেকে যে-সব কবিতা স্থানান্তরিত হয়েছে [ যেমন 'খেলনার মুক্তি', 'পত্রলেখা', 'খ্যাতি', 'বাঁশি', 'উন্নতি', 'ভীরু', ] সেগুলি পদ্যবন্ধে লেখা, বাকি কবিতাগুলি বিশুদ্ধ গদ্যকবিতা। 'একজন লোক' বিশুদ্ধ গদ্যকবিতা। এবং, আমাদের মতে, গদ্যবন্ধে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা।

দুর্ভাগ্যবশত, বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'রবীন্দ্ররচনাবলী' এবং 'বিচিত্রা'য় কবিতাটির লিপিরূপ যথাযথ ভাবে গ্রথিত হয় নি। আসলে কবিতাটি চার স্তবকে বিন্যস্ত। কিন্তু রবীন্দ্ররচনাবলীতে স্তবকবিন্যাস হয়েছে তিন, এবং 'বিচিত্রা'য় দুই। যতিচিহ্নেও অদলবদল করা হয়েছে। আমরা পুনশ্চের প্রথম সংস্করণের পাঠটি উদ্ধৃত করলাম :

আধবুড়ো হিন্দুস্থানী,
রোগা লম্বা মানুষ,
পাকা গোঁফ, দাড়ি-কামানো মুখ,
শুকিয়ে-আসা ফলের মতো।
ছিটের মেরজাই গায়ে, মালকোঁচা ধুতি,
বাঁ কাঁধে ছাতি, ডান হাতে খাটো লাঠি,
পায়ে নাগরা, চলেছে সহরের দিকে।
ভাদ্র মাসের সকাল বেলা,
পাৎলা মেঘের ঝাপ্‌সা রোদ্দুর,
কাল গিয়েছে কম্বল-চাপা হাঁপিয়ে-ওঠা রাত,
আজ সকালে কুয়াশা-ভিজে হাওয়া
দো-মনা করে বইচে আমলকির কচি ডালে

পথিকটিকে দেখা গেল
আমার বিশ্বের শেষ-রেখাতে
যেখানে বস্তুহারা ছায়া-ছবির চলাচল।
ওকে শুধু জান্‌লুম, একজন লোক।
ওর নাম নেই, সংজ্ঞা নেই, বেদনা নেই,
কিছুতেই নেই কোনো দরকার,
কেবল হাটে-চলার পথে
ভাদ্রমাসের সকালবেলায
একজন লোক।

সেও আমায় গেছে দেখে
তার জগতের পোড়ো জমির শেষ সীমানায়,
যেখানকার নীল কুয়াশার মাঝে
কারো সঙ্গে সম্বন্ধ নেই কারো,
যেখানে আমি—একজন লোক।

তার ঘরে তার বাছুর আছে,

ময়না আছে খাঁচায় ;
স্ত্রী আছে তার, জাঁতায় আটা ভাঙে,
পিতলের মোটা কাঁকন হাতে :
আছে তার ধোবা প্রতিবেশী,
আছে মুদি দোকানদার,
দেনা আছে কাবুলীদের কাছে,—
কোনোখানেই নেই
আমি—একজন লোক।

চার স্তবকে বিন্যস্ত এই কবিতার ধ্রুবপদ হচ্ছে 'কোনোখানেই নেই আমি—একজন লোক'। আমরা বলেছি কবি নিজে ইংরেজিতে এই কবিতার অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু কবির অনুবাদে এই ধ্রুবপদ কুয়াশাচ্ছন্ন। শেষ স্তবকের অনুবাদ উদ্ধার করলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে—

I imagine he has his cow in his stall,
a parrot in the cage,
his wife with bangles round her arms,
grinding wheat,
the washerman for his neighbour,
the grocer's shop across the lane,
a harassing debt to the man from Peshawar,
and somewhere my own indistinct self
only as a passing person.[১২]

শেষ দুটি পংক্তিতে মূল কবিতার 'বেদনা' গভীরতা হারিয়েছে।

৬

'এপারে-ওপারে' বা 'ঐকতান' কবিতার যা ভাববস্তু 'একজন লোকে'র ভাববস্তুও তাই। কিন্তু প্রথমোক্ত দুটি কবিতায় কবির চিন্তাই পদ্যবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু 'একজন লোকে' গদ্যবন্ধে ভাষা পেয়েছে কবির বেদনা। এবং গদ্যবন্ধে লেখা হলেও ওই বেদনার সঞ্চারণগুণে রচনাটি একটি উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা হয়ে উঠেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, কবির উপলব্ধি 'সামান্য'কে নিয়ে নয়, 'বিশেষ'কে নিয়ে।

কবিতাটি লেখা ১৩৩৯ সালের ১৭ ভাদ্র। মধ্যভাদ্রের সকালবেলায় নিসর্গ-

পরিবেশও কবির উপলব্ধির সহায়ক হয়েছে। প্রথম স্তবকে ভাদ্রমাসের সকাল বেলায় হাটে-চলার-পথে একজন পথিককে কবি দূর থেকে দেখলেন। একজন আধবুড়ো হিন্দুস্থানী। গায়ে ছিটের মেরজাই, মালকোঁচা ধুতি, বাঁ কাঁধে ছাতি, ডান হাতে খাটো লাঠি, পায়ে নাগ্‌রা—সবকিছু মিলিয়ে 'বিশেষ' একজন লোক। পরিবেশটিও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।—

ভাদ্র মাসের সকাল বেলা,
পাৎলা মেঘের ঝাপ্‌সা রোদ্দুর ;
কাল গিয়েচে কম্বল-চাপা হাঁপিয়ে-ওঠা রাত,
আজ সকালে কুয়াশা-ভিজে হাওয়া
দো মনা করে বইচে আমলকির কচি ডালে।

এই বিশিষ্ট নিসর্গ-পরিবেশের 'পাৎলা মেঘের ঝাপ্‌সা রোদ্দুর', 'কম্বল-চাপা হাঁপিয়ে-ওঠা রাত', 'আমলকির কচি ডালে' 'দো-মনা করে' বয়ে যাওয়া 'কুয়াশা-ভিজে হাওয়া' এমন একটি প্রেক্ষাপট রচনা করেছে যা বাচ্যার্থে নয়, নিগূঢ় ব্যঞ্জনাতেই কবিতার ভাববস্তুর সঙ্গে অন্বিত হয়েছে। মেঘের রোদ্দুর, কম্বল-চাপা হাঁপিয়ে-ওঠা রাত, দো-মনা কুয়াশা-ভিজে হাওয়া বিশুদ্ধ এবং বিশিষ্ট কবিভাষা।

এই বিশিষ্ট পরিবেশে কবি পথিকটিকে দেখলেন তাঁর 'বিশ্বের শেষ রেখাতে / যেখানে বস্তুহারা ছায়া-ছবির চলাচল'। 'সাহিত্যে'র 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'রাস্তায় লোক আসিতেছে যাইতেছে, তাহারা আমাদের কাছে ছায়া', কবিভাষায় তা হয়েছে 'বস্তুহারা ছায়া-ছবির চলাচল'।

কবি বলছেন, 'ওকে শুধু জানলুম, একজন লোক'।

ওর নাম নেই, সংজ্ঞা নেই, বেদনা নেই,
কিছুতেই নেই কোনো দরকার।

অর্থাৎ, কবিচেতনায় ওর ব্যক্তিপরিচয়, বিশিষ্ট স্বরূপ এবং সুখদুঃখের কোনো অনুভূতি নেই। কবির কাছেও তার চাইবার কিছু নেই। তার অর্থ হল, কবির সঙ্গে বুদ্ধির, জ্ঞানের বা আনন্দের - কোনো যোগেই সে যুক্ত নয়। তাই সে দেখা দিয়েছে তাঁর 'বিশ্বের শেষরেখাতে'। তাই সে 'বস্তুহারা ছায়া ছবির চলাচল' মাত্র।

সেও কবিকে পথ চলতে চলতে আনমনে অন্যমনস্কভাবে [ দো-মনা কুয়াশা-ভিজে হাওয়ার মতো ] দেখে গেছে। কবি তার জীবনে কোনো ফসলই ফলাতে পারেন নি। তাই 'তার জগতের পোড়ো জমির শেষ সীমানায়' কবির স্থান।

'যেখানকার নীল কুয়াশার মাঝে / কারো সঙ্গে সম্বন্ধ নেই কারো।' তৃতীয় স্তবকের এই 'নীল কুয়াশা'র জন্যই প্রথম স্তবকের 'কুয়াশা-ভিজে হাওয়া'র বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। 'কারো সঙ্গে সম্বন্ধ নেই কারো',—অর্থাৎ যে-আনন্দেব যোগে পরকে আপনার করে জানা যায়, আপনাকে পরের করে জানা,—সে-যোগ, সে-সম্বন্ধ নেই বলে কবির বিশ্বে সে 'বস্তহাবা ছায়া-ছবি'। কবিও ওই পথিকের কাছে নামহীন সংজ্ঞাহীন একজন লোকমাত্র।

চতুর্থ স্তবকে কবির বেদনা চূড়ান্ত শিখর স্পর্শ করেছে। 'ছিন্নপত্রাবলী'র দুখানি চিঠিতে তার সংবাদ কবি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আমার কেউ নয়, অথচ তাদের কত কাজকর্ম সুখদুঃখ উৎসব-আনন্দ চলছে —কী বৃহৎ পৃথিবী। কী বিপুল মানবসংসার।' [ পত্র সংখ্যা ৫৯ ]। বলেছিলেন, 'ছোটোবড়ো নানাবিধ গ্রাম, তাব নানা রকমের নাম—দেখতে দেখতে যাই আর ভাবি যে, আমার কাছে এই গ্রামগুলি একমুহূর্তের ছবিমাত্র কিন্তু কত লোকের কাছে এইই সমস্ত পৃথিবী। যারা ঐ জলে নেমে স্নান করছে এবং ডাঙায় বসে বাঁখারি ছুলছে তারা যথাসময়ে ঐ ঘন গাছগুলোর আড়ালে কোন্-একটা জায়গায় তাদের বাড়িতে যাবে। সেইখানেই তাদের নিত্যকর্ম এবং চিরজীবনের রঙ্গভূমি।' [ পত্রসংখ্যা ২০২ ] এই পথিকেরও বাড়ি আছে, সেখানেই তার নিত্যকর্ম এবং চিরজীবনের রঙ্গভূমি। কিন্তু সেখানেও কবির কোনো প্রবেশাধিকার নেই। এই অনাত্মীয়তার বেদনা দিয়েই গড়ে উঠেছে 'একজন লোকে'র উপসংহার :

তাব ঘরে তার বাছুর আছে,
ময়না আছে খাঁচায়,
স্ত্রী আছে তার, জাঁতায আটা ভাঙে,
পিতলেব মোটা কাঁকন হাতে,
আছে তার ধোবা প্রতিবেশী,
আছে মুদি দোকানদার,
দেনা আছে কাবুলীদের কাছে,—
কোনোখানেই নেই
আমি—একজন লোক।

তার বাছুর, তার ময়না, তার স্ত্রী, তার প্রতিবেশী ধোবা, তার মুদি দোকানদার, এমন কি যে-কাবুলীদের কাছে সে দেনার দায়ে আবদ্ধ তারাও তার জীবনে সত্য,

কিন্তু সেখানে কবির কোনো স্থান নেই। তার 'চিরজীবনের রঙ্গভূমি'তে কোনোখানেই তিনি নেই। তাই বিশ্বকবি ওই পথিকের জীবনে 'একজন লোক' মাত্র। কবির এই হৃদয়বিদারী বেদনা কবিভাষায় রসিকচিত্তে সঞ্চারিত হয়েছে বলেই 'একজন লোক' একটি অসামান্য গীতিকবিতা হয়ে উঠেছে।

## উল্লেখপঞ্জী


১. দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রজীবনী-২, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, তৃতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৬৮, পাদটীকা, পৃ ২২৯।

২. বিজ্ঞপ্তি, সঞ্চয়িতা, চৈত্র ১৩৫০।

৩ দ্রষ্টব্য, Poems, Rabindranath Tagore, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, কবির জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে 'বিচিত্রা' নামে যে 'রবীন্দ্র-রচনা-সঞ্চয় । ১২৮৭-১৩৪৮।' প্রকাশিত হয়েছিল [ বৈশাখ, ১৩৬৮] তাতে 'পুনশ্চ' থেকে তিনটি কবিতা নির্বাচন করা হয়—'শিশুতীর্থ', 'সুন্দর' এবং 'একজন লোক'।'

৪ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্ররচনাবলী [ বিশ্বভারতী ]-২৪, পৃ ৩১ ৩৫।

৫. 'The Poetic Process', Kenneth Burke দ্রষ্টব্য, Wilbur Scott সম্পাদিত 'Five Approaches of Literary Criticism', Collier Books New York, ১৯৬২, পৃ ৯৯। টি এস. এলিঅটও তাঁর 'The Social Function of Poetry' প্রবন্ধে বলেছেন poetry has primarily to do with the expression of feeling and emotion, and that feeling and emotion are particular, where as thought is general'—'On Poetry and Poets.' Faber and Faber Ltd, 1961, পৃ ১৯।

৬. রেনার মারিয়া রিল্‌কের এই অনুদিত উক্তিটি ব্যবহার করেছেন হার্বার্ট রীড তাঁর 'Collected Essays in Literary Criticism' গ্রন্থে। Faber & Faber Ltd, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫০, পৃ ১১৯।

৭ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্ররচনাবলী-৮, পৃ ৩৫২।

৮. দ্রষ্টব্য, ছিন্নপত্রাবলী, স° আশ্বিন ১৩৬৭, পত্রসংখ্যা ৫৯, পৃষ্ঠা ১২৭।

৯ তদেব, পত্রসংখ্যা ২১২, পৃ ৪৫০ ৫১।

১০. দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্ররচনাবলী-৮, ৩৭০।

১১. তদেব, পৃ ৩৭৩।

১২. Poems, Rabindrnath Tagore, Visva-Bharati, স° ১৯৪৬, কবিতা-সংখ্যা ৯৫, পৃ ১৪১।

# সমুদ্রের প্রতি

১

পরিণত প্রজ্ঞায় রবীন্দ্রনাথ সর্বানুভূ। তারই প্রথম স্তরে তরুণ যৌবনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সমুদ্রানুভূ। অর্থাৎ কবিমানসে সর্বানুভূতির বিকাশলগ্নে মুকুলিত হয়েছে সমুদ্রানুভূতি।

সর্বানুভূ কথাটি বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হল। রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'বিশ্ববোধ' প্রবন্ধে 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদের 'যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ' [ ২।৫।১০ ], এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'সর্বানুভূ, অর্থাৎ সমস্তই তিনি অনুভব করছেন এই তাঁর ভাব। তিনি যে কেবল সমস্তর মধ্যে ব্যাপ্ত তা নয়, সমস্তই তাঁর অনুভূতির মধ্যে। শিশুকে মা যে বেষ্টন করে থাকেন সে কেবল তাঁর বাহু দিয়ে তাঁর শরীর দিয়ে নয় তাঁর অনুভূতি দিয়ে। সেইটিই হচ্ছে মাতার ভাব, সেই তাঁর মাতৃত্ব। শিশুকে মা আদ্যোপান্ত অত্যন্ত প্রগাঢ়রূপে অনুভব করেন।১

'সমস্তই তাঁর অনুভূতির মধ্যে'—এই অর্থেই সর্বানুভূ কথাটি আমাদের আলোচনায় ব্যবহৃত। আমরা বলেছি রবীন্দ্রমানসে সর্বানুভূতির প্রথম স্তর সমুদ্রানুভূতি। এই বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি নির্বাচিত উদাহরণ সংগ্রহ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'কবিকাহিনী'তে কবিচিত্তের পরিচয়ে বলা হয়েছে

হৃদয় হইল তার সমুদ্রের মত,
সে সমুদ্রে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকার
প্রতিবিম্ব দিবানিশি পড়িত খেলিত,
সে সমুদ্র প্রণয়ের জোছনা পরশে
লঙ্ঘিয়া তীরের সীমা উঠিত উথলি,
সে সমুদ্র আছিল গো এমন বিস্তৃত
সমস্ত পৃথিবী দেবি, পারিত বেষ্টিতে
নিজ স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে।২

'সন্ধ্যাসংগীতে'র 'অনুগ্রহ' কবিতায় উত্তমপুরুষের বাচনিকেই কবি বলছেন

আকাশে হেরিলে শশী আনন্দে উথিল উঠি
দেয় যথা মহা পারাবার
অসীম আনন্দ উপহার,
তেমনি সমুদ্র-ভরা আনন্দ তাহারে দিই
হৃদয় যাহারে ভালোবাসে।[৩]

সন্ধ্যাসংগীতের 'হৃদয়-অরণ্য' থেকে প্রভাতসংগীতে কবিমানসের বিশ্বভুবনে 'নিষ্ক্রমণ'। নির্ঝরের রূপক অবলম্বন করে সেই নিষ্ক্রমণের কথা কবি বলেছেন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায়। কবিতার উপসংহারে কবির মানস-নির্ঝর বলছে

কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
পাষাণ বাঁধন টুটি, ভিজায়ে কঠিন ধরা,
বনেরে শ্যামল করি, ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা,
সারাপ্রাণ ঢালি দিয়া,
জুড়ায়ে জগৎ-হিয়া
আমার প্রাণের মাঝে কে আসিবি আয় তোরা।
আমি যাব, আমি যাব, কোথায় সে, কোন্ দেশ—
জগতে ঢালিব প্রাণ,
গাহিব করুণা-গান,
উদ্বেগ-অধীর হিয়া
সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব, আর সে গান করিব শেষ।[৪]

এখানে নির্ঝর 'দূর হতে' মহাসাগরের আহ্বান-সংগীত শুনছে। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সে বলছে, সুদূর সমুদ্রে গিয়ে সে তার সঙ্গেই তার প্রাণ মেশাবে, তার প্রাণের সংগীত শেষ করবে। এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ [ মৈত্রেয়ী ] ব্রাহ্মণের একাদশ সূক্তটি মনে পড়ছে—'স যথা সর্বাসামপাং সমুদ্র একায়নমেবং' 'সমুদ্র যেমন সমস্ত জলরাশির একমাত্র গতি, একমাত্র মিলনাধার তেমনি…।

নির্ঝরের এই সমুদ্রাভিসারই কবিমানসে সমুদ্রানুভূতি হয়ে উঠেছে 'কড়ি ও কোমলে'র যুগে। ওই গ্রন্থের 'সমুদ্র' কবিতায় কবি বলছেন

কিসের অশান্তি এই মহাপারাবারে,
সতত ছিঁড়িতে চাহে কিসের বন্ধন।
অব্যক্ত অস্ফুট বাণী ব্যক্ত করিবারে
শিশুর মতন সিন্ধু করিছে ক্রন্দন।
.. ... ...
সাগরের কণ্ঠ হতে কেড়ে নিয়ে কথা
সাধ যায় ব্যক্ত করি মানব-ভাষায় ;
শান্ত করে দিই ওই চিরব্যাকুলতা,
সমুদ্র বায়ুর ওই চির হায় হায়।
সাধ যায় মোর গীতে দিবস-রজনী
ধ্বনিতে পৃথিবী-ঘেরা সংগীতের ধ্বনি।[৫]

কবিজীবনের অপরাহ্নলগ্নেও কবির সমুদ্রচেতনা তাঁর আত্মচেতনার সহোদর। 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থে সমুদ্রকে নিয়ে তিনটি সনেটের একটি সনেট-পরম্পরা আছে। প্রথম সনেটে কবি বলছেন

হে সমুদ্র, স্তব্ধচিত্তে শুনেছিনু গর্জন তোমার
রাত্রিবেলা, মনে হল গাঢ় নীল নিঃসীম নিদ্রার
স্বপ্ন ওঠে কেঁদে কেঁদে। নাই, নাই তোমার সান্ত্বনা,
যুগযুগান্তর ধরি নিরন্তর সৃষ্টির যন্ত্রণা
তোমার রহস্য-গর্ভে ছিন্ন করি কৃষ্ণ আবরণ
প্রকাশ সন্ধান করে।

তৃতীয় সনেটে কবিচেতনা আপন চিত্তের গহনে অবগাহন করেছে। কবি বলছেন

হে সমুদ্র, চাহিলাম আপন গহন চিত্তপানে ;
কোথায় সঞ্চয় তার, অন্ত তার কোথায় কে জানে।
ওই শোনো সংখ্যাহীন সংজ্ঞাহীন অজানা ক্রন্দন
অমূর্ত আঁধারে ফিরে, অকারণে জাগায় স্পন্দন
বক্ষতলে।[৬]

কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'জন্মদিনে'ও কবি বলছেন,

মোর চেতনায়
আদিসমুদ্রের ভাষা ওঙ্কারিয়া যায়,

অর্থ তার নাহি জানি
আমি সেই বাণী।[৭]

কিন্তু কবির সারাজীবনের এই সমুদ্রচেতনা থেকে 'সোনার তরী'র 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটি আপন স্বাতন্ত্র্যে অনন্য হয়ে আছে। কবিতাটিতে কবির বিশ্বানুভূতিরই প্রকাশ ঘটেছে, এবং তা একান্তভাবেই বৌদ্ধ মৈত্রীভাবনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ।

২

রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকেই 'অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব' বলে উপলব্ধি করেছিলেন। 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'ভারতবর্ষেব সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ—তাহার উপনিষদ্, তাহার গীতা, তাহার বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম'...।[৮] বৌদ্ধধর্মের এই বিশ্বপ্রেমই রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেছিল। বুদ্ধজন্মোৎসবের সংগীতে তিনি বুদ্ধদেবকে বলেছেন 'করুণাঘন'।[৯] রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের মধ্যে পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রকাশ দেখেছিলেন। পূর্ণ মনুষ্যত্বের অর্থ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, 'কেবল পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রকাশ তাঁরই, সকল দেশের সকল কালের সকল মানুষকে যিনি আপনাব মধ্যে অধিকাব করেছেন, যাঁর চেতনা খণ্ডিত হয নি বাষ্ট্রগত জাতিগত দেশকালের কোনো অভ্যস্ত সীমানায়'।[১০] রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন, 'ভগবান বুদ্ধ একদিন রাজসম্পদ ত্যাগ করে তপস্যা করতে বসেছিলেন। সে তপস্যা সকল মানুষের দুঃখ মোচনের সংকল্প নিয়ে'।[১১] রবীন্দ্রমানসে বুদ্ধদেবের স্থান নিয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন ডক্টর সুধাংশুবিমল বড়ুয়া। তাঁর গ্রন্থের নাম 'রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি'। শ্রীমতী পম্পা মজুমদারও তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎসে'র ৬৫ থেকে ৮৩ এবং ৫২০ থেকে ৫২৭ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে উল্লেখ্য আলোকপাত করেছেন।

বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি তিনটি সত্যের উপর বিধৃত: সর্বং অনিত্যং, সর্বং অনাত্মং, নির্বাণং শান্তং। বুদ্ধদেব বলেছেন, দুঃখ আছে, দুঃখের হেতু আছে, দুঃখের নিবৃত্তি আছে এবং দুঃখনিবৃত্তির উপায়ও আছে। এই দুঃখনিবৃত্তিরই অন্তিম ফলশ্রুতি হল নির্বাণ। নির্বাণই বৌদ্ধধর্মের উপেয়। বৌদ্ধধর্মে যে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা—এই চতুরার্যসত্য এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বলা হয়েছে শীলব্রত শ্রমণের তাই হল নির্বাণলাভের পাথেয়। বলাই বাহুল্য,

এর কোনোটিই উপেয় নয়, উপায় মাত্র। নির্বাণই বৌদ্ধধর্মের শেষ কথা। এই নির্বাণের অর্থ ও তাৎপর্য নিয়ে হীনযানপন্থী বৌদ্ধ এবং মহাযানপন্থী বৌদ্ধদের মধ্যে পরবর্তীকালে প্রচুর মতভেদ দেখা দিয়েছিল। দীপ জ্বলছে, দীপ নিবিয়ে দিলে যে অবস্থা হয় তারই নাম হীনযানীদের মতে নির্বাণপ্রাপ্তি। কিন্তু এই নঙর্থক পরিসমাপ্তিতে বৌদ্ধধর্মের বাণী নিঃশেষিত হয়েছে, একথা মহাযানপন্থীরা কিছুতেই মানতে প্রস্তুত নন। নির্বাণ যদি অনস্তিত্ব বা শূন্যতা হত তাহলে নিখিল মানবের কাছে বৌদ্ধধর্মের বাণী এতটা সমাদৃত হতে পারত না। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই পঞ্চস্কন্ধবিয়োগের পরেও যে অবস্থা থাকে তাকে যদি শূন্যতাই বলতে হয়, তা হলে, একদল মহাযানপন্থী 'নাসদাসীয় সূক্তে'র উল্লেখ করে বলেছেন, 'অস্তি-নাস্তি-তদুভয়ানুভয়-চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তং শূন্যরূপং'। অর্থাৎ অস্তি বা আছে একটি অবস্থা, তার বিপরীত অবস্থা হল নাস্তি বা নেই। এতদুভয়ে মিলে যে অবস্থা হল তারও বিপরীতে আছে তদনুভয়। অর্থাৎ, অস্তি, নাস্তি, তদুভয়, তদনুভয়—এই চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত অবস্থারই নাম শূন্যতা বা নির্বাণ। এই সদর্থক অর্থেই বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীর দেশে দেশে গৃহীত হয়েছে। খ্রীষ্টজন্মের পূর্বেকার অর্ধসহস্রাব্দী থেকে খ্রীষ্টজন্মের পরবর্তী অর্ধসহস্রাব্দী—মোটামুটি এই এক সহস্র বৎসরকে বলা যেতে পারে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মসংস্কৃতির সমৃদ্ধির যুগ। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম তার জন্মভূমিতে স্তিমিত হয়ে আসে, কিন্তু দক্ষিণে সিংহল ও ব্রহ্মদেশে এবং উত্তরে ও উত্তরপূর্বে তিব্বত, নেপাল, চীন, জাপান, পূর্বএশিয়া এবং বৃহত্তর ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তা আশাতীত প্রসারলাভ করে। হীনযানপন্থা মুখ্যত সিংহলেই পরিশীলিত হয়। তিব্বত-নেপাল জাপান প্রভৃতি দেশে মহাযানপন্থারই একাধিপত্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বৌদ্ধধর্মসংস্কৃতির প্রতি য়ুরোপের কৌতূহল জাগ্রত হয়। বৌদ্ধগণের মতে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পর তিনবার ধর্মচক্র প্রবর্তন হয়। প্রথমবার সারনাথে, দ্বিতীয় বারের ফল মহাযানপন্থার উদ্ভব, তৃতীয় বারে বিজ্ঞানবাদের যোগাচার পদ্ধতির প্রবর্তন। বুদ্ধদেব নিজে বিশ্বাসের চেয়ে অভ্যাসের উপরই আস্থা স্থাপন করেছেন। মহাপরিনির্বাণ সূক্তে বলা হয়েছে, আত্মদীপ হও, আত্মশরণ হও, অনন্যশরণ হও। অধ্যাপক বাপাত-সম্পাদিত, ভারত সরকার প্রকাশিত, 'বৌদ্ধধর্মের সার্ধ দ্বিসহস্রাব্দী' শীর্ষক ইংরেজি গ্রন্থের ভূমিকায় দার্শনিকপ্রবর, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বলেছেন, 'While the teaching of the Buddha assumed

distinctive forms in other countries of the world in conformity with their own traditions, here, in the home of the Buddha, it has entered into and become an integral part of our culture' উক্ত গ্রন্থে 'সাম্প্রতিক কালে বৌদ্ধশাস্ত্রালোচনা' শীর্ষক চতুর্দশ অধ্যায়ে উনবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্যতত্ত্ববিদ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের চেষ্টায় কিভাবে বৌদ্ধধর্মসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন হল তার কথা বিশদভাবে বলা হয়েছে। এই পণ্ডিতমণ্ডলীর অগ্রগণ্য হলেন টার্নার, বার্নোফ, ফোজবোল, কার্ন, ওল্ডেনবার্গ, লেভি, রিস ডেভিড্‌স-দম্পতি ও ম্যাক্স মূলার। জর্জ টার্নারই প্রথম, ১৮৩৭ সালে, সিংহল থেকে পালি ভাষায় লিখিত 'মহাবংশ'-এর ইংরেজি অনুবাদ ও সম্পাদন করেন। কোপেনহেগেনের অধ্যাপক ভিনসেণ্ট ফোজবোল ১৮৫৫ সালে লাটিন ভাষায় 'ধম্মপদে'র অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে বার্নোফ ও লিউইস পালি ভাষায় প্রাপ্ত গ্রন্থাদি প্রকাশ করে ফেলেছেন। নেপাল থেকে সংস্কৃত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থাদির পাণ্ডুলিপি আবিষ্কারের প্রধান কৃতিত্ব হজসনের [ ১৮২১-৪১ ]। ১৮৪৪ সালে ইউজেন বার্নোফই প্রথম বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস রচনায় অগ্রণী হন। তাঁর আলোচনাতেই প্রথম পালি ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থাদির পার্থক্য ধরা পড়ে। তাঁর 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক' গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ সালে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে 'প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থনিচয়ে' [ Sacred Books of the East ] নিয়মিত ভাবে বৌদ্ধ গ্রন্থাদি প্রকাশিত হতে থাকে। এই সম্পর্কে ম্যাক্স মূলার ও রিস ডেভিড্‌সের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। অধ্যাপক রিস ডেভিড্‌স ১৮৬৪ সালে 'সিলোন সিভিল সার্ভিসে' যোগদান করেন। সেই সময় থেকেই পালি ভাষায় রক্ষিত বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল জন্মে। ১৮৭২ সালে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তনের পর চাইল্ডার্স, ফোজবোল এবং ওল্ডেনবার্গের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। এই পর্যায়ে চাইল্ডার্সের নির্বাণ সম্পর্কিত নিবন্ধাবলী প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি করে। রিস ডেভিড্‌স তাঁর 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থে (১৮৭৮) নির্বাণ সম্পর্কে পরিণত চিন্তার পরিচয় দেন। রিস ডেভিড্‌সের উৎসাহে 'পালি টেক্‌স্‌ট সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৮১ সালে তিনি আমেরিকায় হিবার্ট বক্তৃতামালা প্রদানের জন্য আমন্ত্রিত হন। সেখানেই তিনি উক্ত সোসাইটি গঠনের কথা ঘোষণা করেন। তারপর থেকে তিন মহাদেশের বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধধর্মের চর্চা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে।

৩

পূর্বেই বলা হয়েছে করুণাঘন বুদ্ধদেবের মৈত্রীভাবনাই রবীন্দ্রমানসকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রচিন্তায় বৌদ্ধধর্মসংস্কৃতির প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে। বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের সার্ধদ্বিসহস্রাধিক জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রবন্ধ, কবিতা ও গানের যে সংকলন-গ্রন্থ 'বুদ্ধদেব' নামে প্রকাশিত হয়েছে তার সবগুলিই বিংশ শতাব্দীর রচনা। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, রবীন্দ্রনাথ কখন থেকে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মসংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে দুটি কথা প্রথমেই স্মরণীয়। 'প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থনিচয়' এবং প্রাচ্যতত্ত্ববিদ য়ুরোপীয় পণ্ডিতসমাজের গ্রন্থাবলীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনো পরিচয় ছিল না এমন কথা কল্পনা করাও অবাস্তব। দ্বিতীয়ত, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মচর্চায় যে জোয়ার এসেছিল তার কথাও এই প্রসঙ্গে অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

প্রথমেই মনে পড়ে, ১৮৫৯ সালে, রবীন্দ্রজন্মের প্রায় বৎসর-দুই পূর্বে তাঁর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিংহল গমন করেন। এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ এবং পুত্রপ্রতিম শিষ্য কেশবচন্দ্র সেন। ব্রাহ্মসমাজে যে মণ্ডলীগত উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত হয়, সেই সমবেত উপাসনা-পদ্ধতি দেবেন্দ্রনাথের সিংহলযাত্রার ফল বলেই অনেকে মনে করেন।

আধুনিক বাঙালীদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে যাঁর নাম সর্বপ্রথমে স্মরণীয় তিনি হলেন মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র। রাজেন্দ্রলালের 'ললিত বিস্তর' (১৮৭৭) 'শাক্যমুনির আশ্রম বুদ্ধগয়া' (১৮ ৮) এবং 'নেপালের সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য' (১৮৮২)—এই তিনখানি ইংরেজি গ্রন্থ পরবর্তী বৌদ্ধচর্চায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। এই কালসীমার মধ্যে, ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত এডুউন আর্নল্ডের 'এশিয়ার আলো' [ Light of Asia ] গ্রন্থখানিও পরবর্তী বাংলা সাহিত্যিকদের বৌদ্ধসাহিত্য রচনার অন্যতম উৎস ছিল। 'এশিয়ার আলো' আবার 'ললিত-বিস্তর'কেই অনুসরণ করে লেখা। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'বুদ্ধদেবচরিত' নাটক [ ৮৮৫] রচনায় 'এশিয়ার আলো'র কাছেই ঋণী। নবীনচন্দ্র সেনের 'অমিতাভ' কাব্যও ( ১ ৯১ ) প্রধানত 'এশিয়ার আলো'র দ্বারাই অনুপ্রাণিত।

রাজেন্দ্রলালের পরে রামদাস সেন, সাধু অঘোরনাথ এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ বাঙালী মনীষিগণের নাম স্মর্তব্য। রামদাস সেন 'ঐতিহাসিক রহস্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে ( ১৮৭৬ ) বৌদ্ধধর্ম, শাক্যসিংহের দিগ্বিজয়, বৌদ্ধমত ও

তৎসমালোচন, পালি ভাষা ও তৎসমালোচন এবং বুদ্ধদেবের দন্ত সম্পর্কে আলোচনা করেন। 'ঐতিহাসিক রহস্য' গ্রন্থের তৃতীয় ভাগেও বৌদ্ধ জাতকের উপর একটি প্রবন্ধ আছে। তাঁর 'বুদ্ধদেব' [১৮৯:] তাঁর মৃত্যুর প্রায় চার বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। কেশবচন্দ্র সেন এককালে মহর্ষিদেবের পুত্রপ্রতিম অন্তরঙ্গজন ছিলেন। পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা ও কেশবচন্দ্র কর্তৃক নববিধান-সমাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ ত্রিধাবিভক্ত হয়। কেশবচন্দ্র সর্বধর্মসমন্বয়ের দিকে বিশেষ আকৃষ্ট হযেছিলেন, এই উদ্দেশ্যেই তিনি বিভিন্ন ধর্মপ্রবর্তকগণের বাণী ও জীবনীরচনাব বিপুল প্রয়াসে প্রিযপরিজনগণকে উৎসাহিত করেন। কেশবচন্দ্রেরই অনুপ্রেরণায় সাধু অঘোরনাথ 'শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব' গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর-বৎসব [১৮৮২] গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে (১৮৮৩) 'বুদ্ধাবতার' সম্পর্কে আলোচনা করেন। কেশবচন্দ্র সেনেব কনিষ্ঠ সহোদব কৃষ্ণবিহারী সেন দীর্ঘকাল বৌদ্ধধর্মের অনুশীলনে রত ছিলেন। ঠাকুরবাড়ি থেকে সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশিত হলে ১৮৯১-৯২ সালে কৃষ্ণবিহারী 'সাধনা'য় ধারাবাহিকভাবে বুদ্ধেব জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

এই কালসীমাব মধ্যেই অনাগারিক ধর্মপাল কলিকাতায 'মহাবোধি সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৯১)। পব বৎসর মুখ্যত শরৎচন্দ্র দাসেব চেষ্টায় কলিকাতাতেই 'বুড্ডিস্ট টেক্স্ট সোসাইটি' (১৮৯২), এবং মহাস্থবিব কৃপাশরণ কর্তৃক 'বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা' (Bengal Buddhist Association) (১৮৯২) এর প্রতিষ্ঠাও উল্লেখের দাবি করে। ১৮৯৩ সালে পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়ার 'হস্তসার' প্রথম ভাগের প্রকাশও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'হস্তসাব' বাঙালী বৌদ্ধদের নিত্যপাঠ্য গ্রন্থরূপে তখন ব্যবহৃত হত। ডক্টর সুধাংশুবিমল বড়ুয়া বলেছেন "'হস্তসার' গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথ প্রায় সব সময় নিজের কাছে রাখতেন।"[১২]

এই অসম্পূর্ণ তালিকায় একখানি গ্রন্থের নাম বাদ পড়েছে। এই গ্রন্থখানি হল বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' [ ১৮৭৯ ]। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম সম্পূর্ণ অভিনব দৃষ্টিতে বুদ্ধদেবকে দেখেছেন। তিনি বলেছেন, বুদ্ধদেবই পৃথিবীর প্রথম সাম্যবাদী। বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন, 'পৃথিবীতে তিনবার আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছে। বহু কালান্তর, তিন দেশে তিন জন মহাশুদ্ধাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া ভূমণ্ডলে মঙ্গলময় এক মহামন্ত্র প্রচার করিয়াছেন। সেই মহামন্ত্রের স্থূল মর্ম 'মনুষ্য সকলেই সমান।' এই স্বর্গীয়

মহাপবিত্র বাক্য ভূমণ্ডলে প্রচার করিয়া, তাঁহারা জগতে সভ্যতা এবং উন্নতির বীজ বপন করিয়াছিলেন।…

"প্রথম, শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব। যখন বৈদিক ধর্মসঞ্জাত বৈষম্যে ভারতবর্ষ পীড়িত, তখন ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের উদ্ধার করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে যত প্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষের পূর্বকালিক বর্ণ-বৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই।…

"তখন বিশুদ্ধাত্মা শাক্যসিংহ অনন্তকালস্থায়ী মহিমা বিস্তারপূর্বক, ভারতাকাশে উদিত হইয়া, দিগন্তপ্রধাবিত রবে বলিলেন, "আমি এ উদ্ধার করিব। আমি তোমাদিগকে উদ্ধারের বীজমন্ত্র বলিয়া দিতেছি, তোমরা সেই মন্ত্র সাধন কর। তোমরা সবই সমান। ব্রাহ্মণ শূদ্র সমান। মনুষ্যে মনুষ্যে সকলেই সমান। সকলেই পাপী, সকলেরই উদ্ধার সদাচরণে। বর্ণ বৈষম্য মিথ্যা। যাগ যজ্ঞ মিথ্যা। বেদ মিথ্যা, সূত্র মিথ্যা, ঐহিক সুখ মিথ্যা, কে রাজা, কে প্রজা, সব মিথ্যা। ধর্মই সত্য। মিথ্যাত্যাগ করিয়া সকলেই সত্যধর্ম পালন কর।"[১৩]

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যচিন্তা রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধভাবনায় অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছে। বস্তুত, প্রথম স্তরে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র এবং এডুইন আর্নল্ড—এই পুরুষত্রয়ের দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বৌদ্ধসাহিত্য গ্রন্থাদিও, হয় মূলে নয় অনুবাদে, রবীন্দ্রনাথের অপরিজ্ঞাত থাকার কথা নয়।

তিন দিক দিয়ে আমরা রবীন্দ্রজীবনে বুদ্ধদেবের প্রভাবের কথা চিন্তা করতে পারি। প্রথম, তাঁর প্রবন্ধরাজিতে। সেগুলি মুখ্যত বিংশ শতাব্দীর। দ্বিতীয়, প্রত্যক্ষভাবে বৌদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে রচিত তাঁর কাব্য ও নাট্য-সাহিত্য। তৃতীয়, তাঁর কবিমানসে গোপন-সঞ্চারে বুদ্ধজীবন ও বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রেরণা। প্রথমটির পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থে। দ্বিতীয়টির বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করা যাবে মুখ্যত সুধাংশুবিমল বড়ুয়া ও পম্পা মজুমদারের গবেষণাগ্রন্থদ্বয়ে। বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের বিশেষ অভিনিবেশের বিষয় হল তৃতীয়টি।

৪

রবীন্দ্রনাথের গোপনচারী সত্তায় বৌদ্ধ ধর্মসংস্কৃতির প্রথম অস্ফুট পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্যে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে ১২৯২ সালে। এই নাট্যকাব্যের গুরুত্ব সম্পর্কে কবি নিজেই

তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন, 'আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিযাছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদযের মধ্যে প্রবেশ করিযা আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইযা দিল—এই প্রকৃতির প্রতিশোধ-এও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্যরকম করিয়া লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে-পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা'।[১৪]

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' সম্পর্কে কবির অন্যান্য মন্তব্য একত্র সংকলন করে দিয়েছেন পুলিনবিহারী সেন মহাশয় তাঁর 'রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী', প্রথম খণ্ডে।[১৫] এইসব মন্তব্যের আদিতে রযেছে 'আলোচনা' গ্রন্থের 'ডুব দেওয়া' প্রবন্ধ। উক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হযেছিল 'ভারতী' পত্রিকার ১২৯১ সালের বৈশাখ মাসে। তারও মাস আষ্টেক আগে 'ভারতী'রই ১২৯০ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত 'অনাবশ্যক' প্রবন্ধে বুদ্ধদেব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম মন্তব্য লিপিবদ্ধ হযেছে।[১৬] তাতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমি একজন বুদ্ধের ভক্ত। বুদ্ধের অস্তিত্বের বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন আমি সেই তীর্থে যাই, যেখানে বুদ্ধের দন্ত রক্ষিত আছে, সেই শিলা দেখি যাহার উপর বুদ্ধের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে, তখন আমি বুদ্ধকে কতখানি প্রাপ্ত হই! যখন দেখি, ফুটন্ত, ছুটন্ত বর্তমান স্রোতের উপর পুরাতন কালের একটি জীর্ণ অবশেষ নিশ্চলভাবে বসিয়া তাহার অমরতার অভি-শাপের জন্য শোক করিতেছে, অতীতের দিকে অনিমেষনেত্রে চাহিয়া আছে, অতীতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে, তখন এমন হৃদয়হীন পাষাণ কে আছে যে মুহূর্তের জন্য থামিয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিযা সেই মহা অতীতের দিকে চাহিয়া না দেখে'।[১৭]

'অনাবশ্যক' প্রবন্ধটির ভাববস্তু বিশ্লেষণ না করলে এই উদ্ধৃতির ভুল ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রয়েছে। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হল, যাকে আমরা 'অনাবশ্যক' বলি প্রকৃত প্রস্তাবে তা অনাবশ্যক নয়। 'আমরা বর্তমানের জীব'। কিন্তু 'বর্তমানের গায়ে অতীত কালের একটা নামসই থাকা নিতান্তই আবশ্যক।' 'আমার অতীতের মধ্যে আমার কতকগুলি তীর্থস্থান প্রতিষ্ঠিত আছে। যখন বর্তমানে পাপে তাপে শোকে কাতর হইয়া পড়ি তখন সেই তীর্থস্থানে গমন

করি, সরল বাল্যকালের সমীরণ ভোগ করি, নবজীবনের প্রথম সংকল্প, মহৎ উদ্দেশ্য, তরুণ আশাসকল পুনরায় দেখিতে পাই।' এই প্রবন্ধের সঙ্গেই সুর মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কথা' গ্রন্থের 'প্রবেশক' কবিতায় বলেছেন, 'তব সঞ্চার শুনেছি আমার, মর্মের মাঝখানে'।[১৮]

লক্ষণীয় এই যে, এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আর কারো নাম না ক'রে কেবল বুদ্ধদেবেরই নাম উচ্চারণ করে বলেছেন, 'আমি একজন বুদ্ধের ভক্ত।'

এই প্রসঙ্গে অধিকন্তু স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন একবারই মাত্র একটি তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে আভূমি প্রণত হয়েছিলেন। কৃষ্ণ কৃপালনি অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত তাঁর ইংরেজি রবীন্দ্রজীবনীতে বলেছেন, His admiration of the Buddha was boundless He was brought up to despise idolatry and yet he confessed that when he first saw the famous stone image of the Buddha in Bodh Gaya, he could not help bowing down to it[১৯]

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' প্রসঙ্গে তাঁর মানসলোকে বৌদ্ধ প্রভাবের পরোক্ষ আভাস পাওয়া যেতে পারে। তিনি নিজে এই কাব্যনাট্যের যে ইংরেজি অনুবাদ করেছেন তার আদিতে এই নাট্যকাব্যের মর্মকথার সূত্রনির্দেশ করে তিনি লিখেছেন "Lead us from the unreal to the real."[২০] অর্থাৎ 'অসতো মা সদ্গময়'।

বলাই বাহুল্য, প্রকৃতির প্রতিশোধের নির্বাণবাদী সন্ন্যাসী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কিনা, একথা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে কোথাও বলেন নি। কবির 'মালিনী' নাটিকা [১৮৯৬] রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'নেপালের সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য' গ্রন্থে ধৃত মহাবস্ত্বাবদান থেকে গৃহীত বৌদ্ধ কাহিনীরই পরিবর্তিত রূপ। মালিনীর আলোচনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, 'আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশংকরের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষারপুঞ্জের মতো নির্মল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে।...এই ভাবের অঙ্কুর আপনা-আপনি দেখা দিয়েছিল 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' সে-কথা ভেবে দেখবার যোগ্য।'[২১]

রবীন্দ্রসৃষ্টিলোকে পরোক্ষ বৌদ্ধপ্রভাবের দ্বিতীয় উল্লেখ্য উদাহরণ তাঁর 'রাজর্ষি' উপন্যাস, এবং তারই প্রথমাংশের কাহিনী অবিলম্বনে রচিত 'বিসর্জন' নাটক। 'রাজর্ষি' উপন্যাস দুখণ্ডে বিভক্ত। মোট পরিচ্ছেদ-সংখ্যা ৪৪। ১৮ পরিচ্ছেদে

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত। এই উপন্যাসের গল্প-সূত্র সম্পর্কে 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'স্বপ্ন দেখিলাম, কোন্-এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "বাবা, এ কি! এ যে রক্ত!" বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোনোমতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে।—জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প।'২২ এই স্বপ্নলব্ধ গল্পকে ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে রাজর্ষি উপন্যাস 'বালক' পত্রিকায় ১২৯২ সালের আষাঢ় সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে থাকে। গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১২৯৩ সালের শেষভাগে। ১২৯৩ সালের ২৩ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরাধিপতি বীরচন্দ্র মাণিক্যকে এক চিঠি লেখেন। তাতে তিনি বলেছেন, 'আমি ত্রিপুরা-রাজবংশের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া 'রাজর্ষি' নামক একটি উপন্যাস লিখিতেছি। কিন্তু তাহাতে ইতিহাস রক্ষা করিতে পারি নাই। তাহার কারণ ইতিহাস পাই নাই।'২৩

এই পত্রে 'গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁহার ভ্রাতার রাজত্বসময়ের সবিশেষ ইতিহাস', এবং 'মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য তাঁহার নির্বাসনদশায় চট্টগ্রামের কোন্ স্থানে কিরূপ অবস্থায় ছিলেন' তা জানবার জন্য কবি ত্রিপুরাধিপতিকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। তারই উত্তরে মহারাজা বীরচন্দ্র 'রাজরত্নাকর' নামে ত্রিপুর রাজবংশের একখানি ধারাবাহিক সংস্কৃত ইতিহাস প্রেরণ করেন। রবীন্দ্রনাথ এই 'রাজরত্না-করে'র সদ্ব্যবহার করেছিলেন।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্যের আলোচনায় আমরা 'মালিনী'র সূচনার যে অংশ উদ্ধার করেছি তাতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সে সময় তাঁর মনের মধ্যে ধর্মের চেতনা 'বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে।' এই সূচনাতে কবি বলেছেন, 'সত্য যার স্বভাবে, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা, তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানব-দেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে।'

'যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা' তারই দৃষ্টান্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে 'রাজর্ষি'র গোবিন্দমাণিক্য-চরিত্রে। উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে, দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদে রাজ্য থেকে নির্বাসিত গোবিন্দমাণিক্যের যে 'রাজর্ষি' মূর্তিটি সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন, নির্বাসিত গোবিন্দমাণিক্য চট্টগ্রামে গেলেন। চট্টগ্রাম তখন আরাকানের অধীন। আরাকানপতি তাঁকে রাজ্য পুনরুদ্ধারের

জন্য সাহায্য করতে চাইলেন। রাজর্ষি বললেন, 'না, আমি সিংহাসন চাই না।' চট্টগ্রামের একপার্শ্বে ময়ানি নদীর ধারে কুটির বেঁধে তিনি বসবাস করতে লাগলেন। প্রকৃতির শ্যামল স্নিগ্ধ শুশ্রূষায় ধীরে ধীরে তাঁর হৃদয়ের দুঃখবেদনা প্রশমিত হল। তারপর পার্বত্য প্রদেশ ছেড়ে তিনি দক্ষিণে সমুদ্রাভিমুখে চলতে লাগলেন। 'তাঁহার মনে হইতে লাগিল আমার নিজের সমস্ত বল এবং সমস্ত সুখ আমি পরের জন্য উৎসর্গ করিলাম, কেননা আমার নিজের কোনো কাজ নাই, কোনো বাসনা নাই। সচরাচর যে-সকল দৃশ্য কাহারও চোখে পড়ে না, তাহা নূতন আকার ধারণ করিয়া তাঁহার চোখে পড়িতে লাগিল। যখন দুই ছেলেকে পথে বসিয়া খেলা করিতে দেখিতেন, দুই ভাইকে, পিতাপুত্রকে, মাতা ও শিশুকে একত্র দেখিতেন, তাহারা ধূলিলিপ্ত হউক, দরিদ্র হউক, কদর্য হউক, তিনি তাহাদের মধ্যে দূরদুরান্তব্যাপী মানবহৃদয়সমুদ্রের অনন্ত গভীর প্রেম দেখিতে পাইতেন। একটি শিশুক্রোড়া জননীর মধ্যে তিনি যেন অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত মানবশিশুর জননীকে দেখিতে পাইতেন। দুই বন্ধুকে একত্র দেখিলেই তিনি সমস্ত মানবজাতিকে বন্ধুপ্রেমে সহায়বান অনুভব করতেন! পূর্বে যে-পৃথিবীকে মাঝে মাঝে মাতৃহীনা বলিয়া বোধ হইত, সেই পৃথিবীকে আয়তনয়না চিরজাগ্রত জননীর কোলে দেখিতে পাইতেন। পৃথিবীর দুঃখশোকদারিদ্র্য বিবাদ-বিদ্বেষ দেখিলেও তাঁহার মনে আর নৈরাশ্য জন্মিত না। একটিমাত্র মঙ্গলের চিহ্ন দেখিলেই তাঁহার আশা সহস্র অমঙ্গল ভেদ করিয়া স্বর্গাভিমুখে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত।'[২৪]

রাজর্ষি গোবিন্দমাণিক্যের এই মানসবিশ্লেষণে রবীন্দ্রমানসে পৃথিবীর মহত্তম রাজর্ষি শাক্যসিংহের চারিত্রধর্ম নিতান্ত অগোচরেও ক্রিয়াশীল ছিল না এমন কথা বলা যাবে না। গোবিন্দমাণিক্যের অপরিমেয় মানসে পৃথিবীর যে আনন্দময় রূপটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তার সঙ্গে বুদ্ধদেবের অন্তিম উক্তিটি তুলনীয়। মহাপরিনির্বাণের মুহূর্তে বুদ্ধদেব প্রিয়শিষ্য আনন্দকে বলছেন, 'চিত্রং জম্বুদ্বীপং, মনোরমং জীবিতং মনুষ্যাণাম্।'

'বিসর্জন' নাটকে বুদ্ধদেবের 'করুণাঘন' মূর্তির প্রেরণা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দে যখন বুদ্ধদেবকে দশাবতারের অন্যতম বলে গ্রহণ করেছেন তখন তিনি বুদ্ধদেবের করুণাঘন মূর্তিরই ধ্যান করেছিলেন:

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়-হৃদয়-দর্শিত পশুঘাতম্
কেশব-ধৃত-বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।

জয়দেবের এই ঐতিহ্যই উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সাহিত্যিকমানসে প্রভাবশীল হয়েছে। তাই দেখি গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'বুদ্ধদেবচরিত' নাটকে বুদ্ধদেবের এই করুণাঘন মূর্তিকেই প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। ডক্টর সুধাংশুবিমল বড়ুয়া বলেছেন, 'অসহায় পশুর কাতর ক্রন্দনে বিচলিত সিদ্ধার্থের করুণাসুন্দর রূপটি এখানে গিরিশচন্দ্র এক অপরূপ মহিমায় প্রকাশ করেছেন· 'কবি পুত্রের কামনা কর জগন্মাতা উপাসনা,—কেন তবে কর বধ কোটি কোটি প্রাণী ?'···রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের গোবিন্দমাণিক্যের মুখে যেন এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।'[২৫]

গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেবচরিত' নাটক প্রথম অভিনীত হয় ১০৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। 'বিসর্জন' নাটকের প্রকাশ তার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে, ১২৯৭ সালে। 'রাজর্ষি'র প্রথম ভাগ অবলম্বনে রচিত হলেও বিসর্জনে রবীন্দ্রমানস বৌদ্ধভাবনায় আরো অগ্রসর হয়েছে। এখানে করুণার সঙ্গে মিলিত হয়েছে বাৎসল্য। বিসর্জনের 'অপর্ণা' নিজেকে বলছে বলিপ্রদত্ত ছাগশিশুর 'মাতা'। জয়সিংহকে সম্বোধন করে সে বলছে --

কে তোমার বিশ্বমাতা। মোর
শিশু চিনিবে না তারে। মা-হারা শাবক
জানে না সে আপন মায়েরে। আমি যদি
বেলা করে আসি, খায় না সে তৃণদল,
ডেকে ডেকে চায় পথপানে—কোলে করে
নিয়ে তারে, ভিক্ষা-অন্ন কয় জনে ভাগ
করে খাই। আমি তার মাতা!

উদ্ধৃত অংশটি বৌদ্ধ মৈত্রিভাবনার 'সর্বভূতে অপরিমেয় মানস'-বক্তার সগোত্র।

৫

'বিসর্জন' নাটক রচনার সময় কবিজীবনে চলছে 'মানসী'র যুগ। 'সোনার তরী'র যুগে রবীন্দ্রমানসে বুদ্ধভাবনা স্বচ্ছতর হয়ে উঠেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদের মধ্যে 'বিশ্বপ্রেমমূলক' বৌদ্ধধর্মকেও স্থান দিয়েছেন। আর, বলাই বাহুল্য, বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম বলতে তিনি মৈত্রী, করুণা ও মুদিতার কথাই ভেবেছেন। তার মধ্যেও বৌদ্ধধর্মের মৈত্রিভাবনা বা মৈত্রীভাবনার প্রেরণাই রবীন্দ্রমানসে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। শ্রীমতী পম্পা

মজুমদার বলেছেন, 'ধম্মপদ ছাড়া সুত্তপিটকের খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত খুদ্দকোপাঠের মঙ্গলসুত্ত, সুত্তনিপাতের মেত্তভাবনা, বিশেষত করণীয়মেত্তসুত্তটি এবং দীঘনিকায়ের আটানাটিয় সুত্তটি রবীন্দ্রসাহিত্যে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে।'[২৬]

বৌদ্ধধর্মের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গদ্যরচনার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য রচনা হল 'শান্তিনিকেতন'-গ্রন্থের 'ব্রহ্মবিহার' প্রবন্ধটি [ ১১ চৈত্র ১৩১৫ ]। এই প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'শীল গ্রহণ করাই মুক্তিপথের পাথেয় গ্রহণ করা।...শীল আমাদের চলার সম্বল।'[২৭] প্রবন্ধশেষে তিনি বলেছেন, 'প্রত্যহ শীলসাধনার দ্বারা তিনি [ বুদ্ধদেব ] আত্মাকে মোহ থেকে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং মৈত্রীভাবনা-দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করার পথ দেখিয়েছেন'।[২৮]

কিন্তু সুত্তনিপাতের করণীযমেত্তসুত্তের যে তিনটি শ্লোকে মেত্তিভাবনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তা প্রথম ব্যবহার করেন 'ধর্ম' গ্রন্থের 'উৎসবের দিন' প্রবন্ধে [ ১৩১১ মাঘ ]। সেই শ্লোকত্রয়ী হল .

মাতা যথা নিযং পুত্তং আযুসা একপুত্তমনুরক্‌খে।
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং॥
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসং ভাবযে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং॥
তিট্‌ঠং চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো।
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্যং ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু॥

'ব্রহ্মবিহার' প্রবন্ধে এই শ্লোকত্রয়ীর অনুবাদ নিম্নরূপ : 'মা যেমন একটিমাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন, সমস্ত প্রাণীতে সেই প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে। ঊর্ধ্বে অধোতে চারিদিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে। যখন দাঁড়িয়ে আছ বা চলছ, বসে আছ বা শুয়ে আছ, যে পর্যন্ত না নিদ্রা আসে সে পর্যন্ত, এইপ্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকে ব্রহ্মবিহার বলে।'[২৯]

মেত্তিভাবনাই যে 'ব্রহ্মবিহার', এই প্রতিপাদ্যই রবীন্দ্রনাথের 'ব্রহ্মবিহার' প্রবন্ধের মূল কথা। এই প্রসঙ্গে, স্মরণীয়, মহেশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'বুদ্ধপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে 'মজ্‌ঝিমনিকায়'কেই বলেছেন বুদ্ধপ্রদর্শিত পথ। তাঁর মতে এই পথে সাধনার পদ্ধতি দুটি — সম্যক্ সমাধি ও ব্রহ্মবিহার। সম্যক্ সমাধিতে চিত্তের যে বিমুক্তি হয় তা হল অনিমিত্ত অর্থাৎ উচ্চ সমাধি অবস্থায় বাহ্যবস্তুর চিন্তাহীনতা, আকিঞ্চন্য অর্থাৎ অন্তরে প্রবল নাস্তিত্বের ভাব এবং শূন্যতা অর্থাৎ আমিত্বজ্ঞান ও মমত্ব-

বোধবিরহিত চিত্তবিমুক্তি। আর ব্রহ্মবিহারে চিত্তের যে বিমুক্তি তাতে চিত্তের প্রসার বাড়ে, তা অসীম ও অপ্রমাণ অর্থাৎ প্রমাণ বা পরিমাণরহিত। তাই তার নাম অপ্রমাণ চিত্তবিমুক্তি।[৩০]

রবীন্দ্রনাথ 'আমিত্বজ্ঞান ও মমত্ববোধবিরহিত' চিত্তবিমুক্তির পথে আকৃষ্ট হন নি, 'অপ্রমাণ চিত্তবিমুক্তি'র পথই তাঁর অভিলষিত। তাই দেখি, জীবনের উত্তরা'র্ধ যখনই নিজের ধর্মমতের আলোচনা করেছেন তখনই পূর্বোক্ত শ্লোকত্রয়ী হয় সমগ্রভাবে নয় অংশত, মূলে কিংবা অনুবাদে, তিনি উদ্ধার করেছেন। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য তাঁর 'Sadhana' ( ১৯২০ ), 'Religion of Man' ( ১৯৩১ ), 'মানুষের ধর্ম' ( ১৯৩৩ ) প্রভৃতি গ্রন্থ।

রবীন্দ্রনাথের মৈত্রীভাবনার একটা উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য হল, বুদ্ধদেব যেখানে 'একমাত্র পুত্রের প্রতি' মাতৃবাৎসল্যের উপমা দিয়েছেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'একমাত্র কন্যা'র কথা। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর অস্পৃশ্য রঘুদুহিতা, বিসর্জনের অপর্ণা এবং ১২৯৯ সালের অগ্রহায়ণে লেখা কাবুলিওয়ালা গল্পে 'অপরিমেয় মানস' উৎসারিত হয়েছে পুত্রকে আশ্রয় করে নয়, কন্যাকেই আশ্রয় করে।

'সোনার তরী' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেমচেতনার প্রথম সার্থক প্রকাশ ঘটেছে 'বিশ্বনৃত্য' কবিতায়। কবিতাটি রচিত হয় ১২৯৯ সালের ২৮শে ফাল্গুন। তাতে তিনি বলছেন,

হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানবহৃদয়ে মিশিতে—
নিখিলের সাথে মহারাজপথে
চলিতে দিবস নিশীথে।

কেননা অন্তরের অন্তর্লোকে তিনি শুনেছেন

ওই কে বাজায় দিবসনিশায়
বসি অন্তর-আসনে
কালের যন্ত্রে বিচিত্র সুর—
কেহ শোনে কেহ না শোনে।
অর্থ কী তার ভাবিয়া না পাই;
কত গুণী জ্ঞানী চিন্তিছে তাই,
মহান মানব-মানস সদাই
উঠে পড়ে তারই শাসনে।

উদ্ধৃতাংশের 'মহান মানব-মানস'-এর বাগ্‌ভঙ্গি লক্ষণীয়। 'মানব-মানস,—এই সমাসবদ্ধ পদটি রবীন্দ্রনাথ এই প্রথম ব্যবহার করলেন। মৈত্রিভাবনার 'মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং' বাক্যাংশটি এখানে অবশ্যই মনে পড়বে।

পনেরটি স্তবকবন্ধে গ্রথিত বিশ্বনৃত্যের দ্বাদশ স্তবকে কবি আক্ষেপের সুরে বলছেন,

সংসারস্রোত জাহ্নবীসম
বহুদূরে গেছে সরিয়া।
এ শুধু উষর বালুকাধূসর
মরুরূপে আছে মরিয়া।
নাহি কোনো গতি, নাহি কোনো গান,
নাহি কোনো কাজ, নাহি কোনো প্রাণ,
বসে আছে এক মহানির্বাণ
আঁধার-মুকুট পরিয়া॥

এই 'আঁধার-মুকুট-পরা' মহানির্বাণের কল্পনা আবার 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র সন্ন্যাসীকে মনে করিয়ে দেবে। বৌদ্ধধর্মের নির্বাণের অর্থ সর্বশূন্যতা—একথা রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই স্বীকার করতে পারেন নি। 'ব্রহ্মবিহার' প্রবন্ধের যুগে যখন তাঁর চিন্তা স্ফটিকস্বচ্ছ হয়ে উঠেছে তখন তিনি বলেছেন, বৌদ্ধধর্মে নির্বাণই চরম কথা, কিন্তু সে কি সর্বশূন্যতা? 'যদি শূন্যতাই হত তবে পূর্ণতার দ্বারা তাতে গিয়ে পৌঁছনো যেত না।' রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধশেষে বলেছেন, মৈত্রীভাবনার দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করার যে পদ্ধতি, 'এই পদ্ধতিকে তো কোনোক্রমেই শূন্যতালাভের পদ্ধতি বলা যায় না। এই তো নিখিললাভের পদ্ধতি, এই তো আত্মলাভের পদ্ধতি, পরমাত্মলাভের পদ্ধতি।'

'ব্রহ্মবিহারে'র এই চিন্তা সোনার তরীর যুগে এই স্ফটিকস্বচ্ছতা লাভ করেনি। তিনি তাই 'বিশ্বনৃত্য' কবিতায় জাতীয় জীবনকে মরুময় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার সংকল্পে উদ্বুদ্ধ হয়ে কামনা করেছেন—

জগৎ-মাতানো সংগীততানে
কে দিবে এদের নাচায়ে!
জগতের প্রাণ করাইয়া পান
কে দিবে এদের বাঁচায়ে!

ছিঁড়িয়া ফেলিবে জাতিজালপাশ,
মুক্ত হৃদয়ে লাগিবে বাতাস,
ঘুচায়ে ফেলিবে মিথ্যা তরাস
ভাঙিবে জীর্ণ খাঁচা এ॥

অর্থাৎ, বিশ্বনৃত্যে কবির বক্তব্য, 'নিখিললাভের পদ্ধতি'ই 'আত্মলাভের পদ্ধতি।' তাই তাঁর আকুল কামনা, 'জগতের প্রাণ করাইয়া পান / কে দিবে এদের বাঁচায়ে।'

৬

'বিশ্বনৃত্যে'র উনিশ-কুড়ি দিন পরে লেখা 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতা। আমরা পূর্বেই বলেছি, 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় যে বিশ্বানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে তা একান্তভাবেই বৌদ্ধ মৈত্রীভাবনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ। কবিতার ভাববস্তু বিশ্লেষণের পূর্বে 'ছিন্নপত্রাবলী'র কয়েকটি চিঠির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

১২৯৮ সালের দোসরা কার্তিক কবি ভ্রাতুষ্পুত্রীকে লিখছেন, 'মানুষও নানা শাখা প্রশাখা নিয়ে নদীর মতোই চলেছে—তার এক প্রান্ত জন্মশিখরে আর-এক প্রান্ত মরণসাগরে, দুই দিকে দুই অন্ধকার রহস্য, মাঝখানে বিচিত্র লীলা এবং কর্ম এবং কলধ্বনি—কোনোকালে এর আর শেষ নেই।...সব-সুদ্ধ এমন একটা করুণ ঘুমপাড়ানি গান—যেন মা সমস্ত বেলা বসে বসে তার ব্যথিত ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে—বলছে, আর ভাবিস নে, আর কাঁদিসনে, আর কাড়াকাড়ি মারামারি করিস নে, আর তর্ক-বিতর্ক রাখ্, একটুখানি ভুলে থাক্, একটুখানি ঘুমো। ব'লে তপ্ত কপালে করাঘাত করছে।'[৩১]

'তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে, এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে।'[৩২] [৯ ডিসেম্বর ১৮৯২]

'এই পৃথিবীর সঙ্গে, সমুদ্রের সঙ্গে, আমাদের যে একটি বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে, নির্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কি কিছুতেই বোঝানো যায়। পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না, সমুদ্র একেবারে একলা ছিল, আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্তভাবে তরঙ্গিত হতে থাকত; সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার একতান কলধ্বনি শুনলে তা যেন বোঝা যায়। আমার অন্তর-

সমুদ্রও আজ একলা বসে বসে সেইরকম তরঙ্গিত হচ্ছে, তার ভিতরে ভিতরে কী-একটা যেন স্তম্ভিত হয়ে উঠছে—কত অনির্দিষ্ট আশা, অকারণ আশঙ্কা, কত রকমের সৃষ্টি, কত রকমের প্রলয়, কত স্বর্গ নরক, কত বিশ্বাস সন্দেহ, কত লোকাতীত প্রত্যক্ষাতীত প্রমাণাতীত অনুভব এবং অনুমান, সৌন্দর্যের অপার রহস্য, প্রেমের অতল অতৃপ্তি—মানবমনের জড়িত জটিল সহস্র রকমের অপূর্ব অপরিমেয় ব্যাপার। বৃহৎ সমুদ্রের তীরে কিম্বা মুক্ত আকাশের নীচে একলা না বসলে সেই আপনার অন্তরের গোপন মহারহস্য ঠিক অনুভব করা যায় না'।[৩৩]
[ ১৬ এপ্রিল, ১৮৯৩ ]

এই তিনখানি চিঠির প্রথম দুখানি 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটি রচনার পূর্বে লেখা। তৃতীয়খানি পরে। তৃতীয় চিঠির শুরুতেই কবি লিখছেন, 'তোদের ভ্রমণের গোলমালের মধ্যে হোটেলে বসে এটা পড়ে কিরকম লাগবে সন্দেহ আছে। কোথায় সেই পুরীর সমুদ্র আর কোথায় তোদের আগ্রার হোটেল!' পত্রের অন্তিম বাক্যটিও লক্ষ্য করার মতো—'কিন্তু তা নিয়ে আমার মাথা খুঁড়ে মরবার দরকার নেই—আমার যা মনে উদয় হয়েছে আমি তাই বলে খালাস—তার পরে সমুদ্র সমভাবে তরঙ্গিত হতে থাকুক আর মানুষ হাঁস্ ফাঁস্ করে ঘুরে ঘুরে বেড়াক।'

এরপরে সন্দেহ থাকে না যে, আলোচ্য চিঠির সঙ্গে কবি ভ্রাতুষ্পুত্রীকে তাঁর 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটিও পাঠিয়েছিলেন। ১৩০০ সালের বৈশাখের 'সাধনা'য় কবিতাটি প্রকাশিত হয়। ইন্দিরা দেবীকে চিঠিখানি লেখা হয় ১৮৯৩ সালের ১৬ এপ্রিল। অর্থাৎ ১৩০০ সালের দোসরা কিংবা তেসরা বৈশাখ।

কবিতাটি প্রথম রচনায় ছিল মোট ৮১ পংক্তি। পরে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ১৪ পংক্তি। অবশ্য মূল কবিতার ৬৭, ৬৮ ও ৬৯—এই তিন পংক্তির পূর্বে নতুন ১৪ পংক্তি লিখে ঈষৎ পরিবর্তিত উক্ত তিন পংক্তির সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তার ফলে কবিতাটির পংক্তিসংখ্যা শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে ৯৫। কবিতাটির পাণ্ডুলিপির সঙ্গে প্রচলিত গ্রন্থের পাঠভেদের আলোচনায় শুরুতেই বলে রাখা প্রয়োজন যে, নবরচিত চৌদ্দ পংক্তি কবিতাটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

পাণ্ডুলিপিতেই দ্বিতীয় পংক্তির 'নিদ্রা' কেটে করা হয়েছে 'তন্দ্রা'। তৃতীয় পংক্তির 'তব চক্ষে' ছন্দকে শ্রুতিমধুর করার প্রয়োজনেই হয়েছে 'চক্ষে তব'। নবম পংক্তি ছিল 'তরঙ্গবন্ধন পাশে' শোধিত পাঠে হয়েছে 'তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি'। ৩৪ পংক্তির 'শান্ত দৃষ্টে' হয়েছে 'শান্তদৃষ্টি'। পাণ্ডুলিপির ৩৯-৪২ পংক্তি প্রথমে ছিল

'শুনিতেছি ধ্বনি তব, ভাবিতেছি যেন বুঝা যায়
কিছু কিছু ভাব তার—বোবার ইঙ্গিত-ভাষা-প্রায়
আত্মীয়ের কাছে।

পাণ্ডুলিপিতেই তা সংশোধিতরূপে হয়েছে :

শুনিতেছি ধ্বনি তব, ভাবিতেছি বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু ভাব তার,—বোবার ইঙ্গিত ভাষা-হেন
আত্মীয়ের কাছে।

৪০ পংক্তির 'ভাব তার' গ্রন্থাকারে হয়েছে 'মর্ম তার'। ৪৮ পংক্তির 'রাত্রি দিন জীবনস্পন্দন' হয়েছে 'সেই নিত্য জীবনস্পন্দন'। ৫১ পংক্তির 'বসি জনশূন্য কূলে' হয়েছে 'বসি জনশূন্য তীরে।' ৬৩ পংক্তির 'অপেক্ষা' হয়েছে 'প্রতীক্ষা'। পাণ্ডুলিপির ৭৩ পংক্তির 'অশ্রুবারি' হয়েছে 'অশ্রুধারা'। ৭৭ পংক্তির 'সান্ত্বনার বাণী' হয়েছে 'সান্ত্বনার বাক্য'। ৭৯ পংক্তির 'বারবার' হয়েছে 'বারম্বার'।

যতিচিহ্নের পরিবর্তনগুলি এই আলোচনায় উল্লেখ করা হল না। বর্ণাশুদ্ধি প্রসঙ্গে 'ঊর্দ্ধ' এবং 'সান্তনা'র কথাও অনুক্ত রয়ে গেল। প্রচলিত গ্রন্থে ( সোনার তরী, স° ১৩৭৬ ) নবযোজিত ১৪ পংক্তির সপ্তম পংক্তিতে একটি মারাত্মক ছান্দসিক ত্রুটি ঘটে গেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'আকারপ্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা—', 'সোনার তরী'র উক্ত সংস্করণে মুদ্রণপ্রমাদের ফলে 'আকার-প্রকারহীন' 'আকারপ্রকারবিহীন' হয়ে ছন্দের মুণ্ডপাত করেছে।

পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মুদ্রিত পাঠের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ভেদও লক্ষণীয়। পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটি অবিচ্ছিন্ন প্রবহমান মহাপয়ারবন্ধে রচিত। মুদ্রিতপাঠে স্তবকবিন্যাস করা হয়েছে। দুই দাঁড়ি দিয়ে স্তবকান্তিক বিরতিচিহ্ন লক্ষ্য করার মতো। প্রথম স্তবক শেষ হয়েছে ৩৭ পংক্তির পর। ২৯ পংক্তির দ্বিতীয় স্তবকের শুরু 'আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে' দিয়ে ; শেষ হয়েছে 'যুগান্তর স্মৃতিসম উদিত হতেছে বারম্বার' বাক্যে। তৃতীয় স্তবক সতেরো পংক্তির। নবরচিত ১৪ পংক্তি আছে তার আদিতে। শেষ হয়েছে 'কোলের শিশুর মতো' বাক্যাংশে। চতুর্থ ও শেষ স্তবক ১২ পংক্তির। তার আরম্ভে আছে 'হে জলধি, বুঝিবে কি তুমি / আমার মানবভাষা ?' শেষে ভরতবচন উচ্চারণ করে কবিতাটি সম্পূর্ণ হয়েছে—'বলো তারে, 'শান্তি ! শান্তি !' বলো তারে, 'ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা !'

নিসর্গবিশ্বকে নিয়ে বাৎসল্যরসের অমন অনবদ্য কবিতা রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বার

লেখেন নি। একটিমাত্র সন্তানের প্রতি মাতৃহৃদয়ের অন্তহীন উৎকণ্ঠার আবেগ দিয়ে কবিতাটির আরম্ভ :

হে আদিজননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব। তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন। তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দির-পানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গলগানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি।

তারপর সমস্ত প্রথম-স্তবক জুড়ে বসুন্ধরাজননী মহাসিন্ধুর মাতৃত্বের রূপটি কবি ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তুলেছেন। সন্তানজন্মের পূর্বে দিবারাত্রি গূঢ় এক স্নেহ-ব্যাকুলতা, গর্ভিণীর পূর্বরাগ, অলক্ষিতে অপূর্ব মমতা, অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষারাশি কি করে মহাসিন্ধুর শূন্য বক্ষোদেশে নিরন্তর ব্যাকুলিত হয়ে উঠত, কবি কল্পনানেত্রে তাকে যেন প্রত্যক্ষীভূত করেছেন। তারপর সন্তানকে কোলে নিয়ে মহাজননীর বিরাট অন্তরের নিত্যবিগলিত স্নেহরাশির বিচিত্র লীলা বাৎসল্যরসের কয়েকটি সুনির্বাচিত অনুভাবের সাহায্যে বিলসিত। শিশুসন্তানের সঙ্গে অম্বুনিধির সেই সুগম্ভীর স্নেহখেলার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনায় কবি আদিজননীর এক কল্পনাসুন্দর মাতৃমূর্তি রচনা করেছেন।

দ্বিতীয় স্তবকে কবিদৃষ্টি তলিয়ে গেছে আত্মমানসের অতল গভীরতায়। চেতনার প্রত্যূষলগ্নের কথা স্মরণ করে তিনি বলছেন, 'অন্তরের মাঝখানে / নাড়ীতে যে রক্ত বহে সেও যেন ওই ভাষা জানে /—আর কিছু শেখে নাই।' এই উপলক্ষে কবির উপলব্ধি যেন অনাদি অতীতে উপনীত হয়েছে—

মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণ-মাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে। সেই জন্মপূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী-'পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের, অতি ক্ষীণ আভাসের মতো

জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।

'সেই জন্মপূর্বের স্মরণ', মহাসিন্ধুর মাতৃহৃদয়ের 'সেই নিত্য জীবনস্পন্দন'. এই কবিতায় কবির সর্বানুভূতির প্রথম সূত্র। বলাই বাহুল্য, :তা মহাসিন্ধুর:বাৎসল্য-ভাবেরই সহোদর। স্তবকান্তে কবি বলছেন

সেই আদিজননীর
জনশূন্য জীবশূন্য স্নেহচঞ্চলতা সুগভীর,
আসন্নপ্রতীক্ষাপূর্ণ সেই তব জাগ্রত বাসনা,
অগাধ প্রাণের তলে সেই তব অজানা বেদনা
অনাগত মহা-ভবিষ্যৎ লাগি, হৃদয়ে আমার
যুগান্তর স্মৃতিসম উদিত হতেছে বারম্বার॥

তৃতীয় স্তবকে আছে বৌদ্ধ মৈত্রীভাবনার অপূর্ব কাব্যরূপ। আমরা কবিতার পাঠভেদ প্রসঙ্গে বলেছি, এই স্তবকে রচিত চৌদ্দ পংক্তিই কবিতাটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। প্রথম পাঠে কবিতাটি এই চৌদ্দ পংক্তি ছাড়াই সমাপ্ত হয়েছিল। কবিমানসে এই অপূর্ব উপলব্ধির প্রকাশে কবির নিজের দিক থেকেই দ্বিধা ছিল। 'ছিন্নপত্রাবলী'র ১৮৯২ সালের ২০ আগস্ট-লেখা ৭০-সংখ্যক চিঠিতে কবি লিখেছেন, 'এর যে কী মানে আমি ঠিক ধরতে পারি নে, এর সঙ্গে যে কী একটা আকাঙ্ক্ষা জড়িত আছে আমি ঠিক বুঝতে পারি নে—এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান—এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর দূরান্তর কত দেশ দেশান্তরের জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎ-সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে—আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেলগাছের

প্রত্যেক:পাতা জীবনের আবেগে থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে। এই পৃথিবীর উপর আমার যে একটি আন্তরিক আত্মীয়বৎসলতার ভাব আছে ইচ্ছে করে সেটা ভালো করে প্রকাশ করতে, কিন্তু এটা বোধ হয় অনেকেই ঠিকটি বুঝতে পারবে না—কী-একটা কিম্ভুত রকমের মনে করবে। সেই জন্যে চেষ্টা করতে প্রবৃত্তি হয় না।'৩৪

'সমুদ্রের প্রতি' রচনার মাস সাতেক আগের এই দ্বিধা শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ, 'সমুদ্রের প্রতি'র প্রথমপাঠ রচনার পর, জয় করতে পেরেছিলেন। এই পৃথিবীর উপর তাঁর যে একটি আত্মীয়বৎসলতার ভাব আছে তারই পূর্ণ প্রকাশ নবরচিত চৌদ্দ পংক্তিতে। তাতেই কবিমানসে 'মাতা যথা নিযং পুত্তং' পর্যায়ের মৈত্রী-ভাবনার রসরহস্য সম্পূর্ণ অনাবৃত হয়েছে—

আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত ব্যথাভরে,
তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়, অলক্ষ্য সুদূর-তরে
উঠিছে মর্মর স্বর। মানব-হৃদয়-সিন্ধুতলে
যেন নবমহাদেশ সৃজন হতেছে পলে পলে
আপনি সে নাহি জানে, শুধু অর্ধ অনুভব তারি
ব্যাকুল করেছে তারে—মনে তার দিযেছে সঞ্চারি'
আকার প্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা
প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।
তর্ক তারে পরিহাসে, মর্ম তারে সত্য বলি জানে,
সহস্র ব্যাঘাত-মাঝে তবুও সে সন্দেহ না মানে—
জননী যেমন জানে জঠরের গোপন শিশুরে,
প্রাণে যবে স্নেহ জাগে, স্তনে যবে দুগ্ধ উঠে পুরে।
প্রাণ-ভরা ভাষাহরা দিশাহারা সেই আশা নিয়ে
চেয়ে আছি তোমা পানে; তুমি সিন্ধু, প্রকাণ্ড হাসিয়ে
টানিয়া নিতেছ যেন মহাবেগে কী নাড়ীর টানে
আমার এ মর্মখানি তোমার তরঙ্গ-মাঝখানে
কোলের শিশুর মতো॥

কবির এই উপলব্ধি—বসুন্ধরার প্রতি এই 'আন্তরিক আত্মীয়বৎসলতার ভাব' আদিজননী সিন্ধুর বাৎসল্যস্বাদসহোদর। তাহলে কবি কেন বললেন, 'কোলের শিশুর মতো'? 'তুমি সিন্ধু প্রকাণ্ড হাসিয়ে / টানিয়ে নিতেছ যেন মহাবেগে কী নাড়ীর টানে / আমার এ মর্মখানি তোমার তরঙ্গ-মাঝখানে / কোলের শিশুর

মতো।'—আপাতদৃষ্টিতে এখানে বিরোধাভাস দেখা দিয়েছে। কিন্তু সমস্ত কবিতার মর্মমূলে রয়েছে জননী আর তাঁর কোলের শিশুর কথা। জননী আর সন্তান এই কবিতায় একাত্ম। 'মতো' ব্যবহারের ফলে এই একাত্মতার ভাবই অভিব্যঞ্জিত হয়েছে।

চতুর্থ অর্থাৎ অন্তিম স্তবকে কন্যাপ্রতিমা বসুন্ধরার জন্য কবিমানসের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ভাব ব্যক্ত হয়েছে। যে-বসুন্ধরা একদিন সিন্ধুর কোলে তার একমাত্র কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিল সেই বসুন্ধরাই আবার জন্মগ্রহণ করল কবির হৃদয়-সিন্ধুতে। একমাত্র সন্তানের প্রতি জননীর সেই অপরিমেয় মানস নিয়ে কবি তাকালেন বসুন্ধরার দিকে। বাৎসল্যরসস্নিগ্ধ মৈত্রীভাবনায় তাঁর অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল। সন্তানের বেদনায় করুণাকাতর কবি বলছেন,

হে জলধি, বুঝিবে কি তুমি
আমার মানবভাষা। জান কি তোমার ধরাভূমি
পীড়ায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এ-পাশ ও-পাশ—
চক্ষে বহে অশ্রুধারা, ঘন ঘন বহে উষ্ণ শ্বাস।
নাহি জানে কী যে চায়, নাহি জানে কিসে ঘুচে তৃষা—
আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা
বিকারের মরীচিকা-জালে।

কবির এই বাৎসল্যবেদনা বৌদ্ধ করুণাভাবেরই অনুরূপ—

যে ব্যাধিতা দুর্বলক্ষীণগাত্রা
নিস্ত্রাণভূতাঃ শায়িতা দিশাসু।
তে সর্বি মুচ্যন্তু চ ব্যাধিতো লঘু
লভন্তু চারোগ্য বলেন্দ্রিয়াণি॥
যে তাড়িতা বন্ধনবন্ধপীডিতা
বিবিধেষু ব্যসনেষু চ সংস্থিতা হি।
অনেক আয়াসসহস্র আকুলা
বিচিত্রভযদারুণশোকপ্রাপ্তাঃ॥
তে সর্বি মুচ্যন্ত্বিহ বন্ধনেভ্যঃ
সংতাড়িতা মুচিষু তাড়নেভ্যঃ।
বধ্যাশ্চ সংযুজ্যিযু জীবিতেন
ব্যসনাগতা নির্ভয় ভোন্তু সর্বে॥[৩৩]

'যারা ব্যাধিগ্রস্ত, দুর্বল ও ক্ষীণকায়, অবক্ষিত হয়ে যারা দিকে দিকে শায়িত রয়েছে তারা সত্বর ব্যাধিমুক্ত হোক, সুস্থ হোক, সবল ইন্দ্রিয় লাভ করুক। যারা অত্যাচারিত, বন্ধনপীড়িত, বিবিধ দুর্গতির মধ্যে যারা অবস্থিত, সহস্রবিধ আয়াসে যারা আকুল, বিচিত্র ভয় ও নিদারুণ শোকে আচ্ছন্ন যারা, সেই বন্ধন-পীড়িতের দল বন্ধন থেকে মুক্ত হোক্, অত্যাচারিতের দল অত্যাচার থেকে মুক্ত হোক্। বধ্যগণ জীবন লাভ করুক, বিপন্নগণ নির্ভয় হোক্।'

পীড়ায় পীড়িত, আয়াসক্লিষ্ট, বিকারের মরীচিকাজালে বিভ্রান্ত বসুন্ধরাব দুঃখ ও দুর্গতি অপনোদনের জন্য রবীন্দ্রনাথও করুণাবিগলিতচিত্তে সিন্ধুকে সানুনয়ে বলছেন,

অতল গম্ভীব তব
অন্তব হইতে কহো সান্ত্বনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলদমন্দ্রের মতো। স্নিগ্ধ মাতৃপাণি
চিন্তাতপ্ত ভালে তার তালে তালে বারম্বার হানি
সর্বাঙ্গে সহস্রবার দিযা তারে স্নেহময় চুমা,
বলো তারে 'শান্তি! শান্তি!' বলো তাবে 'ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা!'

এখানে শিশুসন্তানের কপালে স্নিগ্ধ মাতৃপাণির সুকোমল স্পর্শ, পীড়িত শিশুর শান্তি ও সুখসুপ্তি-কামনায় বাৎসল্যরস তুঙ্গশিখরে আবোহণ করেছে। এই কাব্যাংশে ব্যবহৃত কবিভাষাব প্রতি একটু দৃষ্টিপাত কবা প্রয়োজন। 'সান্ত্বনার বাক্য' 'আষাঢ়ের জলদ-মন্দ্রের মতো' হবে কি করে? জলদমন্দ্র তো গুরুগর্জন। কিন্তু না, কবি এখানে ধ্বনিরূপের দিকে কর্ণপাত করেন নি, 'করুণা'র অপরিমেয় প্রাচুর্যের প্রতিই কবিচেতনা কেন্দ্রীভূত। 'ধর্ম' গ্রন্থের 'উৎসবের দিন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বুদ্ধদেবেব করুণা · জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকেব উপরে বর্ষণ করিতেছে।'[৩৬]

মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা—এই চতুরার্যসত্যের প্রথম তিনটি যে পরস্পরসাপেক্ষ সে কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ব্রহ্মবিহার' প্রবন্ধে বলেছেন,

'প্রতিদিন এই কথা ভাবতে হবে: সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্‌ঝা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু, সব্বে সত্তা মা যথালব্ধসম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।

'সকল প্রাণী সুখিত হোক, শত্রুহীন হোক, অহিংসিত হোক, সুখী আত্মা হয়ে

সকলে কালহরণ করুক। সকল প্রাণী আপন যথালব্ধ সম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হোক।'[৩৭]

'বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ' প্রবন্ধেও [ ১৩১৮ ] রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সর্বভূতের প্রতি প্রেম জিনিসটি শূন্য পদার্থ নহে। এমন বিশ্বব্যাপী প্রেমের অনুশাসন কোনো ধর্মেই নাই'।[৩৮] এই প্রবন্ধেই তিনি আরো বলেছেন, 'ভারতবর্ষের চিত্ত হইতে জ্ঞানের ধারা এবং প্রেমের ধারাকে বুদ্ধদেব একত্রে আকর্ষণ করিয়া একদিন মিলাইয়াছিলেন। সেই মিলনের বন্যায় একদিন পৃথিবীর দেশ বিদেশ ভাসিয়া গিয়াছিল।'[৩৯]

৭

কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধদেব সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি বেশির ভাগই বিংশ শতাব্দীর রচনা। তাঁর সৃষ্টিকর্মে বৌদ্ধপ্রভাব মুখ্যত উনবিংশ শতাব্দীর। ১৮৯৩ সালের ৩১শে মার্চ যখন 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটি লেখা হয় তার প্রায় চার সপ্তাহ আগে কবি ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন, 'মনের ঋতু আবার ছ'টা নয়। একেবারে বাহান্নটা—এক প্যাকেট তাসের মতো—কখন কোন্‌টা হাতে আসে তার কিছু ঠিক নেই—অন্তরে বসে বসে কোন্ খামখেয়ালি খেলোয়াড় যে এই তাস ডীল ক'বে এই খামখেয়ালি খেলা খেলে তার পরিচয় জানি নে। সেইজন্য মানুষের আয়োজনের শেষ নেই— তাকে যে কত রকমের কত কী হাতে রাখতে হয় তার ঠিক নেই। সেইজন্যে আমার সঙ্গে 'নেপালীজ বুদ্ধিষ্টিক লিটারেচর' থেকে আরম্ভ করে শেক্‌সপীয়র পর্যন্ত কত রকমেরই যে বই আছে তার আর ঠিকানা নেই।'[৪০]

এই উদ্ধৃতিতে 'কত রকমের' বই যে রবীন্দ্রনাথের নিত্যসঙ্গী ছিল তারই দৃষ্টান্ত হিসাবে এক দিকে 'নেপালীজ বুদ্ধিষ্টিক লিটারেচর' এবং অন্যদিকে শেক্‌স্‌পীয়রের নাম উল্লিখিত হয়েছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'নেপালের সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য' থেকে প্রত্যক্ষভাবে কবি যে-সব কবিতা ও নাটকের উপাদান সংগ্রহ করেছেন তার একটা আভাস পাওয়া যায় কবি-পঠিত ওই গ্রন্থের প্রথমে কবিহস্তে-লিখিত তালিকা থেকে। ওই গ্রন্থের যে কাহিনীগুলি তিনি তাঁর কবিতা ও নাটকে ব্যবহার করেছেন তার নাম ও পৃষ্ঠাসংখ্যা সেখানে তিনি লিখে রেখেছেন। গ্রন্থের পৃষ্ঠানুসারে সেই তালিকাটি এখানে উদ্ধৃত করা হল: ২০ মূল্যপ্রাপ্তি, ৩৩ শ্রেষ্ঠভিক্ষা, পূজারিণী, ৬৭ উপগুপ্ত, ১২১ মালিনী, ১৩৫ পরিশোধ, ১৫৯

মস্তকবিক্রয়, ২৩৪ চণ্ডালী, ২৯৮ নগরলক্ষ্মী। এই তালিকায় 'সামান্য ক্ষতি'র উল্লেখ নেই। এই রচনাগুলির মধ্যে মূল্যপ্রাপ্তি, শ্রেষ্ঠভিক্ষা ও পূজারিণী অবদানশতক থেকে, পরিশোধ ও মস্তকবিক্রয় মহাবস্তুবদান থেকে ; অভিসার বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা, নগরলক্ষ্মী কল্পদ্রুমাবদান এবং সামান্য ক্ষতি দিব্যাবদানমালা থেকে রাজেন্দ্রলাল-সংকলিত ও ইংরেজিতে অনূদিত কাহিনী থেকে গৃহীত। 'চণ্ডালী' ['চণ্ডালিকা' নামে ১৯৩৩ সালে নাট্যাকারে প্রকাশিত] শার্দূলকর্ণাবদানের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। আমাদের বিশ্বাস, এই 'চণ্ডালী'র প্রথম প্রকাশ ঘটেছে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকের অস্পৃশ্যা অনার্যা রঘুদুহিতার মধ্যে। 'মালিনী' নাটক প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩০৩ সালের আশ্বিন মাসে। কবিতাগুলি 'কথা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। সবগুলিই ১৩০৬ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লেখা। এই কাহিনী-কবিতাগুলির প্রত্যক্ষ প্রেরণালাভের পূর্বেই রবীন্দ্রমানসে বৌদ্ধ মৈত্রীভাবনার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায়।

কিন্তু তখনো কবিমানসে ধর্মের প্রেরণা 'কোনো dogma বা system'-এর রূপ পরিগ্রহ করেনি। ১৮৯৫ সালের এগারো ফেব্রুয়ারি তারিখে ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিতে কবি লিখেছেন, 'আমি যে কী ভাবে জগৎসংসারকে দেখে থাকি, সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে আমার যে খুব একটা নিগূঢ় অন্তরঙ্গ সত্যিকার সজীব সম্পর্ক আছে, এবং সেই প্রীতি সেই আত্মীয়তাকেই যে আমি যথার্থ এবং সর্বোচ্চ ধর্ম বলে জ্ঞান এবং অনুভব করি এবং আমার এই অন্তরপ্রকৃতিটি না বুঝলে যে আমার অধিকাংশ কবিতার রসাস্বাদনই, এমন কি অর্থ গ্রহণ করা যায় না—এই কথাটা আমি তাঁকে [ শিলাইদহে কবির জনৈক নিত্য-ভ্রমণসঙ্গীকে ] বোঝাচ্ছিলুম।... আমার যে ধর্ম এটা নিত্যধর্ম, এর উপাসনা নিত্য-উপাসনা। কাল রাস্তার ধারে একটা ছাগ-মাতা গম্ভীর অলস স্নিগ্ধভাবে ঘাসের উপর বসে ছিল এবং তার ছানাটা তার গায়ের উপরে ঘেঁষে পরম নির্ভরে গভীর আরামে পড়ে ছিল—সেটা দেখে আমার মনে যে-একটা সুগভীর রসপরিপূর্ণ প্রীতি এবং বিস্ময়ের সঞ্চার হল আমি সেইটেকেই আমার ধর্মালোচনা বলি। এই-সমস্ত ছবিতে চোখ পড়বা মাত্রই সমস্ত জগতের ভিতরকার আনন্দ এবং প্রেমকে আমি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎভাবে আমার অন্তরে অনুভব করি। এছাড়া অন্যান্য যা কিছু dogma আছে, যা আমি কিছুই জানি নে এবং বুঝি নে এবং বোঝবার সম্ভাবনা দেখি নে, তা নিয়ে আমি কিছুমাত্র ব্যস্ত হই নে।'[৪১]

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার আরেকটি অভিজ্ঞতার কথাও বলা প্রয়োজন। ৬৭ বৎসর বয়সে (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৭) 'জাভাযাত্রীর পত্র' গ্রন্থের ১৯-সংখ্যক পত্রে কন্যা মীরা দেবীকে বোরোবুদুরের মন্দিরগাত্রে 'বহুশত বুদ্ধমূর্তি ও বুদ্ধের জাতককথার ছবিগুলি' দেখে লিখছেন, 'পাথরে-খোদা জাতকমূর্তিগুলি আমার ভারি ভালো লাগল—প্রতিদিনের প্রাণলীলার অজস্র প্রতিরূপ……। এই মন্দিরে দেখতে পাই সর্বজনকে—রাজা থেকে আরম্ভ করে ভিখারি পর্যন্ত। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রবল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে, এর মধ্যে শুদ্ধ মানুষের নয়, অন্য জীবেরও, যথেষ্ট স্থান আছে। জাতক-কাহিনীর মধ্যে খুব একটা মস্ত কথা আছে, তাতে বলেছে, যুগ যুগ ধরে বুদ্ধ সর্বসাধারণের মধ্য দিয়েই ক্রমশ প্রকাশিত। প্রাণীজগতে নিত্যকাল ভালোমন্দর যে দ্বন্দ্ব চলেছে সেই দ্বন্দ্বের প্রবাহ ধরেই ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বুদ্ধের মধ্যে অভিব্যক্ত। অতি সামান্য জন্তুর ভিতরেও অতি সামান্য রূপেই এই ভালোর শক্তি মন্দর ভিতর দিয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তুলছে, তার চরম বিকাশ হচ্ছে অপরিমেয় মৈত্রীর শক্তিতে আত্মত্যাগ। জীবে জীবে লোকে লোকে সেই অসীম মৈত্রী অল্প অল্প করে নানা দিক থেকে আপন গ্রন্থি মোচন করছে, সেই দিকেই মোক্ষের গতি। জীব মুক্ত নয় কেননা আপনার দিকেই তার টান; সমস্ত প্রাণীকে নিয়ে ধর্মের যে-অভিব্যক্তি তার প্রণালীপরম্পরায় সেই আপনার দিকে টানের 'পরে আঘাত লাগছে। সেই আঘাত যে-পরিমাণে যেখানেই দেখা যায় সেই পরিমাণে সেখানেই বুদ্ধের প্রকাশ। মনে আছে, ছেলেবেলায় দেখেছিলুম, দড়িতে বাঁধা ধোপার বাড়ির গাধার কাছে এসে একটি গাভী স্নিগ্ধচক্ষে তার গা চেটে দিচ্ছে, দেখে আমার বড়ো বিস্ময় লেগেছিল। বুদ্ধই-যে তাঁর কোনো এক জন্মে সেই গাভী হতে পারেন, একথা বলতে জাতককথা-লেখকের একটুও বাধত না।'[৪২]

ছেলেবেলার এই 'বিস্ময়'ই রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের মর্মমূলে প্রেরণাশীল ছিল। ছেলেবেলার এই ধোপার গাধা ও গাভী, আর ছিন্নপত্রাবলীর ছাগমাতা ও ছাগশিশুর ছবি দেখেই কবির মনে একটা সুগভীর রসপরিপূর্ণ প্রীতি এবং বিস্ময়ের সঞ্চার হত। ছিন্নপত্রাবলীর উদ্ধৃত চিঠি থেকে অবশ্যই বলা যায় যে, চৌত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনার মূল কথা হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে 'খুব একটা নিগূঢ় অন্তরঙ্গ সত্যিকার সজীব সম্পর্ক।' 'সেই প্রীতি সেই আত্মীয়তাকেই সেদিন তিনি 'যথার্থ এবং সর্বোচ্চ ধর্ম বলে জ্ঞান এবং অনুভব' করতেন। ছিন্নপত্রাবলীর আলোচ্য চিঠি যখন লেখা হয়েছে তখন কবিজীবনে চলছে 'সোনার

তরী'র পরবর্তী 'চিত্রা'র যুগ। কবি লিখেছেন, 'এই সমস্ত ছবিতে চোখ পড়বামাত্রই সমস্ত জগতের ভিতরকার আনন্দ এবং প্রেমকে আমি অত্যন্ত সাক্ষাৎভাবে আমার অন্তরে অনুভব করি।' কবিমানসের এই বিশ্বানুভূতিরই অভিনব প্রকাশ ঘটেছে 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায়। মাতা যেমন প্রাণ দিয়েও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন সর্বজীবের প্রতি সেই অপরিমেয় মানসের উদ্ভব রবীন্দ্রকবিমানসে কিভাবে জন্মলাভ করেছিল তারই অতুলনীয় কাব্যরূপ 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতা।

## উল্লেখপঞ্জী


১ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্ররচনাবলী ( বিশ্বভারতী সং ) চতুর্দশ খণ্ড, পৃ ৫১০।

২ রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ-১, পৃ ৮।

৩ রবীন্দ্ররচনাবলী-১, পৃ ২৩।

৪ তদেব, পৃ ৬১।

৫ রবীন্দ্ররচনাবলী-২, পৃ ৯৬।

৬ রবীন্দ্ররচনাবলী ১৪, পৃ ৭৩-৭৪।

৭ 'জন্মদিনে', কবিতা সংখ্যা ৯, পৃ ১২।

৮ রবীন্দ্ররচনাবলী-১৮, পৃ ৪৫০।

৯ জয়দেবই গীতগোবিন্দের দশাবতার-স্তোত্রে বুদ্ধাবতারের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় বলেছিলেন· 'কারুণ্যমাতন্বতে।'

১০ রবীন্দ্রনাথের 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থ, পৃ ১২।

১১ তদেব, পৃ ১৭।

১২ 'রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি', ডঃ বড়ুয়া, পৃ ২২।

১৩ সাম্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং, পৃ ৬-৭।

১৪ রবীন্দ্ররচনাবলী-১৭, পৃ ৪০৯-১০।

১৫ দ্রষ্টব্য, উক্ত গ্রন্থের পৃ ১১৬-১২২।

১৬ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত-২, সমালোচনা, পৃ ৫৭-৬১।

১৭ তদেব, পৃ ৫৮।

১৮ র র-৭, পৃ ৯।

১৯ Rabindranath Tagore, A Biography, 1962, পৃ ১৭১

২০ দ্রষ্টব্য, Collected Poems and plays of Rabindranath Tagore, ম্যাকমিলন, ১৯৫২, পৃ ৪৬১-৪৭৯।

২১ র-র ৪, মালিনীর 'সূচনা',

২২ র র-১৭, পৃ ৪১৩।

২৩ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী-১, পুলিনবিহারী সেন, পৃ ১৮৭।

২৪ দ্রষ্টব্য, র-র ২, পৃ ৪৮৭-৮৮।

২৫ 'রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি', পৃ ২৪।

২৬ 'রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস', পৃ ৭০।

২৭ 'ব্রহ্মবিহার', বুদ্ধদেব, পৃ ২১।

২৮ তদেব, পৃ ৩১।

২৯ তদেব, পৃ ২৯।

৩০ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস, পৃ ৭২।

৩১ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ৩৪, পৃ ৮০-৮১।

৩২ তদেব, ৭৪।১৫৬।

৩৩ তদেব, ৯১।১৯৮।

৩৪ তদেব, ৭০।১৪৭-৪৮।

৩৫ দ্রষ্টব্য, মৈত্রীসাধনা, সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ ২৫ ২৬।

৩৬ র-র-১৩, পৃ ৩৯৬।

৩৭ ব্রহ্মবিহার, বুদ্ধদেব, পৃ ২৬।

৩৮ বুদ্ধদেব, পৃ ৪৩।

৩৯ তদেব, পৃ ৪৮।

৪০ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ৮৬, পৃ ১৮৭।

৪১ তদেব, ১৮৭।৩৯৯-৪০০।

৪২ জাভাযাত্রীর পত্র, যাত্রী, র-র-১৯, পৃ ৫২০-৫২১।

'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার আদ্যোপান্ত পাণ্ডুলিপি চিত্র 'কবি ও কবিতা' পত্রিকায় বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে প্রকাশিত হয়েছিল। দ্রষ্টব্য, 'কবি ও কবিতা', অষ্টম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ ১৪৫-৫০।

## অসমাপ্ত

১

আমি কে—এই প্রশ্ন, অর্থাৎ সত্তার রহস্যজিজ্ঞাসা রবীন্দ্র-কবিজীবনের উত্তরপর্বে বার বার দেখা দিয়েছে। এই জিজ্ঞাসা বিচিত্র স্তরে কবির আত্মোপলব্ধিরই কাব্যরূপ। মর্ত থেকে বিদায় নেবার মাত্র কয়েকদিন আগে এই পর্যায়ের সর্বশেষ কবিতা রচিত হয়েছে। তাতে কবি বলছেন :

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে,—
কে তুমি।
মেলেনি উত্তর॥

বৎসর বৎসর চলে গেল
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিম সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর॥[১]

সত্তার অপবিজ্ঞেয় রহস্যময়তাই এই কবিতায় অভিব্যঞ্জিত। আর, বলাই বাহুল্য, কবির আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে অন্তহীন বিস্ময় নিয়ত-ক্রিয়াশীল ছিল বলে তাঁর অন্তিম জিজ্ঞাসাও অপরিসীম রহস্যে আবৃত ছিল।

'শেষ সপ্তক' কাব্যগ্রন্থের নয়-সংখ্যক কবিতাটি এই পর্যায়ের একটি উল্লেখ্য কবিতা। প্রথমেই উক্ত কবিতার অপ্রকাশিতপূর্ব প্রথম পাঠটি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে ধৃত হল। পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির নাম ছিল 'অসমাপ্ত'। কাব্যগ্রন্থে প্রকাশকালে কোনো নাম নেই, গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতার ক্রমিক সংখ্যায় নবম কবিতা। প্রকাশিত পাঠের সঙ্গে পাণ্ডুলিপিধৃত প্রথম

পাঠের তুলনা কবিতাটির রূপান্তর-বিচারেই শুধু নয়, তাৎপর্য-বিশ্লেষণের দিক দিয়েও সহায়ক হবে :

যাকে বলেছি "সব দিলেম তোমাকে",
লেশমাত্রই দেওয়া হোলো তার হাতে।
সবটার নাগাল পাব কেমন করে ?
সত্তার বিশ্বে বহু দূরে বিস্তৃত আছে অনতিক্রমণীয়,
বহু গভীরে।
এই বিপুল অনাবিষ্কৃত আপনার মধ্যে পথ কোথায় ?

এ যেন অগম্য গ্রহ,
বাষ্প-আবরণে ফাঁক পড়েছে কোণে কোণে,
দূরবীনের সন্ধান সেইটুকুতেই।
আমার অজানা সমগ্রের কোনো নাম নেই,
সে প্রত্যক্ষ ব্যবহারের অতীত।
নামটা যে-পরিচয় নিয়ে
টুকরো অংশের জোড়া-দেওয়া তার রূপ।

চারদিকে ব্যর্থ ও সার্থক কামনার
আলোয় ছায়ায় বিকীর্ণ স্বপ্ন আকাশ।
সেখান থেকে নানা বেদনার রঙীন ছায়া নামে
চিত্ত-ভূমিতে,
হাওয়ায় লাগে শীত বসন্তের ছোঁওয়া ;
সেই অদৃশ্যের চঞ্চল লীলা
কার কাছেই বা স্পষ্ট হোলো ?

ভাষার অঞ্জলিতে
কে ধরতে পারে তাকে ?
জীবন-ভূমির এক প্রান্ত দৃঢ় হয়েছে
কর্মবৈচিত্র্যের বন্ধুরতায়
আর-এক প্রান্তে অচরিতার্থ সাধনা

বাষ্প হয়ে ব্যাপ্ত হচ্ছে শূন্যে,
মরীচিকা হয়ে আঁকচে ছবি।

এই ব্যক্তিজগৎ মানবলোকে দেখা দিল
জন্মমৃত্যুর সংকীর্ণ সঙ্গমস্থলে,
তার আলোকহীন প্রদেশে
বৃহৎ অগোচরতায় পুঞ্জিত আছে
আত্মবিস্মৃত শক্তি,
মূল্য পায়নি এমন মহিমা,
অনঙ্কুরিত সফলতার বীজ মাটির তলায়।
সেখানে আছে ভীরুর লজ্জা,
প্রচ্ছন্ন আত্মাবমাননা,
অখ্যাত ইতিহাস,
আছে আত্মাভিমানের
ছদ্মবেশের বহু উপকরণ,—
সেখানে নিগূঢ় নিবিড় কালিমা
অপেক্ষা করচে মৃত্যুর হাতের মার্জ্জনা।

ছিন্ন ছিন্ন অসম্পূর্ণ এই রচনা,
এ কার জন্যে, এ কিসের জন্যে?
যা ব্যক্ত হোলো কত সূচনায়
তার ধ্বংস হবে অকস্মাৎ নিরর্থকতার অতলে,
সইবে না সৃষ্টির এই বিড়ম্বনা।

অপ্রকাশের পর্দ্দা ফেলেই কাজ করেন গুণী:
আড়ালে রাখেন অসমাপ্ত শিল্পপ্রয়াসকে,
কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়,
সমস্তটা দেখতে পাওয়া নিষেধ।

আমাতে তাঁর ধ্যান সম্পূর্ণ হয় নি,
তাই আমাকে বেষ্টন করে এতখানি নিবিড় নিস্তব্ধতা।

তাই আমি অপ্রাপ্য আমি অচেনা,
অজানার ঘেরের মধ্যে এ সৃষ্টি রয়েছে তারি হাতে,
আর কারো হাতে দেবার সময় হোলো না।—
সবাই রইল দূরে—
যারা বল্‌লে "জানি", তারা জানল না ॥

২

প্রথম পাঠে কবিতাটির আরম্ভ বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো—

যাকে বলেছি "সব দিলেম তোমাকে",
লেশমাত্রই দেওয়া হোলো তার হাতে।
সবটার নাগাল পাব কেমন করে?
সত্তার বিশ্বে বহু দূরে বিস্তৃত আছে অনতিক্রমণীয়,
বহু গভীরে।
এই বিপুল অনাবিষ্কৃত আপনার মধ্যে পথ কোথায়?

প্রচলিত পাঠে এই অংশ হয়েছে—

ভালোবেসে মন বললে—
"আমার সব রাজত্ব দিলেম তোমাকে।"
অবুঝ ইচ্ছাটা করলে অত্যুক্তি,
দিতে পারবে কেন?
সবটার নাগাল পাব কেমন ক'রে?
ও যে একটা মহাদেশ
সাত সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন।
ওখানে বহু দূর নিয়ে একা বিরাজ করছে
নির্বাক্ অনতিক্রমণীয়।

এই পরিবর্তনে দেখা যাচ্ছে, 'সব' দেওয়া হয়েছে 'আমার সব রাজত্ব' দেওয়া। পরিবর্তনে সম্প্রদানটি নির্দিষ্ট হয়ে কিছুটা সংকুচিত হয়েছে। কেননা 'আমার সব রাজত্বে'র চেয়ে 'আমার সব' অনেক বেশি। অবশ্য ব্যঞ্জনায় দুয়েরই ব্যাপ্তি সীমাহীন। তাছাড়া পরিবর্তিত পাঠে দানের উৎসমূলে রয়েছে ভালোবাসা।

পরিবর্তিত পাঠে এই অংশে নতুন ভাবনা সংযোজিত হয়েছে। সবটার নাগাল না-পাওয়ার হেতুনির্দেশ করে কবি বলছেন, 'ও যে একটা মহাদেশ / সাত সমুদ্রে

বিচ্ছিন্ন।' এই সংযোজন আর্নল্ডের কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রাক্তন ঋণের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। 'প্রাচীন সাহিত্যে'র 'মেঘদূত' প্রবন্ধে তার উল্লেখ করে কবি বলেছিলেন, 'মানুষেরা এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র।' বর্তমান প্রসঙ্গে সাত সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন এই মহাদেশের কল্পনাটি কিন্তু সুপ্রযুক্ত হয়নি। কেননা, প্রথম পাঠে এর পরেই আছে, 'এ যেন অগম্য গ্রহ।' এই গ্রহের উৎপ্রেক্ষাটি প্রচলিত পাঠেও অপরিবর্তিতই রয়েছে। তাই তার আগে সাত সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন মহাদেশের কল্পনা সুসঙ্গত নয়।

অগম্য গ্রহের সঙ্গে উপমিত সত্তার অনাবিষ্কৃত রহস্যের আভাস দিয়েই দ্বিতীয় স্তবক সমাপ্ত হয়েছে। বাষ্প-আবরণে আবৃত এই গ্রহের যেখানে একটু ফাঁক পড়েছে সেখানেই দূরবীনের সন্ধান চলে। বাকি সবটুকুই অজ্ঞাত। 'সে প্রত্যক্ষ ব্যবহারের অতীত।' প্রথম পাঠের এই নিশ্চিতার্থক বাক্যটি প্রচলিত পাঠে জিজ্ঞাসার রূপ নিয়ে অনেক ব্যঞ্জনাবহ হয়েছে—'তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব্যবহারের সম্পর্ক হবে কার?'

তৃতীয় স্তবকে আছে ব্যর্থ ও সার্থক কামনা এবং চরিতার্থ ও অচরিতার্থ সাধনার কথা। ব্যর্থ ও সার্থক কামনার আলোয় ছায়ায় বিকীর্ণ আকাশ থেকে নানা বেদনার রঙিন ছায়া নামে চিত্তভূমিতে। সেই অদৃশ্যের চঞ্চল লীলা কার কাছেই বা স্পষ্ট হল? ভাষার অঞ্জলিতে কে ধরতে পারে তাকে? সত্তার একদিকে রয়েছে কামনা-বাসনার এই অনির্বাচ্য লীলারহস্য, অন্যদিকে রয়েছে কর্মবৈচিত্র্যের বন্ধুরতায় দৃঢ় জীবনভূমির দুই প্রান্ত। সেখানে অচরিতার্থ সাধনা বাষ্প হয়ে মেঘান্বিত শূন্যে মরীচিকার ছায়াছবি রচনা করছে। এই বিশ্লেষণে বাষ্প-আবরণে আবৃত অগম্য গ্রহের তাৎপর্যটি সম্পূর্ণান্বিত হল।

চতুর্থ স্তবকে এই 'ব্যক্তিজগৎ' 'মানবলোকে' দেখা দিয়েছে জন্মমৃত্যুর সংকীর্ণ সংগমস্থলে। 'তার আলোকহীন প্রদেশে / বৃহৎ অগোচরতায় পুঞ্জিত আছে / আত্মবিস্মৃত শক্তি।' আছে মূল্য পায়নি এমন মহিমা আর অনঙ্কুরিত সফলতার বীজ মাটির তলায়। সেখানে আছে ভীরুর লজ্জা, প্রচ্ছন্ন আত্মাবমাননা, অখ্যাত ইতিহাস, আর আছে আত্মাভিমানের ছদ্মবেশের বহু উপকরণ। জন্মমৃত্যুর সংকীর্ণ সংগমে মানবলোকের এই ব্যক্তিজগতের 'নিগূঢ় নিবিড় কালিমা' অপেক্ষা করছে মৃত্যুর হাতের মার্জনা।

কিন্তু যা নিয়ে এল কত সূচনা, কত ব্যঞ্জনা, বহু বেদনায় বাঁধা হতে চলল

যার ভাষা, পৌঁছল না যা বাণীতে, তার ধ্বংস হবে অকস্মাৎ নিরর্থকতার অতলে, সৃষ্টির এই বিড়ম্বনা কবির কাছে অবিশ্বাস্য। 'বিড়ম্বনা' শব্দটি পরিবর্তিত পাঠে হয়েছে 'ছেলেমানুষি'।

মানবলোকে ব্যক্তিসত্তার অসম্পূর্ণ রূপকে প্রথম পাঠে কবি বলেছিলেন, 'ছিন্ন ছিন্ন অসম্পূর্ণ এই রচনা।' পরিবর্তিত পাঠে তা হয়েছে 'এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি।' এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি মৃত্যুতে নিরর্থকতার অতলে ধ্বংস হয়ে যাবে—একথা কবি ভাবতেও পারেন না। 'শেষ সপ্তক'-এর পঁয়ত্রিশ-সংখ্যক কবিতায় তাই তিনি বলেছেন—

মাটির তলায় সুপ্ত আছে বীজ।
তাকে স্পর্শ করে চৈত্রের তাপ,
মাঘের হিম, শ্রাবণের বৃষ্টিধারা।
অন্ধকারে সে দেখছে অভাবিতের স্বপ্ন।
স্বপ্নেই কি তার শেষ?
ঊষার আলোয় তার ফুলের প্রকাশ;
আজ নেই, তাই বলে কি নেই কোনোদিনই?[২]

জন্মমৃত্যুর হরণপূরণ-লীলায় অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের অতীত যে সত্তাচেতনা তারই স্বীকৃতি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কবির এই সারস্বত প্রতীতির মধ্যে।

৩

কবিতাটির শেষ দুই স্তবকে সত্তার অসম্পূর্ণতার একটা অর্থ কবিমানসে ধরা পড়েছে। এই দুই স্তবকে প্রথম পাঠ ও পরিবর্তিত পাঠের মধ্যে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। সত্তাচেতনার এই অপরিবর্তনীয় অংশে কবি বলেছেন, যে-আদিশিল্পীর হাতে তাঁর সত্তার সৃষ্টি, অপ্রকাশের পর্দা টেনেই তিনি কাজ করেন। আড়ালে রাখেন তাঁর অসমাপ্ত শিল্পপ্রয়াসকে। কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। নিষেধ আছে সমস্ত দেখতে পাওয়ার পথে।

রবীন্দ্রনাথের সত্তাচেতনার এই স্তরে পৌঁছে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে, কবি যে-সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করেন কে তিনি? তাঁর স্বরূপই বা কি? হিন্দু-পুরাণের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার রূপকল্প কি কবির অজ্ঞাতসারে তাঁর কল্পনায় পুনরুজ্জীবিত হয়েছে? নাকি ইনি কবির বিশ্বদেবতা-চেতনার বিশ্বকর্মা-মূর্তি? এ-সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া সহজসাধ্য নয়। কিন্তু সত্তার এই সৃজনরহস্যের কথা কবি যৌবনদিনে

'চিত্রা' কাব্যে বিশদীভূত করেছিলেন 'অন্তর্যামী' কবিতায়। সেই অন্তর্যামী-জীবনদেবতা তাঁর লীলার উপযুক্ত করেই কবিজীবনকে রচনা করেছেন,—এই চেতনাই সেখানে লীলাসুন্দর কাব্যরূপ পেয়েছিল—সেখানে কিন্তু কবির জীবনদেবতা নারীমূর্তিতেই দেখা দিয়েছিলেন। কবি তাঁকে বলেছিলেন,

আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা,
আমার বিশ্বরূপী,

চিত্রার যুগে তিনিই কবির সৃষ্টিকর্ত্রীরূপে কল্পিত—

হাসিমাখা তব আনত দৃষ্টি
আমারে করিছে নূতন সৃষ্টি
অঙ্গে অঙ্গে অমৃতবৃষ্টি
বরষি করুণাভরে।

এখানে অবশ্য কবির 'স্বপনমুরতি গোপনচারী' সত্তার সৃষ্টিরহস্যের কথাই বলা হয়েছে। কবিজীবনের উত্তরপর্বে তাঁর সত্তাচেতনা অনেক বেশি ব্যাপকতা পেয়েছে। কাজেই চিত্রার অন্তর্যামী-জীবনদেবতার কল্পনা দিয়ে উত্তরপর্বের এই অন্তর্যামী-বিধাতার স্বরূপ সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হবে না। এই প্রসঙ্গে 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থের 'জন্মদিন' কবিতাটিকে স্মরণ করা যেতে পারে। কবিতাটি লেখা ১৩৪৬ সালের পঁচিশে বৈশাখ। এই কবিতায় কবি তাঁর অনুরক্তজনকে লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমরা যাকে নানা অলংকারে রচনা করেছ তাকে আমিও চিনি না, আমার অন্তর্যামীও চেনেন না। 'বিধাতার সৃষ্টিসীমা / তোমাদের দৃষ্টির বাহিরে।'

এই কবিতায়ও কবি তাঁর সত্তার সৃষ্টিরহস্যের কথা বলেছেন—

কালসমুদ্রের তীরে
বিরলে রচেন মূর্তিখানি
বিচিত্রিত রহস্যের যবনিকা টানি
রূপকার আপন নিভৃতে।

এখানে সত্তার সৃজনকর্তাকে কবি বলেছেন রূপকার। তিনি কালসমুদ্রের তীরে বিরলে, বিচিত্রিত রহস্যের যবনিকা টেনে, আপন নিভৃতে যে মূর্তিখানি রচনা করেন তাকে বাইরে থেকে আলোয় আঁধারে প্রত্যেকে নিজের নিজের মতো করে দেখে। কেননা বিধাতার সৃষ্টিসীমা সকলের দৃষ্টির বাহিরে।

৪

কবিতাটির শেষ স্তবকে কবির বক্তব্য যেন সমে এসে পূর্ণতা পেয়েছে।—

আমাতে তাঁর ধ্যান সম্পূর্ণ হয় নি,
তাই আমাকে বেষ্টন করে এতখানি নিবিড় নিস্তব্ধতা।
তাই আমি অপ্রাপ্য, আমি অচেনা,...

মানবলোকে ব্যক্তিসত্তা তার সৃষ্টিকর্তার অসমাপ্ত শিল্প-প্রয়াস বলেই অপরিজ্ঞেয় রহস্যের আবরণ দিয়ে ঢাকা। সত্তার এই রহস্যময়তা ঃ বিচেতনায় শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৯৪১ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি লেখা, 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতাটি তারই সাক্ষী। বহু জন্মদিনে গাঁথা নিজের জীবনকে বিচিত্র রূপের সমাবেশে প্রত্যক্ষ করে কবি বলছেন—

প্রাণের রহস্য-ঢাকা
তরঙ্গের যবনিকা-'পরে
চেয়ে চেয়ে ভাবিলাম,
এখনো হয়নি খোলা আমার জীবন-আবরণ—
সম্পূর্ণ যে আমি
রয়েছে গোপনে অগোচর।[৩]

ব্যক্তিসত্তার পূর্ণতা গোপনে অগোচর রয়েছে বলেই তা রহস্যময়। অর্থাৎ অসমাপ্তি-জনিত রহস্যময়তাই ব্যক্তিসত্তাকে পরম মূল্য দিয়েছে। অসমাপ্ত অসম্পূর্ণ বলেই পূর্ণতার পথে সত্তার নব-নব উন্মীলনলীলা কবিকল্পনায় অপরিসীম বিস্ময়ে সমাচ্ছন্ন। বলাকার ৩৩-সংখ্যক কবিতায় কবির এই উপলব্ধি অপরূপ কাব্যরূপ পেয়েছিল—

জীবন হতে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে
ফোটে তোমার মানস-সরোবরে—
সূর্যতারা ভিড় ক'রে তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কূলে কূলে
কৌতূহলের ভরে।[৪]

এই স্তবকে সত্তার উন্মীলনলীলা সূর্যতারা অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বলোকের কৌতূহলের বিষয়ীভূত হয়েছে। কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত তাঁর শেষকাব্য-গ্রন্থ 'জন্মদিনে'র ১১-সংখ্যক কবিতায় কবি সত্তার আবির্ভাব-রহস্যকে ধ্বনি-প্রধান মুক্তবন্ধ ছন্দে অনবদ্য কাব্যরূপ দিয়েছেন। কবিতাটি এই প্রসঙ্গে সমগ্রভাবেই উদ্ধারযোগ্য—

কালের প্রবল আবর্তে প্রতিহত
ফেনপুঞ্জের মতো,
আলোকে আঁধারে রঞ্জিত এই মায়া,
অদেহ ধরিল কায়া।
সত্তা আমার, জানি না, সে কোথা হতে
হল উত্থিত নিত্যধাবিত স্রোতে।
সহসা অভাবনীয়
অদৃশ্য এক আরম্ভ-মাঝে কেন্দ্র রচিল স্বীয়।
বিশ্বসত্তা মাঝখানে দিল উঁকি,
এ কৌতুকের পশ্চাতে আছে জানি না কে কৌতুকী।
ক্ষণিকারে নিয়ে অসীমের এই খেলা,
নববিকাশের সাথে গেঁথে দেয় শেষ-বিনাশের হেলা,
আলোকে কালের মৃদঙ্গ উঠে বেজে,
গোপনে ক্ষণিকা দেখা দিতে আসে মুখ-ঢাকা বধূ সেজে
গলায় পরিয়া হার
বুদ্‌বুদ্‌ মনিকার।
সৃষ্টির মাঝে আসন করে সে লাভ,
অনন্ত তারে অন্তসীমায় জানায় আবির্ভাব।[৫]

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, কবির এই অন্তিম সত্তাচেতনায় সৃষ্টিকর্তার আসন গৌণ। এমন কি মনে হয়, কবি যেন ভাববাদী দার্শনিক ভিত্তি থেকে অনেকখানি সরে এসেছেন। কালের প্রবল আবর্তে প্রতিহত ফেনপুঞ্জের মতোই অ-দেহ দেহরূপ ধারণ করেছে। কবির জানা নেই, নিত্যধাবিত স্রোতে এই সত্তা কোথা হতে উত্থিত হল। তিনি শুধু এটুকু জেনেছেন, 'আলোকে আঁধারে রঞ্জিত এই মায়া।' আর জেনেছেন, এই মায়া ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণস্থায়ী বলেই সে ক্ষণিকা। আলোকে কালের মৃদঙ্গ বেজে উঠলে এই ক্ষণিকা গলায় বুদ্‌বুদ্‌-মনিকার হার পরে মুখঢাকা বধূ সেজে গোপনে দেখা দিতে আসে। তাকে নিয়ে অসীমের খেলাটি বড়ই নির্মম। নববিকাশের সাথে শেষ-বিনাশের অবহেলা এই খেলায় তার অমোঘ নিয়তি। তবু বিশ্বসৃষ্টিতে তার নিজস্ব আসনটি সে লাভ করেছে। এবং 'অনন্ত তারে অন্তসীমায় জানায় আবির্ভাব।' তিরোধানকে নিত্যসঙ্গী করে সত্তার এই আবির্ভাব ক্ষণিকের হয়েও অনন্তের দোসর। কবিতাটি 'বলাকা'র 'চঞ্চলা'কে স্মরণ করিয়ে দেবে। চঞ্চলায়

কবিকল্পনা নভোবিহারী হয়েছিল, এই কবিতায় কবির নির্মোহ দৃষ্টি ব্যক্তি-সত্তার রহস্যলোকে গহনচারী।

৫

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কবির সত্তাচেতনা স্পষ্টত দুভাগে বিভক্ত। শেষ সপ্তকের 'অসমাপ্ত' কবিতায় [ রচনা ২৭. ৩. ১৯৩৫ ] কবির সত্তাচেতনায় সৃষ্টিকর্তার ভূমিকা রয়েছে, কিন্তু জন্মদিনের এগারো-সংখ্যক কবিতায় [ রচনা ১৩৪৭ বৈশাখ ] স্রষ্টা অনুপস্থিত। কবি বলছেন,

সত্তা আমার, জানি না, সে কোথা হতে
হল উত্থিত নিত্যধাবিত স্রোতে।

স্বভাবতই রবীন্দ্র কাব্য-পাঠকের মনে এই প্রশ্ন জাগ্রত হবে যে, কি করে এমনটি সম্ভব হল।

এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে সূত্রাকারেই একটি কথা বলা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের জন্মলগ্নে প্রাচীন প্রাচী এবং নবীন প্রতীচী যথাক্রমে উজ্জীবিত ও আবিভূত হয়েছে তাঁর অস্তিত্বের ভাবভূমিতে। বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ঔরসজাত সন্তান হলেও তাঁর মানসবিকাশে উনিশ শতকীয় অভিব্যক্তিবাদের প্রভাবও ক্রিয়াশীল ছিল। এই সৃষ্টিবাদ ও অভিব্যক্তিবাদ রবীন্দ্রকবিমানসে 'রাসায়নিক সমবায়ে' একীভূত হয়েছিল, না নিতান্তই 'সামান্য মিশ্রণে' সহাবস্থান লাভ করেছিল, এ কঠিন প্রশ্নের উত্তর সহজ-লভ্য নয়।

এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি তাঁর মানসবিশ্লেষণে সহায়ক হতে পারে। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে লেখা 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁর পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত যে জীবনের কথা কবি বলেছেন তাতে তিনি স্পষ্টই স্বীকার করেছেন, 'আমাদের পরিবারে যে-ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না— তাহাকে আমি গ্রহণ করি নাই।'৬ উক্তিটি 'জীবনস্মৃতি'র 'ভগ্নহৃদয়' আলোচনার অন্তর্গত। এই আলোচনায় কবির যে বয়সের কথা বলা হয়েছে তা মুখ্যত তাঁর 'পনেরো-ষোলো' থেকে 'বাইশ তেইশ বৎসর' বয়স পর্যন্ত।

'ছিন্নপত্রাবলী'র ১৮৭-সংখ্যক চিঠিতে আছে কবির ৩৪ বৎসর বয়সের ধর্মবোধের কথা। ১৮৯৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ইন্দিরা দেবীকে অন্তরঙ্গ ভাষায় কবি লিখেছেন প্রীতিধর্মকেই তিনি সর্বোচ্চ ধর্ম মনে করেন। লিখছেন, 'আমি যে কীভাবে জগৎ-সংসারকে দেখে থাকি, সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে আমার যে খুব

একটা নিগূঢ় অন্তরঙ্গ সত্যিকার সজীব সম্পর্ক আছে, এবং সেই প্রীতি সেই আত্মীয়তাকেই যে আমি যথার্থ এবং সর্বোচ্চ ধর্ম বলে জ্ঞান এবং অনুভব করি এবং আমার এই অন্তর প্রকৃতটি না বুঝলে [যে] আমার অধিকাংশ কবিতার রসাস্বাদন, এমন-কি, অর্থগ্রহণ করা যায় না।'[৭]

এই চিঠিতেই কবি পুনশ্চ লিখছেন, 'কাল রাস্তার ধারে একটা ছাগ-মাতা গম্ভীর অলস স্নিগ্ধভাবে ঘাসের উপরে বসেছিল এবং তার ছানাটা তার গায়ের উপরে ঘেঁষে পরম নির্ভরে গভীর আরামে পড়েছিল—সেটা দেখে আমার মনে যে একটা সুগভীর রসপরিপূর্ণ প্রীতি এবং বিস্ময়ের সঞ্চার হল আমি 'সেইটেকেই আমার ধর্মালোচনা বলি'…'এ ছাড়া অন্যান্য যা-কিছু dogma আছে, যা আমি কিছুই জানি নে এবং বুঝিনে এবং বোঝবার সম্ভাবনা দেখি নে, তা নিয়ে আমি কিছুমাত্র ব্যস্ত হইনে'।[৮]

এই উদ্ধৃতিতে 'প্রীতি এবং বিস্ময়'-বোধকেই কবি তাঁর ধর্মচেতনার দুটি মুখ্য উপাদান বলেছেন—এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। পরবর্তী জীবনে এই 'বিস্ময়'বোধই বিচিত্রভাবে রবীন্দ্রনাথের সত্তাচেতনার মূলে ক্রিয়াশীল ছিল।

'অসমাপ্ত' কবিতার পাণ্ডুলিপি ধৃত পাঠে আছে

সত্তার বিশ্বে বহু দূরে বিস্তৃত আছে অনতিক্রমণীয়,
বহু গভীরে।
এই বিপুল অনাবিষ্কৃত আপনার মধ্যে পথ কোথায়?

এই 'অনতিক্রমণীয়', 'বিপুল অনাবিষ্কৃত আপনার' রহস্যই 'সত্তার বিশ্বে' বিরাজমান।

৬

ছিন্নপত্রাবলী থেকে উদ্ধৃত ১৮-সংখ্যক চিঠিতে দেখা যাচ্ছে কবি কোনো 'dogma'-কেই স্বীকার করতে চান নি। কিন্তু সৃষ্টিবাদেও যেমন 'dogma' আছে, অভিব্যক্তিবাদেও তেমনি 'dogma' আছে। তাহলে কি কোনো মতবাদের প্রতিই রবীন্দ্রনাথের আনুগত্য নেই? এই প্রসঙ্গে ১৩২৪ সালের আশ্বিন কার্তিক মাসের 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে কবি বলেছেন, 'আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনোই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে

তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নাড়ির শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণবান করতে চাই, তার পরে জীবনে সুখ পাই আর না-পাই আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি।'[৯]

কবির সত্তাচেতনা প্রসঙ্গে ধর্মচেতনার কথা ওঠে এই জন্য যে, সত্তা 'সৃষ্ট', না 'অভিব্যক্ত',—এই প্রশ্নের উত্তর না পেলে মূল প্রশ্নই অনুত্তরিত থেকে যাবে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে সত্তাচেতনার প্রথম আলোচনার সন্ধান পাওয়া যাবে কবির একুশ বৎসর বয়সের একটি রচনায়। রচনাটির নাম 'ডি প্রোফণ্ডিস্'। 'ভারতী'র ১২৮৮ সালের আশ্বিন-সংখ্যায় রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল। 'De Profundis' কবিতাটি টেনিসনের লেখা। তাঁর সন্তানের জন্মোপলক্ষে রচিত। অবশ্য এখানে 'কে তুমি' এই প্রশ্ন নয়, 'কোথা থেকে তুমি,' 'কোন্ রহস্যময় উৎস থেকে তোমার আবির্ভাব'—এই প্রশ্নেরই উত্তর কবিকল্পনায় কাব্যরূপ পেয়েছে।

টেনিসন কবিতাটিকে বলেছেন 'The Two Greetings'। প্রথম সংবর্ধনা নিজের সন্তানকে, দ্বিতীয় সংবর্ধনা 'সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে যে একটি অপরিসীম মহান ভাব, অপরিমেয় রহস্য আবদ্ধ আছে' তারই উদ্দেশে। এই অপরিমেয় রহস্যের উদ্দেশেই কবি বলছেন, 'বৎস আমার, মহা সমুদ্র হইতে যেখানে যাহা-কিছু-ছিল-র মধ্যে যাহা-কিছু-হইবে ( অর্থাৎ অতীতের মধ্যে ভবিষ্যৎ, অপরিস্ফুটতার মধ্যে পরিস্ফুটতা ) কোটি কোটি যুগ যুগান্তর ধরিয়া অগণ্য আবর্তমান জ্যোতিঃপুঞ্জের মহা মরুর মধ্যে ঘূর্ণ্যমান হইতেছিল, তুমি সেইখান হইতে আসিতেছ। সেইখান হইতেই সূর্য আসিয়াছে, পৃথিবী ও চন্দ্র আসিয়াছে, এবং তাহার অন্যান্য গ্রহ সহোদরগণ আসিয়াছে।'

এই 'অপরিমেয় রহস্য' কিন্তু মর্ত্যসীমায় আবির্ভূত হয়ে জন্মমৃত্যুর আবির্ভাব-তিরোভাবের নিয়মাধীন। কিন্তু 'যে সূত্র বহিয়া এই সন্তান আসিয়াছে, সেই সূত্রের শেষ হইল না।' এই অশেষের উদ্দেশেই কবির দ্বিতীয় সম্ভাষণ। এই সত্তায় সে অনন্ত পথের পথিক। সেই 'মহাকালের অতিথি'কেই কবির অন্তরঙ্গ সম্ভাষণ। সেখানে 'সমস্তই রহস্য'। সেখানে 'বাঁচিয়া থাকার অর্থ মর্ত্য জীবন নহে, অনন্ত চেতনা'।[১০]

এই প্রবন্ধের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'সত্তাচেতনা'র নানাসূত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে। টেনিসন অবশ্য ঈশ্বর-বিশ্বাসী কবি। কাজেই তাঁর কবিতার প্রেরণামূলে আছে 'সৃষ্টিবাদ'। কিন্তু কবিকল্পনায় সৃষ্টিরহস্যের অনুভূতিতে 'অভিব্যক্তিবাদ'ও যে ছায়া ফেলেছে সে কথা অস্বীকার করা যাবে না।

রবীন্দ্রনাথের সত্তাচেতনার আলোচনায় 'ডি প্রোফণ্ডিস'-এর গুরুত্ব অপরিসীম। কবি নিজেও তাঁর একুশ বৎসর বয়সে লেখা এই প্রবন্ধটিকে ১৩১৪ সালে প্রকাশিত তাঁব 'আধুনিক সাহিত্যে'র অন্তর্ভুক্ত করে এই প্রবন্ধের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন।[১১]

৭

রবীন্দ্রমানসে 'সৃষ্টিবাদ' ও 'অভিব্যক্তিবাদে'র আপেক্ষিক প্রভাবের প্রসঙ্গে আমরা জীবনস্মৃতির সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি। সেখানে তিনি বলছেন, 'আমাদের পরিবারে যে-ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না—আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই।' কেন করেন নাই, তার সম্ভাব্য দুটি হেতু হতে পারে। একটি হচ্ছে কবির মনঃপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। তাব সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কথনোই আমাব ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরকালের সাধনা।' [ 'আমার ধর্ম', আত্মপরিচয়।

আরেকটি সম্ভাব্য হেতু দেশকালের প্রভাব। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি বলেছেন, 'তথনকার কালের য়ুরোপীয সাহিত্যে নাস্তিকতাব প্রভাবই প্রবল।' 'নাস্তিকতা আমাদেব একটি নেশা ছিল'।[১২]

উনবিংশ শতাব্দীতে ডারুইন-প্রবর্তিত, এবং তাঁর উত্তরসূরিগণের দ্বারা পরিশোধিত, 'অভিব্যক্তিবাদে'র তত্ত্ব যুগসচেতন ব্যক্তিমাত্রকেই আকর্ষণ করেছে। Patrick Geddes তাঁর Evolution গ্রন্থে বলেছেন,

It is an easy thing for us to say that the world of life we see around us to-day has evolved , with equal ease our grandparents said that it had been created'[১৩]

প্রাচ্যের সন্তান রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অবশ্য অত সহজে নব্যতন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া সম্ভব ছিল না। ঔপনিষদ ধর্ম তাঁর সংস্কারের মর্মমূলে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু প্রতীচ্যসংস্পর্শে এসে তিনি যে অভিব্যক্তিবাদের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন তার পরিচয় তাঁর কাব্যসাহিত্যে দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

'মানসী'র যুগে 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' কবিতায় কবি এই সৃষ্টিকে বলেছেন 'জড়ময় সৃজনের স্রোত'। 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতায় জড়শক্তি আর প্রাণশক্তির 'দ্বন্দ্ব' কবিমানসকে বিচলিত করেছে। কবিতার উপসংহারে কবিমানসে প্রশ্ন জেগেছে :

জড় দৈত্য শক্তি হানে, মিনতি নাহিক মানে,
প্রেম এসে কোলে টানে, দূর করে ভয়।
একি দুই দেবতার দ্যূতখেলা অনিবার
ভাঙাগড়াময় ?
চিরদিন অন্তহীন জয়পরাজয় ?

এই দুর্বিষহ দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে 'সোনার তরী' কাব্যে। 'সমুদ্রের প্রতি' ও 'বসুন্ধরা' কবিতায় অভিব্যক্তিবাদের সুস্পষ্ট ছায়াপাত হয়েছে। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় সমুদ্রের তীরে বসে কবি বলছেন,

আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে
শুনিতেছি ধ্বনি তব। ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম তার – বোবার ইঙ্গিত ভাষা হেন
আত্মীয়ের কাছে। মনে হয়, অন্তরের মাঝখানে
নাড়িতে যে রক্ত বহে, সে-ও যেন ওই ভাষা জানে,
আর-কিছু শেখে নাই।

'বসুন্ধরা' কবিতায় 'পৃথিবীর শিশু'-চিত্তে একই অনুভূতি ভাষা পেয়েছে ·

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের। তোমার মৃত্তিকা-সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি, আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু।

'সোনার তরী'র যুগে কবির 'সর্বানুভূতি' অভিব্যক্তিবাদের দ্বারা অনেকখানি প্রাণিত। তাই জীবধাত্রী বসুন্ধরার কাছে তাঁর আকুল প্রার্থনা ·

আমারে ফিরায়ে লও
সেই সর্ব-মাঝে, যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্ররূপে—গুঞ্জরিছে গান

শতলক্ষ সুরে, উচ্ছ্বসি উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গীতে, প্রবাহি যেতেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে, ছিদ্রে ছিদ্রে বাজিতেছে বেণু,—

প্যাট্রিক গেডেস তাঁর গ্রন্থের 'Great Steps in Evolution' অধ্যায়ে বলেছেন, 'Life is as old as matter'। পুনশ্চ তাঁর বক্তব্য: 'It may be that what we call "living" evolved in Nature's laboratory from what we call "not-living"'[১৪]

'সোনার তরী'র কবির 'সমুদ্রের প্রতি' এবং 'বসুন্ধরা' কবিতা মূলত এই বক্তব্যকেই পরোক্ষভাবে সমর্থন করে। অবশ্য 'মানসী' কাব্যের 'অহল্যার প্রতি' কবিতার প্রথমাংশে কবির এই অনুভূতি প্রথম সার্থক কাব্যরূপ পেয়েছিল। সেখানেই প্রথম এই বৃহৎ পৃথিবী জীবধাত্রী জননীমূর্তিতে কবিকল্পনায় ধরা পড়েছে। কবি পাষাণী অহল্যাকে সম্বোধন করে বলছেন:

যে গোপন অন্তঃপুরে জননী বিরাজে,—
বিচিত্রিত যবনিকা পত্রপুষ্পজালে
বিবিধ বর্ণের লেখা—তারি অন্তরালে
রহিয়া অসূর্যম্পশ্য, নিত্য চুপে চুপে
ভরিছে সন্তানগৃহ ধনধান্যরূপে
জীবনে যৌবনে, সেই গূঢ় মাতৃকক্ষে
সুপ্ত ছিলে এতকাল ধরণীর বক্ষে,
চিররাত্রি সুশীতল বিস্মৃতি-আলয়ে,
যেথায় অনন্তকাল ঘুমায় নির্ভয়ে
লক্ষ জীবনের ক্লান্তি ধূলির শয্যায়,
নিমেষে নিমেষে যেথা ঝরে পড়ে যায়
দিবসের তাপে শুষ্ক ফুল দগ্ধ তারা,
জীর্ণ কীর্তি, শ্রান্ত সুখ, দুঃখ দাহহারা।

এই উদ্ধৃতি থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মানসীর 'অহল্যার প্রতি' এবং সোনার তরীর 'সমুদ্রের প্রতি' এবং 'বসুন্ধরা' একই সুরে বাঁধা।

৮

'চিত্রা'য় পৌঁছে রবীন্দ্রনাথের সত্তাচেতনা নতুন বাঁক নিয়েছে। সেখানে কবি সত্তার সৃষ্টিকর্তার আসনে বসিয়েছেন 'অন্তর্যামী-জীবনদেবতা'কে। এই জীবন-দেবতাচেতনা কবিমানসে এসেছে প্রেমের পরিশুদ্ধ রূপের উদ্বর্তনের পথ বেয়ে। এই প্রবন্ধের প্রথম দিকে তার আভাস দেওয়া হয়েছে। 'শেষ সপ্তকে'র নয়-সংখ্যক 'অসমাপ্ত' কবিতার পরে দ্বাদশ-সংখ্যক কবিতায় কবি পুনরায় তাঁর সত্তাচেতনাকে ভাষা দিয়েছেন। সেখানে অপরিচয়ের বাষ্পকুহেলিকা বিদূরিত হয়েছে প্রেমের আলোকে। ওই কবিতায় প্রারম্ভে কবি বলছেন·

কেউ চেনা নয়
সব মানুষই অজানা।
চলেছে আপনার রহস্যে
আপনি একাকী।
সেখানে তার দোসর নেই·
... ... ...
এমন সময় কোথা থেকে
ভালোবাসার বসন্ত হাওয়া লাগে,
সীমার আড়ালটা যায় উড়ে,
বেরিয়ে পড়ে চিব অচেনা।[১৩]

সত্তার বিশ্বে দোসর-প্রেমেব এই ভূমিকা ববীন্দ্রকবিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৯

মানসী-সোনাব তরী-চিত্রা চৈতালির যুগ পেরিয়ে কবিজীবনে এল কথা-কাহিনী-কল্পনা-ক্ষণিকার যুগ। এই যুগেই কবির মন প্রাচীন ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করেছে। কল্পনার 'স্বপ্ন' কবিতায় উজ্জয়িনীপুরে তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণ পূর্বজন্মের প্রেমের পথেই চলেছে। কিন্তু কল্পনার 'অনবচ্ছিন্ন আমি'তে তাঁর সত্তাচেতনায় ব্রহ্মের আবির্ভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো:

জলে স্থলে শূন্যে আমি যতদূরে চাই
আপনারে হারাবার নাই কোনো ঠাঁই।
জলস্থল দূর করি ব্রহ্ম অন্তর্যামী,
হেরিলাম তার মাঝে স্পন্দমান আমি।

'অন্তর্যামী ব্রহ্মে'র মধ্যে 'স্পন্দমান আমি'কে নিয়েই কবিজীবনে উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সন্ধিলগ্ন কেটেছে। তারপর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ব্রহ্মময় প্রাচীন ভারতেরই জয়ধ্বনি বারবার কবিকণ্ঠে উচ্চারিত। ১৩০৯ সালের [ ১৯০২ ] বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'নববর্ষ' প্রবন্ধে তিনি বলছেন :

'অদ্যকার নববর্ষে আমরা ভারতবর্ষের চিরপুরাতন হইতেই আমাদের নবীনতা গ্রহণ করিব—সায়াহ্নে যখন বিশ্রামের ঘণ্টা বাজিবে, তখনো তাহা ঝরিয়া পড়িবে না—তখন সেই অম্লানগৌরব মাল্যখানি আশীর্বাদের সহিত আমাদের পুত্রের ললাটে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে নির্ভয়চিত্তে সবলহৃদয়ে বিজয়ের পথে প্রেরণ করিব। জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে! যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্বাক, তাহারই জয় হইবে, '[১৬]

ততদিনে কবি হয়েছেন শিক্ষাগুরু। বোলপুরে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' বা আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কবির সেই অভিনব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিভাবে প্রথমে 'শান্তিনিকেতন' এবং পরে 'বিশ্বভারতী' হল তার ইতিহাস এই প্রসঙ্গে অনাবশ্যক।

'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' ( ৭ই পৌষ ১৯০১ ) প্রতিষ্ঠার পূর্বে কবি তাঁর পিতৃদেবের চরণে উৎসর্গ করলেন 'নৈবেদ্য'। [ প্রকাশ আষাঢ় ১৩০৮ ] এই 'নৈবেদ্য' থেকেই 'গীতাঞ্জলি' পর্বের সূত্রপাত। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে একশোটি কবিতা আছে। তার প্রথম একুশ এবং সর্বশেষ কবিতা স্তবকবন্ধে রচিত ধ্বনিপ্রধান বা কলামাত্রিক রীতির গীতিকবিতা। বাকি আটাত্তরটি চতুর্দশপদী সনেটকল্প রচনা। নৈবেদ্যের প্রথম কবিতায় শুরুতে আছে :

প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে,
করি জোড়কর [ হে ] ভুবনেশ্বর
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

সমাপ্তি-কবিতায় কবি বলছেন :

যত বিশ্বাস ভেঙে ভেঙে যায়, স্বামী,
এক বিশ্বাস রহে যেন চিতে লাগিয়া।
যে অনলতাপ যখনই সহিব আমি
দেয় যেন তাহে তব নাম বুকে দাগিয়া।

নৈবেদ্যের সনেটকল্প রচনাবলীতে উপনিষদের বাণীই নতুন উপলব্ধিতে উদ্গীত হয়েছে। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পরবর্তী মাসেই [ শ্রাবণ ১৩০৮ ]

প্রকাশিত হয়েছে 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম'। 'গীতাঞ্জলি'তে [প্রকাশ ১৯১০] প্রেমময় ভগবানের কাছে আত্মনিবেদনের ভাবই মুখ্য। 'গীতাঞ্জলি'তে প্রাচীন ভারতের উপনিষদ এবং মধ্যযুগের ভক্তিবাদ কোন্ অনুপাতে সমন্বিত হয়েছে তার একটা আভাস পাওয়া যাবে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রে। ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ এবং সাধুসন্তগণের ভক্তিবাদের আনুপাতিক হারের বিচারে প্রবেশ না করেও বলা যায় গীতাঞ্জলির ভক্তকবি আত্মনিবেদনেরই পথের পথিক।

গীতাঞ্জলি পর্বের প্রধান নাটক 'রাজা' [১৯১০] এবং 'ডাকঘর' [য়ুরোপযাত্রার অব্যবহিত পূর্বে লেখা, প্রকাশ ১৯১২]। এই পর্বের উল্লেখ্য প্রবন্ধগ্রন্থ হল 'ধর্ম' এবং 'শান্তিনিকেতন'। 'ধর্ম' গ্রন্থে পনেরোটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলি 'অধিকাংশই শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ, নববর্ষ, বা পৌষোৎসবে বা / এবং আদি-ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক অনুষ্ঠিত মাঘোৎসবে কথিত বা পঠিত।'[১৭] 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালার প্রবন্ধ / ভাষণগুলি '১৩১৫ অগ্রহায়ণ হইতে ১৩২১ পৌষ পর্যন্ত শান্তিনিকেতন মন্দিরে ও অন্যত্র বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই [এই] সতেরো খণ্ডে সংগৃহীত হইয়াছিল।'[১৮]

ধর্মের প্রথম প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'—ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ,...বিশ্বজগৎ তাঁহার অমৃতময় আনন্দ, তাঁহার প্রেম।'...পুনশ্চ, 'আনন্দ হইতেই সত্যের প্রকাশ এবং সত্যের প্রকাশ হইতেই আনন্দ।'[১৯] 'প্রার্থনা' শীর্ষক ভাষণে বলেছেন, 'আবিরাবীর্ম এধি।' ..'হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও।'[২০]

'শান্তিনিকেতনে'র উপদেশমূলক ভাষণগুলি বিচিত্র বিষয় নিয়ে কথিত/লিখিত। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রশিক্ষকগণের চিন্তা ও কর্মকে ধর্মনিষ্ঠ করাই এগুলির সাধারণ লক্ষণ। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এবং শান্তিনিকেতনে অভিনব শিক্ষাদর্শ প্রচলন করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে যে-সব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, যে-সব ঘটনা ঘটেছে, এবং আশ্রম-গুরুর মনে যে-সব ভাব লীলায়িত হয়েছে, তারই নানা স্তরের প্রকাশ এই উপদেশমালায় দেখতে পাওয়া যাবে।

আমাদের সত্তায় নানা ব্যক্তির সহাবস্থান। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি মালা। কাজেই তাঁর চেতনার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ স্তরের বিচিত্র চিন্তা-ভাবনা শান্তিনিকেতনের উপদেশমালায় প্রকাশিত।

'ধর্ম' গ্রন্থ সম্পর্কেও বলা যায়, প্রবন্ধগুলি বেশির ভাগই ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের ভাষণ। সুতরাং এগুলি পাঠের সময় রবীন্দ্রনাথেরই উক্তি আমাদের মনে পড়ে,

'আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনোই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে।' ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের ভাষণে 'এই অভ্যাসের যোগ'ই মুখ্য। কিন্তু ঔপনিষদিক আনন্দবাদের কবি যখন বলেন, 'দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব যে একেবারে একসঙ্গে বাঁধা' অথবা দুঃখকেই যখন তিনি মানুষের সমস্ত উপলব্ধির উৎসমূলে স্থাপন করে বলেন, 'মানুষের এই যে দুঃখ ইহা কেবল কোমল অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন নহে, ইহা রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত; বিশ্বজগতে তেজঃপদার্থ যেমন, মানুষের চিত্তে দুঃখ সেইরূপ, তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ', তখন স্বভাবতই আমাদের মনে হয় এখানে কবি শুধু 'অভ্যাসের যোগে'ই যুক্ত নন, এটি একান্তই তাঁর স্বোপলব্ধিসঞ্জাত অন্তরতর 'আমি'র কথা।[২১]

কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, সামান্য লক্ষণে এই দশ / বারো বৎসর কবিজীবনে আধিদৈবিক চেতনাই মুখ্য। তাঁর 'আমি' 'অন্তর্যামী ব্রহ্মে'র মধ্যেই 'স্পন্দমান'।

১০

'গীতাঞ্জলি'র কবি ১৯১২ সালে গেলেন প্রতীচ্য ভূখণ্ডে—য়ুরোমেরিকায়। দেশে ফিরে এসে তিনি লিখলেন 'বলাকা'। বলাকায় গীতাঞ্জলির লীলাবাদ একাধিক কবিতায় পরিস্ফুট, কিন্তু এর মূলসুর কবিকে সৃষ্টিবাদ থেকে অভিব্যক্তিবাদে নিয়ে এসেছে। 'বলাকা' গতিতত্ত্বেরই রসভাষ্য। ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ ততদিনে বের্গসঁর 'Creative Evolution'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। এই ফরাসী মনীষী তখন য়ুরোপের বিদগ্ধ সমাজে অগ্রগণ্য পুরুষ। আমেরিকা থেকে ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ অজিত চক্রবর্তীকে লিখছেন, তিনি যখন আমেরিকায় বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন তখন সেখানে য়ুরোপের দুজন মহামনীষীও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের একজন হলেন অধ্যাপক বের্গসঁ। তাঁর গ্রন্থ মূল ফরাসীতে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৭ সালে। ইংরেজিতে অনূদিত হয় ১৯১১ সালে। Creative Evolution-এর মূলতত্ত্ব হল 'We are creating ourselves continually.'[২২] 'Our personality, which is being built up each instant with its accumulated experience, changes without ceasing.'[২৩] 'The truth is that we change without ceasing, and the state itself is nothing but change.'[২৪] 'There is no feeling, on idea, no volition which is not undergoing

change every moment ; if a mental state ceased to vary, its duration would cease to flow.'[২৫] 'For a conscious being, to exist is to change, to change is to mature, to mature is to go on creating oneself endlessly.[২৬]

এই উদ্ধৃতিপঞ্চকে বের্গসঁর মূলতত্ত্ব ধৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলাকায় 'চঞ্চলা' ও 'বলাকা'—এই দুটি কবিতায় বের্গসঁর 'ক্রিয়েটিভ ইভল্যুশন'-তত্ত্বকে কাব্যরূপে গ্রথিত করেছেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বলাকায় রবীন্দ্রনাথ যে গতিতত্ত্বের কথা বলেছেন তা তো আমাদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'চরৈবেতি' মন্ত্রেই আছে, তবে বের্গসঁর প্রভাবকে একমেবাদ্বিতীয় বলা অত্যুক্তি হবে না কি? তাছাড়া, বলাকায় দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ এড্ওয়ার্ড কার্পেণ্টারের 'Towards Democracy' গ্রন্থখানির প্রতিও বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কার্পেণ্টার [১৮৪৪-১৯২৯] জন্মসূত্রে ইংরেজ, কিন্তু আমেরিকায় গিয়ে এমার্সন ও হুইটম্যান প্রমুখ মনীষিগণের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে আসেন। হুইটম্যানের মতো তিনিও গদ্যছন্দেই তাঁর গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। 'Towards Democracy' চারখণ্ডে বিভক্ত, রচনাকাল ১৮৮৮ থেকে ১৯০২ সালে প্রসারিত। রবীন্দ্রনাথ য়ুরোমেরিকা ভ্রমণের পর শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে ছাত্র অধ্যাপক ও অন্যান্য শুশ্রূষু আবাসিকের কাছে হুইটম্যানের 'লীভস্ অব গ্রাস' এবং কার্পেণ্টারের 'টুওয়ার্ডস ডেমক্রেসি' পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শোনাতেন।[২৭]

কানাই সামন্ত দেখিয়েছেন, কার্পেণ্টারের কাব্যগ্রন্থের 'The songs of Birds, who hears' কবিতাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কবিতার কয়েকটি পংক্তির বিস্ময়কর সাদৃশ্য আছে। কার্পেণ্টার লিখেছেন :

The rocks flow and the mountain-shapes flow,
And the forests swim over the lands like cloud-shadows.
The lines of the seeming-everlasting sea are changed,
and its waves beat on unmapped phantom shores :
'Not nere, not here !'

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'য় আছে :

পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ;
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি

মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
... ... ...
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে—
'হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে।'

'চঞ্চলা' কবিতায় বিশ্বের অনাদ্যন্ত প্রবাহের কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। বলেছেন, এই অপ্রতিহত গতি যখন ব্যাহত হয় তখনই বিশ্বে দেখা দেয় বস্তুপুঞ্জ। বের্গসঁ বলেছেন :

**In reality, life is a movement, materiality is the inverse movement, and each of these two movements is simple, the matter which forms a world being an undivided flux and undivided also the life that runs through it, cutting out in it living beings all along the track.**[২৮]

রবীন্দ্রনাথ বের্গসঁর এই তত্ত্বকেই ভাষা দিয়েছেন 'চঞ্চলা'য়। অবশ্য বিশ্বপ্রবাহকে তিনি নদীর রূপকল্পে প্রকাশ করেছেন

হে বিরাট নদী
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই নদীর রূপকল্প রবীন্দ্রমানসে তাঁর ৩১।৩২ বৎসর বয়সেই ধরা দিয়েছিল। ছিন্নপত্রাবলীর ১৪৭-সংখ্যক চিঠিতে কবি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীকে লিখছেন : 'বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গতিকে কেবল যদি গতিভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি তাহলে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়।'[২৯]

এ থেকে এটুকুই প্রমাণিত হয় যে, রবীন্দ্রনাথ বের্গসঁর সৃষ্টিপ্রবাহকে বোঝাতে গিয়ে নিজস্ব রূপকল্পের সদ্ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ, যে-ভাবে যে-ভাষাতেই প্রকাশিত হোক্ না কেন, বের্গসঁর 'ক্রিয়েটিভ ইভল্যুশন' বলাকার যুগে রবীন্দ্রমানসকে অধিকার করে ছিল।

১১

বলাকা রবীন্দ্রনাথের চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন বৎসর বয়সের রচনা। কবিজীবনের বাকি দিনগুলিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বপন-মূরতি গোপনচারী' সত্তায় গীতাঞ্জলি যুগের আত্ম-নিবেদনের পথ পরিত্যাগ করে আত্মবিকাশের পথকেই মানবসত্য বলে অবলম্বন করেছেন। অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলাই সেই সত্যের মূলকথা। অবশ্য চলা মানেই হয়ে-ওঠা। Being is becoming। এই প্রসঙ্গে আমরা বের্গসঁর 'সৃজনশীল অভিব্যক্তিবাদে'র যে সূত্রপঞ্চকের কথা বলেছিলাম তার প্রথম সূত্রের কথা পুনঃস্মরণীয়—'আমরা অনুক্ষণ নিজেকে সৃষ্টি করে চলেছি'। 'Thus our Personality shoots, grows and ripens without ceasing. Each of the moments is something new added to what was before.'[৩০] আর যা ক্রমশ নবনবায়মান সেই আবির্ভাব সম্পর্কে 'প্রথম দিনের সূর্য'ই হোক, আর 'দিবসের শেষ সূর্য'ই হোক, কেউই সত্তাজিজ্ঞাসার কোনো শেষ উত্তর পাবে না. কেননা যা 'তিলে তিলে নোতুন হোয়' তার শেষ কথা কে বলতে পারে? কে জানতে পারে?

পিতৃদেবের কাছে রবীন্দ্রনাথ যে ধর্মচেতনা পেয়েছিলেন তার সঙ্গে তাঁর 'অভ্যাসের যোগ' যে আজীবন ছিল তা তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ 'জন্মদিনে'র ভাষার মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু কবির শেষজীবনের উপলব্ধি আনন্দবাদ থেকে দুঃখবাদে পরিবর্তিত হয়েছে। 'ধর্ম' গ্রন্থের 'দুঃখ' প্রবন্ধে কবি বলেছিলেন. দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব একেবারে একসঙ্গে বাঁধা।

তাই দেখতে পাওয়া যায়. জীবনের প্রথমার্ধে লেখা 'বসুন্ধরা'র স্বপ্নরাগরঞ্জিত আশা-আকাঙ্ক্ষা জীবনের দ্বিতীয়ার্ধের 'পৃথিবী' কবিতায় ধূলিসাৎ হয়েছে। 'পত্রপুটে'র এই কবিতায় কবি বলছেন:

জীবপালিনী, আমাদের পুষেছ
তোমার খণ্ডকালের ছোট ছোট পিঞ্জরে।
তারই মধ্যে সব খেলার সীমা,
সব কীর্তির অবসান।

আজ আমি কোনো মোহ নিয়ে আসিনি তোমার সম্মুখে;
এতদিন যে দিনরাত্রির মালা গেঁথেছি বসে বসে
তার জন্যে অমরতার দাবি করব না তোমার দ্বারে।

তোমার অযুত নিযুত বৎসর সূর্যপ্রদক্ষিণের পথে
যে বিপুল নিমেষগুলি উন্মীলিত নিমীলিত হতে থাকে
তারই এক ক্ষুদ্র অংশে কোনো একটি আসনের
সত্যমূল্য যদি দিয়ে থাকি,
জীবনের কোনো একটি ফলবান খণ্ডকে
যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে—
তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে ;
সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে
যে রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিশে।

'শেষলেখা'র ১১-সংখ্যক কবিতায়ও কবি শেষবারের মতো বললেন, 'এ জগৎ স্বপ্ন নয়'। বললেন, 'আমৃত্যুর তপস্যা এ জীবন।' তাই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবির শেষ উপলব্ধির ভাষা হল :

রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায় ;
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।

১২

সত্তর বৎসরে পদার্পণ করে রবীন্দ্রনাথ 'Religion of Man' [মে, ১৯৩০] এবং 'মানুষের ধর্ম' [জানুয়ারি, ১৯৩৩] গ্রন্থে নিয়তবর্ধমান অভিব্যক্তিবাদকে নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে নবরূপে ব্যাখ্যা করলেন। ১৯১৬ সালে রচিত 'ধর্ম' গ্রন্থের 'দুঃখ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, উপনিষদ-প্রোক্ত ঈশ্বরের আনন্দরূপ-অমৃতরূপের প্রকাশ ত্রিধা বিভক্ত। 'একটি প্রকাশ জগতে, আর একটি

প্রকাশ মানব-সমাজে, আর একটি প্রকাশ মানবাত্মায়।'[৩১] Religion of Man গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ-প্রোক্ত ঈশ্বরের স্থলে বসালেন লোকধর্মের 'মনের মানুষ'কে। এই 'মনের মানুষ'কে তিনি বললেন 'সর্বমানুষের জীবনদেবতা'। বললেন, 'এই মনের মানুষ, এই সর্বমানুষের জীবনদেবতার কথা বলবার চেষ্টা করেছি Religion of Man বক্তৃতাগুলিতে।'[৩২]

'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের পরিশিষ্ট-প্রবন্ধ হল 'মানবসত্য'। তার প্রারম্ভেই কবি বললেন, মানুষ ত্রিজ। তার জন্মভূমি তিনটি। 'প্রথম পৃথিবী। মানুষের বাসস্থান পৃথিবীর সর্বত্র।' 'মানুষের দ্বিতীয় বাসস্থান স্মৃতিলোক। অতীতলোক থেকে পূর্বপুরুষের কাহিনী নিয়ে কালের নীড় সে তৈরি করেছে। এই কালের নীড় স্মৃতির দ্বারা রচিত, গ্রথিত।...স্মৃতিলোকে সকল মানুষের মিলন।' 'তার তৃতীয় বাসস্থান আত্মিকলোক। সেটাকে বলা যেতে পারে সর্বমানবচিত্তের মহাদেশ।'[৩৩]

'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনাকে বলা যেতে পারে 'মানবসত্যবাদ'। এই উপলব্ধিতে কোনো 'অমানব' বা 'অতিমানব' সত্তার স্থান নেই। 'মানবসত্য' প্রবন্ধের উপসংহারে কবি বলেছেন :

'আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না ক'রে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্র আছে— তিনি নিখিল মানবের আত্মা। তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা কেউ যদি বলেন, তবে সে-কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেননা আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয় আমার কল্পনা মানবকল্পনা। তাকে যতই মার্জনা করি, শোধন করি, তা মানবচিত্ত কখনোই ছাড়াতে পারে না। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানববুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানবের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে, এই আনন্দে যাকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা কিন্তু মানবিক ভূমা। তাঁর বাইরে অন্য কিছু থাকা না-থাকা মানুষের পক্ষে সমান। মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন!'[৩৪]

১৩

মর্ত থেকে বিদায় নেবার প্রায় চার বৎসর পূর্বে কবিমানসের মননলোকে দেখা দিল 'বিশ্বপরিচয়'। 'বিশ্বপরিচয়'কে বলা যেতে পারে বিশ্ববিজ্ঞানের বর্ণপরিচয়। গ্রন্থখানি পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক, ভূলোক, এবং উপসংহার

—এই ছ'টি অধ্যায়ে বিভক্ত। 'উপসংহারে' রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানভিত্তিক অভি-ব্যক্তিবাদের কথা বললেন। তাঁর নিজের ভাষাতেই তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করা গেল :

'একদা জগতের সকলের চেয়ে মহাশ্চর্য বার্তা বহন করে বহুকোটি বৎসর পূর্বে তরুণ পৃথিবীতে দেখা দিল আমাদের চক্ষুর অদৃশ্য একটি জীবকোষের কণা। কী মহিমার ইতিহাস সে এনেছিল কত গোপনে। দেহে দেহে অপরূপ শিল্পসম্পদশালী তার সৃষ্টিকার্য নব নব পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অনবরত চলে আসছে।...

'অপ্রাণ বিশ্বে যেসব ঘটনা ঘটছে তার পিছনে আছে সমগ্র জড়জগতের ভূমিকা। মন এই সব ঘটনা জানছে, এই জানার পিছনে মনের একটা বিশ্বভূমিকা কোথায়। পাথর লোহা গ্যাসের নিজের মধ্যে তো জানার সম্পর্ক নেই। এই দুঃসাধ্য প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ একটা যুগে প্রাণ মন এল পৃথিবীতে—অতিক্ষুদ্র জীবকোষকে বহন ক'রে।

'পৃথিবীতে সৃষ্টি-ইতিহাসে এদের আবির্ভাব অভাবনীয়। কিন্তু সকলকিছুর সঙ্গে সম্বন্ধহীন একান্ত আকস্মিক কোনো অভ্যুৎপাতকে আমাদের বুদ্ধি মানতে চায় না। আমরা জড়বিশ্বের সঙ্গে মনোবিশ্বের মূলগত ঐক্য কল্পনা করতে পারি সর্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতিঃ-পদার্থের মধ্যে। অনেক কাল পরে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে আপাত-দৃষ্টিতে যে-সকল স্থূল পদার্থ জ্যোতির্হীন, তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন-আকারে নিত্যই জ্যোতির ক্রিয়া চলছে। এই মহাজ্যোতিরই সূক্ষ্ম বিকাশ প্রাণে এবং আরও সূক্ষ্মতর বিকাশ চৈতন্যে ও মনে। বিশ্বসৃষ্টির আদিতে মহাজ্যোতি ছাড়া আর কিছুই যখন পাওয়া যায় না, তখন বলা যেতে পারে চৈতন্যে তারই প্রকাশ। জড় থেকে জীবে একে একে পর্দা উঠে মানুষের মধ্যে এই মহাচৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার সাধনা চলছে। চৈতন্যের এই মুক্তির অভিব্যক্তিই বোধ করি সৃষ্টির শেষ পরিণাম।'[৩৫]

এই উদ্ধৃতির সাক্ষ্য নিয়ে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ অভিব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর শেষ কথা বললেন 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থে। এই অভিব্যক্তিবাদের আলোকেই 'জন্মদিনে'র ১১-সংখ্যক কবিতা এবং সমকালীন সত্তাচেতনা-বিষয়ক অন্যান্য কবিতার ভাববস্তু বিশ্লেষণ করতে হবে। জন্মদিনের কবিতাটি 'প্রথম পৈতৃক' নামে ১৩৪৭ সালের ফাল্গুনের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা পূর্বে তার বস্তুবিশ্লেষণ করে বলেছি, 'এ কবিতায় কবি যেন ভাববাদী দার্শনিক ভিত্তি

থেকে অনেকখানি সরে এসেছেন।' বলেছি, 'কবিতাটি বলাকার 'চঞ্চলা'কে স্মরণ করিয়ে দেবে।'

আসলে বলাকা-যুগের সৃজ্যমান অভিব্যক্তিবাদেরই নব নব রূপ পরিস্ফুট হয়েছে 'মানুষের ধর্মে' এবং 'বিশ্বপরিচয়ে'। সৃষ্টিবাদ থেকে অভিব্যক্তিবাদে রবীন্দ্র-কবিমানসের এই উন্মীলনরহস্য কবিজীবনের দ্বিতীয়ার্ধের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়। ১৯৩৫ সালের মার্চের শেষদিকে লেখা 'শেষ সপ্তকে'র নয়-সংখ্যক 'অসমাপ্ত' শীর্ষক কবিতাটিতে কবি যে 'অপরিণত অপ্রকাশিত' আমি-র কথা বলেছেন, বৎসর-দুই পরে লেখা 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থে যেন তারই গদ্যভাষ্য রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সেখানে বলেছেন, 'জড় থেকে জীবে একে একে পর্দা উঠে মানুষের মধ্যে এই মহাচৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার সাধনা চলছে। চৈতন্যের এই মুক্তির অভিব্যক্তিই বোধ করি সৃষ্টির শেষ পরিণাম।' এই 'মুক্তির অভিব্যক্তি' নিত্যনবায়মান বলেই, ভাষান্তরে, মানব-সত্তায় 'মহাচৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার সাধনা' অসম্পূর্ণ অসমাপ্ত বলেই মর্তলোকে 'সত্তার নূতন আবির্ভাবে' তার পরিচয়-জিজ্ঞাসায় যেমন কোনো উত্তর মেলেনি, মর্ত থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তেও তেমনি সেই জিজ্ঞাসার কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। জন্মমৃত্যুর সংগমস্থলে যে মানবসত্তার প্রকাশ তার অনেকখানিই অগম্য গ্রহের মতো অনাবিষ্কৃত। কিন্তু তার মধ্যে আছে 'কত সূচনা', 'কত ব্যঞ্জনা'। তাই 'অকস্মাৎ নিরর্থকতার অতলে' তার ধ্বংস হবে, সৃষ্টির এই ছেলেমানুষি কবিকল্পনায় অস্বীকৃত হয়েছে। মানবচৈতন্যে মুক্তির অভিব্যক্তি নিয়তসৃজ্যমান। অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতায় মানুষের মধ্যে মহাচৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার সাধনা নিত্যকাল চলছে, চলবে। এই বিশ্বাসেই রবীন্দ্রনাথের 'মানবসত্যবাদ' সৃষ্টিবাদ থেকে দূরে সরে এলেও নৈরাশ্যবাদে পর্যবসিত হয় নি। এই মানবসত্যবাদের কবি তাঁর জীবনদিনান্তে 'সভ্যতার সংকটে' উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।' তাই জড়শক্তি নয়, মানবচৈতন্যকেই তিনি বলেছেন মুক্তির অভিব্যক্তির শেষ পরিণাম।

## উল্লেখপঞ্জী

১. এই কবিতাটি সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে। তার মধ্যে আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের 'অন্তিম পর্বের দুটি কবিতা' এবং শঙ্খ ঘোষের 'নিঃশব্দের তর্জনী' গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায়ের 'প্রথম দিনের সূর্য', 'প্রশ্ন' এবং 'আইয়ুবের সঙ্গে বিচার'—এই তিনটি আলোচনা বিশেষ উল্লেখ্য।

২. দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্ররচনাবলী-১৮, পৃ ৭৪।

৩ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্ররচনাবলী-২৫, পৃ ৭০।

৪ বলাকা, ৩৩ সংখ্যক কবিতা, সাময়িকপত্রে প্রকাশের সময় নাম ছিল 'প্রেমের বিকাশ'। শতবার্ষিক সং, পৃ ৮২।

৫. দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্ররচনাবলী-২৫, পৃ ৭৯-৮০।

৬ জীবনস্মৃতি. রবীন্দ্ররচনাবলী ১৭, পৃ ৩৭৭।

৭, ছিন্নপত্রাবলী, সং আশ্বিন ১২৬৭, পৃ ৩৯১।

৮. তদেব, পৃ ৩৯৯-৪০০।

৯. দ্রষ্টব্য, আত্মপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী ২৭, পৃ ২২৩ ২৪।

১০ দ্রষ্টব্য. 'সমালোচনা', রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৯৭-১০৫।

১১ 'আধুনিক সাহিত্যে' অবশ্য 'ভারতী'তে প্রকাশিত, এবং 'সমালোচনা'য় সংকলিত প্রবন্ধের প্রথম তিনটি অনুচ্ছেদ অনাবশ্যকবোধে বর্জিত হয়েছে।

১২ এই দুটি উক্তিই সাধারণভাবে তৎকালীন যুগচেতনা সম্পর্কে প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনে এই নবীন প্রতীচীর প্রভাব যেমন ক্রিয়াশীল ছিল, তেমনি প্রাচীন প্রাচীর প্রভাবকেও তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। অর্থাৎ কবিমানসে সৃষ্টিবাদ এবং অভিব্যক্তিবাদ—উভয়ই কখনো জ্ঞাতসারে কখনো অজ্ঞাতসারে কাজ করেছে।

১৩. Evolution, Patrick Geddes, সং ১৯১৮, পৃ ৬৯।

১৪. তদেব, পৃ ৭০, ৭১।

১৫. 'শেষ সপ্তক', রবীন্দ্ররচনাবলী-১৮, পৃ ২৪।

১৬. 'নববর্ষ', ভারতবর্ষ, রবীন্দ্ররচনাবলী-৪, পৃ ৩৭৭।

১৭. গ্রন্থপরিচয়, র-র-১৩, ৫৪৬।

১৮. তদেব।

১৯. র-র-১৩, পৃ ৩৩৭।

২০. তদেব, পৃ ৩৭৫।

২১. দ্রষ্টব্য, 'দুঃখ' প্রবন্ধ, ধর্ম, র-র-১৩, পৃ ৪০৫।

২২. 'Creative Evolution', tr. in English by Arthur Mitchell, সং ১৯১৪, পৃ ৭।

২৩. তদেব, পৃ ৬।

২৪, তদেব. পৃ ২।

২৫. তদেব, পৃ ১-২।

২৬. তদেব, পৃ ৮।

২৭. দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রজীবনী, তৃতীয়খণ্ড. সং ১৩৫৯, পৃ ৩৬।

২৮. Creative Evolution, পৃ ২৬৩।

২৯. ১৮৯৪ সালের ২৪ আগস্ট লেখা চিঠি। দ্রং, 'ছিন্নপত্রাবলী , পৃ ৩১৯।

৩০ Creative Evolution, পৃ ৬।

৩১. র-র-১৩, পৃ ৪০০।

৩২. র-র ২০ পৃ ৪৩০।

৩৩ র-র-২০, পৃ ৪২১।

৩৪. তদেব, পৃ ৪৩০।

৩৫. র-র-২৫, পৃ ৪১৩-১৪।

## ভ্রমসংশোধন

পৃষ্ঠা ৩৪ পংক্তি ৭ : 'করি পিত' হবে 'করি, পিতঃ,'। ৩৬/২৯ : 'ফ্রোবার্ট' হতে 'ফ্রোবেষার'। ৩৮/১৪-১৫ : 'যজ্ঞোপবিতের' হবে 'যজ্ঞোপবীতের'। ৪২/১৬ : 'সূত্র' হবে 'সূক্ত'। ৫৫/২ : 'জীবণের' হবে 'জীবনের'। ৭৩/২ : 'মুক্তি' হবে 'শুদ্ধি'। ১০৪/৭ : 'গুঞ্জরন' হবে 'গুঞ্জরণ'। ১৫৮/উল্লেখপঞ্জী ৬ : 'রেনার' হবে 'রাইনের'। ১৬৫/১৯ : '(১৮ ৮)' হবে '(১৮৭৮)' ; পংক্তি ২৫ : '[ ৮৮৫]' হবে [১৮৮৫]। পংক্তি ২৬ : '[১ ৯৫]' হবে [১৮৯৫]। ২০৮/৭ : 'Not near,' হবে 'Not here,'।